প্রথম সংস্করণ:
৭ই জ্যৈষ্ঠ,
১৮৮১ শকাব্দ

চার টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা:
প্রশান্ত রায়

প্রকাশক: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর: শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা,
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

বন্ধুবব

শ্রীদিলীপ কুমার গুপ্ত

করকমলেষু



জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়ির প্রথম পত্তন হয় নীলমণি ঠাকুরের দ্বারা ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে। তার পঞ্চাশ বছর পরে তাঁর পৌত্র দ্বারকানাথ সেই আদি বসত-বাড়ির পাশে একটি প্রকাণ্ড বৈঠকখানা-বাড়ি করিয়েছিলেন। এই হল দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন্‌এর পাঁচ নং বাড়ি। এই পাঁচ নং বাড়ির দক্ষিণের বারান্দা গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্রের জীবদ্দশায় ভারতের শিল্পকলার পীঠস্থানে পরিণত হয়। গগনেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। সমরেন্দ্রনাথ তাঁর চেয়ে তিন বছরের ছোট, অবনীন্দ্রনাথ চার বছরের। এই তিন ভাই কখনও পরস্পরকে ছেড়ে থাকেন নি। গগনেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে। তারই ঠিক তিন বছর পরে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে সমরেন্দ্র এবং অবনীন্দ্র তাঁদের শতাধিক বছরের পুরোনো এবং প্রিয় দক্ষিণের বারান্দা ছেড়ে চলে যান অপর বাসস্থানে। আর কোনোদিন তাঁরা জোড়াসাঁকোয় আসেন নি। অবনীন্দ্রনাথই পাঁচ নং বাড়ির শেষ যাত্রিক। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের এক অপরাহ্ণে তিনি জোড়াসাঁকোর বাস উঠিয়ে বেলঘরিয়ায় চলে যান।

ছবির পর্দায় ছবির মতো বহু ব্যক্তি দক্ষিণের বারান্দায় এসেছেন গেছেন। তাঁদের সকলের কথা এ বইএ বলার দরকার হয়নি। এই বইএ যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে দেওয়া হল :

দাদামশায়	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বড়দাদামশায়	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মেজদাদামশায়	সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাবা	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
কর্তাবাবা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দিদিমা	সুহাসিনী দেবী
মেজদিদিমা	নিশিবালা দেবী
বড়মামা	অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবুমামা	নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গবামামা	ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কোকোমামা	তরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কালুমামা	জয়ীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শোভনলাল	শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
সুজন	সুজনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
হেবি	গীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আরতি	আরতি মুখোপাধ্যায় (ঠাকুর)
দীপালী	দীপালী রায় (ঠাকুর)
অরুদা	অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
দীপুদা	দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
দিনুমামা	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুরেনদাদা	সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মাস্টারমশায়	যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
হরিনাথবাবু	হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সরকার বাবু
ফণিবাবু	ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়—সরকার বাবু
কিশোরীবাবু	সরকার মশায়
গুপীবাবু	সরকার মশায়
পচাবাবু	সরকার মশায়
ক্ষিতীশ	ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত—সরকার বাবু
গোপালবাবু	সরকার মশায়
পুন্নবাবু	পূর্ণচন্দ্র সাহা—প্রতিবেশী
জসীম উদ্দীন	সুকবি জসীম উদ্দীন
নন্দদা	নন্দলাল বসু
মুকুলবাবু	মুকুলচন্দ্র দে
প্রশান্তবাবু	প্রশান্তকুমার রায়
গিরিধারী	গিরিধারী মহাপাত্র—প্রস্তরশিল্পী

গ

শ্রীধর	শ্রীধর মহাপাত্র—প্রস্তরশিল্পী
প্রদ্যোৎকুমার	মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর
রাধারমণ রায়	ইঞ্জিনীয়ার রাধারমণ রায়
কাসাহারা	জাপানী উদ্যান-শিল্পী
আচারিয়া	দক্ষিণ ভারতীয় সূত্রধর
অবিনাশবাবু	অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী—কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র
রাণীদি	রাণী চন্দ
কুমুদ	কুমুদ চন্দ্র পাল
তোতা	ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র
ঘেঁটু	নির্ম্মলকুমার সাহা—প্রতিবেশী-পুত্র
জগদানন্দবাবু	জগদানন্দ রায়
নীতু	রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্র
প্রমথবাবু	প্রমথনাথ বিশী
তারক	তারকনাথ লাহিড়ী—শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র
নির্মল	নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র
শান্তি	শান্তিদেব ঘোষ—শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র
মার্কণ্ডী	শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র
গোলাপ	শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র
তালাবালি	বাবুর্চি
রাধু	রাধাকান্ত বিশ্বাস—ভৃত্য

দুঃখী	ভৃত্য	সন্তোষ	ভৃত্য
চরিত্রা	ভৃত্য	বিপিন	ভৃত্য
নবীন	বাবুর্চি	যোগী	মালী
মহাবীর	ভৃত্য	সর্দার	মালী



অবনীন্দ্রনাথ,

মোহনলাল, শোভনলাল ও অমিতেন্দ্র

অবতরণিকা

দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন-এর পাঁচ নং বাড়ি আজ আর নেই। সেই বাড়ির দক্ষিণের বারান্দা আর সেই বারান্দায় যাঁরা বসতেন তাঁরাও কেউই আজ নেই। জন্মকাল থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ঐ বাড়িতে কাটিয়েছিলেন। তাঁদের স্মৃতিতে জড়িত ছিল সেই বাড়ির প্রতিটি কোণ, প্রতিটি কণা, দক্ষিণের বারান্দার প্রতিটি দিন। যাঁরা দেখেছেন সে বাড়ির জনস্রোত, যাঁরা এসেছিলেন দক্ষিণের বারান্দার ছায়াতলে তাঁদের মধ্যে বহু ব্যক্তিই আজ জীবিত। তাঁরা জানেন, তাঁরা হয় তো মনে রেখেছেন পাঁচ নং বাড়ি সংক্রান্ত অনেকানেক ঘটনা, কিছু কিছু স্মৃতি। মনে রাখবার মতো অনেক কিছুই ঘটে গেছে এই সেদিনও ঐ পাঁচ নং বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায়। বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের ইতিহাসের বহু অধ্যায়ই ঐ পাঁচ নং বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় অভিনীত হয়েছিল। তবুও সে বাড়ি রক্ষা হয়নি।

সে বাড়ি আজ নিশ্চিহ্ন। আমরা যারা জন্মেছিলুম ঐ বাড়িতে এখনও চোখ বুজলে দেখতে পাই সেই বাড়ির দেউড়ি, চওড়া কাঠের সিঁড়ি, লাইব্রেরী ঘর, দক্ষিণের বারান্দা আর নারকেল গাছ ঘেরা বাগান। আর দেখতে পাই ঐ বাড়ির জীবন স্বরূপ ছিলেন যাঁরা তাঁদের এবং তাঁদের আকর্ষণে যাঁরা যাওয়া আসা করে পাঁচ নং বাড়ির পরিবেশকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলতেন তাঁদেরও।

গৃহকর্তারা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর প্রথমত ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে সে বাড়ি। তারপর সরকার তার ভার নেন জাতীয় সম্পদ হিসাবে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। শেষে রক্ষা করতে না পেরে ভেঙে তার জায়গায় নতুন ইমারত তোলেন।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈঠকখানা বাড়ি। পূর্বপুরুষদের বিরাট চক মিলানো ছয় নং বাড়ি ছিল অন্দর মহল আর ঐ বৈঠকখানা বাড়ি ছিল বাহির

মহল। ওখানে বাড়ির মেয়েদের প্রবেশ ছিল না। ওটি তৈরি করিয়েছিলেন দ্বারকানাথ নিজে। তাঁর দেশী বিদেশী আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের প্রচুর আড়ম্বরে আপ্যায়ন করবার জন্যে। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভাইদের সঙ্গে একসঙ্গে ছয় নং বাসভবনে বাস করতেন। দ্বারকানাথের মেজছেলে গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর গিরীন্দ্রনাথের বিধবা বৈঠকখানা বাড়ি পাঁচ নং বাসভবনে উঠে যান। গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গুণেন্দ্রনাথ এবং তার পর গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্র ঐ বাড়িতেই মানুষ। দ্বারকানাথের নিজের গড়া এই পুরনো বৈঠকখানা বাড়ি আজ আর নেই। তার ছায়াময় স্মৃতিটুকু এখনও আছে কারো কারো মনে। তাঁরা চলে গেলে তা-ও আর থাকবে না।

আমি এখানে যা লিপিবদ্ধ করলুম তা কোনোদিনই হয়তো আমার লেখার ইচ্ছে হত না যদি-না ঐ বাড়িখানাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হত। এই দুই ঘটনা কোন্ অদৃশ্য রহস্যময় গ্রন্থিতে জড়িত তা আমি জানি না। যে বাড়িতে আমি জন্মেছিলুম, যে গণ্ডীর মধ্যে আমি বেড়ে উঠেছিলুম তার অবলুপ্তির পর তার নিঃসীম শূন্যতার ফাঁক দিয়ে দক্ষিণের বাতাসের মতো কি যেন এসে আমার চিত্তকে আপ্লুত করেছে। তাই লিখতে ইচ্ছে হয়েছে। তাই লিখেছি। এ স্মৃতিকথা-ও নয়, ইতিহাস-ও নয়। এ সেই দক্ষিণের বারান্দায় বসে বসে হালকা মেঘের দিকে তাকিয়ে দখিন হাওয়ার পরশ পাওয়ার মতো।

রবীন্দ্রনাথকে একবার স্পর্ধা করে জিজ্ঞেস করেছিলুম, মাছের ডিমের ইংরেজী কি? আমার বয়েস তখন এগারো, রবীন্দ্রনাথের ষাট। গুমোট গ্রীষ্মের দুপুরে কাঁচের শার্সী বন্ধ করে তেতলার পশ্চিমের ঘরে একা বসে বসে লিখছিলেন। ডিক্সানারী থেকে সবে আয়ত্ত করেছি শব্দটা। প্রচুর সাহস নিয়ে দুপুরের নির্জনতা ভঙ্গ করে তাঁর ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করলুম—আপনি তো এত দেশ ঘুরে এসেছেন, বলুন তো মাছের ডিমের ইংরেজী কি?

—মাছের ডিমের ইংরেজী রো।

—হল না। স্পন্। আমি ডিক্সানারী দেখে এসেছি।

—ডিকৃসানারী নিয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ? বোস্ তাহলে। স্পন্ আর রো-র প্রভেদটা তোকে বোঝাই।

এই বলে লেখা-টেখা ছেড়ে দিব্যি আমার সঙ্গে সমবয়সী সঙ্গীর মতো আলাপ শুরু করে দিলেন।

এই যে ঘটনা, এর মধ্যে কি আছে? না আছে উপদেশ, না আছে ইতিহাস, না তথ্য। শুধু মরমী দখিন হাওয়ার পরশের মতো মনের গহ্বরে লেগে আছে এখনও। এই হচ্ছে আমার কথা। এই হল আমার লিপি।

॥ ১ ॥

"যাকে রাখো, সেই রাখে।"

অমূল্য উপদেশ। এই উপদেশ আমরা ছেলেবেলায় দাদামশার কাছে পেয়েছি। তাঁর নিজের জীবনে প্রতি পদে এর প্রকাশ। কোনো জিনিস তিনি ফেলে দিতেন না। ছোট হোক, ভাঙা হোক, অনাদরের জিনিস, পুরোনো জিনিস, টুকরো টাকরা সব কিছু তাঁর কাছে আদর পেয়েছে। যত্ন করে তিনি তাদের রক্ষা করেছেন, কাজে লাগিয়েছেন। কে জানে, বড় শিল্পীরা হয় তো এমনি চোখ এমনি মন দিয়েই সব জিনিস দেখে। আমরা এ সব বুঝতুম না। কেন যে বড় আর্টিস্টের কাছে ছোটখাট খেলনার জিনিস হেলাফেলার জিনিসও আদর পায় তা-ও জানতুম না। আমরা শুধু জানতুম জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দায় যে চৌকিতে বসে দাদামশায় ছবি আঁকতেন তার ডান পাশে না-আলমারি না-বাক্স না-তাক গোছের একটা ব্যাপার থাকত। আমরা বলতুম দাদামশার ডেস্ক্। তার নীচের দিকটায় ছিল কয়েকটা দেরাজ, উপরের দিকটায় কতকগুলো খোপ। সেই খোপগুলির মধ্যে থাকত সব অমূল্য সম্পদ। সেখান থেকে যে কতরকমের জিনিস বেরত তার ঠিকানা নেই। আশ্চর্য লাগত। যখন যা-কিছু আমাদের দরকার হয়েছে দাদামশার কাছে গেলেই আমরা পেয়ে যেতুম।

একদিন গ্রীষ্মের বিকেলে জোড়াসাঁকোর গোল-বাগানে হেলানো বেঞ্চিতে দাদামশায় বসে আছেন। আমরা ছোটরা খেলা করছি। খেলতে খেলতে একজনের পকেট থেকে কি একটা জিনিস টপ্ করে গড়িয়ে ঘাসে পড়ে গেল।

সে তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে পকেটে ভরছে, সেই সময় দাদামশার চোখে পড়েছে।

—দেখি, দেখি, কি ভরছিস্ পকেটে!

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে মুঠো হাত খুলে ধরল।

লাল একটুকরো কাঁচ। ডিমের মত। কি থেকে যেন ভাঙা।

—কোথেকে পেলি? এ তো দ্বারকানাথের বাতিদানের টুকরো! কি চমৎকার ভেঙ্গেচে দেখেচিস্? যেন বক-পক্ষীর ডিম। কোথায় ছিল? আরো আছে নাকি? বের কর দিকি পকেটে আর কি আছে?

আর কিছুই নেই। ছেলেটি বল্লে, কাছারিখানার ছেঁড়া কাগজের স্তূপের মধ্যে সেটা পেয়েছে অনেক দিন হল।

বেচারার মুখ শুকিয়ে গেছে। ভাবছে এইবার বুঝি জিনিসটা বেদখল হল।

—অনেক দিন আগে পেয়েছিস? কি করিস ওটা দিয়ে?

—পকেটেই থাকে। মাঝে মাঝে নাড়ি-চাড়ি খেলি।

দাদামশার মুখে ক্রমে একটা খুশির ভঙ্গী ফুটে ওঠে। তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলেন—নাঃ, তোর চোখ আছে দেখচি, তোর পছন্দ আছে। যা খেল্ গে।

এখনও আমি মাঝে-মাঝে ভাবি, দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলোয়ারি কাঁচের ঐ চমৎকার মোলায়েম টুকরোটা পাবার জন্যে দাদামশার কি মনে মনে বিষম একটা লোভ হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছিল। ঐ রকম আরেকখানা যদি পেতেন তাঁর ডেস্‌কের খুপরির মধ্যে যত্নে তুলে রাখতেন সেই ভাঙা কাঁচের টুকরো।

আমি একবার একটা কালো রং-এর পেন্সিল-কাটা ছুরি পেয়েছিলুম। বাবা দিয়েছিলেন। কাঞ্চননগরের ছুরি। নিজে হাতে নিজের ছুরিতে পেন্সিল কাটতে যে কি আনন্দ পেতুম তা আর কি বলব; উৎসাহের চোটে এটা কাটি, ওটা কাটি, হঠাৎ কি একটা কাটতে গিয়ে ছুরির ফলাটা গেল মট্ করে ভেঙে।

চোখে অন্ধকার দেখলুম। কত আদরের কত কাজের ছুরি। তার এই দ্বিখণ্ডিত অবস্থা! জীবন বিস্বাদ হয়ে গেল। ভাবনায় পড়লুম। লোহা জোড়ার কোনো আঠা জানি না যে জুড়ব। অগত্যা দাদামশার শরণাপন্ন হতে হল।

ভাঙা ফলাটা হাতে নিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় দাদামশার কাছে গিয়ে বল্লুম—দাদামশায়, লোহা জুড়তে পারো?

দাদামশায় বল্লেন—তলোয়ারের খেলা তো খেলি নে। তুলির খেলা খেলি। কি হয়েছে?

ছুরির ভগ্নাবস্থা দেখালুম।

—ওঃ এই ব্যাপার? রোস্ দেখি।

ডানদিকের একটা খোপের মধ্যে হাত চালিয়ে দিলেন। একটা পেট-মোটা গোল লাল কাঠের বাটি বেরল—নানারকম টুকিটাকি জিনিসে ঠাসা। তার মধ্যে অনেকক্ষণ হাতড়ে হাতড়ে খুঁজলেন। তারপর একটা ছুরির ফলা টেনে বার করে বল্লেন—যাকে রাখো, সেই রাখে। দাও এখন তোমার দাঁতটি আমায় দাও, আমার দাঁতটি তুমি নাও।

এই বলে আমার ভাঙা ফলাটি সেই কাঠের গোল বাটির মধ্যে টুপ্ করে ফেলে দিলেন। ইঁদুরের গর্ত যেন। আর ফলাটি আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—লাগাতে আমি পারব না। হরিনাথ জানে। হরিনাথকে ডাক। দেখে নে কেমন করে ছুরির ফলা লাগাতে হয়।

আমি এতটা আশা করিনি। শুধু ফলা লাভ নয়, ফলা লাগাতেও শিখতে পারব? ছুটলুম তখনই হরিনাথবাবুকে ডেকে আনতে।

হরিনাথবাবু ছিলেন দপ্তরখানার একজন সরকারবাবু। মস্ত এক মুখ কাঁচা দাড়ি নিয়ে দপ্তরখানার তক্তপোশের উপর পাতা সাদা ফরাসের উপর তাঁর বেঁটে ডেস্‌কৃটির পিছনে পা গুটিয়ে সারাদিন বসে থাকতেন। হরিনাথ-বাবুর ডেস্‌কের উপরে হিসেবের খাতা আমরা খুব কমই দেখেছি। খাতা লিখতে প্রায় দেখিইনি। তাঁর ডেস্‌কের ভিতরে যে কি থাকত তা জানবার আমাদের ছিল অদম্য কৌতূহল, কিন্তু কোনোদিন আমাদের সামনে তিনি ডেস্‌ক্ খুলতেন না। তবে আমরা জানতুম ঠিক দাদামশায়েরই মতো তাঁর ডেস্‌ক্-ও ছিল নানা রকম টুকিটাকি দরকারি অদরকারি জিনিসের অমূল্য খনি। আমাদের বাড়িতে সরকারি করতে আসবার আগে হরিনাথবাবু বাজনার দোকানে কাজ করতেন। বেহালা এস্রাজ তিনি তৈরি করতে জানতেন। শুনেছি তিনি খুব ভালো মিস্ত্রী ছিলেন। নানারকম হাতের কাজে পোক্ত। এই সব কারণেই হরিনাথবাবুকে দাদামশায় সরকারবাবুদের মধ্যে

সকলের• চেয়ে বেশী পছন্দ করতেন। বাজনার দোকান থেকে হরিনাথবাবু সোজা ঠাকুরবাড়ির দপ্তরখানায় কি উপায়ে প্রমোশন পেয়েছিলেন তা জানি না, তবে আমাদের ধারণা এতে দাদামশায়ের নিশ্চয় কিছু হাত ছিল।

বাজনার দোকান থেকে আসবার সময় হরিনাথবাবু সঙ্গে করে ছোটো-খাটো নানারকম যন্ত্র এনেছিলেন। তাই দিয়ে ঠুক্‌ঠাক্ সারাদিনই কিছু-না-কিছু কাজ করতেন। যার যা-কিছু ভেঙ্গে যেত—ছোটদের খেলনা, বড়দের সেলাই-এর বাক্স, দোয়াতদানি, আলমারির পায়া, জানলার কাঁচ—অমনি হরিনাথবাবুর ডাক পড়ত। মিস্ত্রীর দরকার হলে তিনিই মিস্ত্রী আনতেন। কোথায় কোন্ গলিতে কোন্ কাজের ভালো মিস্ত্রী পাওয়া যায় তাঁর জানা ছিল। ছোটোখাটো সারানোর কাজ হলে তিনি নিজেই সারিয়ে দিতেন।

বর্ষার সময় মাঠে খেলতে গিয়ে কাদার মধ্যে পা পড়ে আমার গোড়ালিতে একবার একটা কৈ-মাছের কাঁটা ফুটে গিয়েছিল। কাদার মধ্যে কাক-এ এনে ফেলেছিল বোধ হয় কাঁটাটা—দেখতে পাইনি। কাঁটাটা পা থেকে টেনে বার করতে গিয়ে দেখি বার করা যায় না। গভীর ভাবে ঢুকেছে। তা ছাড়া কাঁটার গায়ে করাতের মতো দাঁত মাংসকে এমন কামড়ে ধরেছে যে, টানলেই বিষম যন্ত্রণা। বড় ভয় পেয়ে গেলুম। ডাক্তার এলে তো ছুরি চালিয়ে গোড়ালি কেটে তবে কাঁটা বার করবে। তার থেকে ভয়ানক আর কিছু নেই। তাই খোঁড়াতে খোঁড়াতে চোখের জল মুছতে মুছতে ছুটলুম দপ্তরখানায় হরিনাথবাবুর কাছে। যদি তাঁর যন্ত্র টন্ত্র দিয়ে কিছু একটা উপায় করতে পারেন। আমার পা-টা ফরাসের উপরে টেনে নিয়ে হরিনাথ-বাবু চশমার মধ্যে দিয়ে একবার দেখে নিলেন। তারপর একটা সাঁড়াশির মত কি বার করে ফুস করে টেনে বার করে ফেল্লেন কাঁটাটা। সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হল! একটুও লাগলো না। অদ্ভুত হাত ছিল হরিনাথবাবুর।

এঁরই কাছে দাদামশায় শিখেছিলেন কি করে 'রোলাম্' তৈরি করতে হয়। দাদামশায় বলতেন 'বজ্রপ্রলেপ'।

একদিন দুপুরবেলা আমি পাশের ঘরে মাস্টারমশার কাছে আঁক কষছি

দাদামশায় বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে ডাকলেন—এদিকে আয়, বজ্রপ্রলেপ করা শিখিয়ে দি।

মাস্টারমশায় স্তম্ভিত।

অঙ্কের খাতা মুড়ে দক্ষিণের বারান্দায় এসে দেখলুম জল দিয়ে একটা প্লেটের উপর দাদামশায় ময়দা মাখছেন, পাশে একটু চুন। একটা তুলির বাক্স ভেঙে গেছে, তাই জোড়বার জন্যে বজ্রপ্রলেপ তৈরি হচ্ছে। বল্লেন—শিখে নে। কাজে লাগবে। তোর ঐ অঙ্কের চেয়ে অনেক বেশী দরকারী। খবরদার কাউকে শেখাস নি। হরিনাথের কাছ থেকে বিদ্যেটা আদায় করেছি। সহজে কি বলতে চায়? এই দিয়ে বাজনা জুড়ত। দেখে নে এইবার, কি করে করি।

এই বলে বজ্রপ্রলেপ করা আমায় শিখিয়ে দিলেন।

সেদিন আর অঙ্ক কষা হল না।

হরিনাথবাবু কয়েকটি যন্ত্র নিয়ে দোতলার বারান্দায় এলেন। ছোট্ট লোহার হাতুড়ি, তেকোণা উখো, সন্না, ছেনি, ইস্পাতের পেরেক।

দাদামশায় বল্লেন—দেখছিস কেমন হাতুড়িটা। অমনিটি পেলে আমি একটা কিনি।

অনেকদিন পরে দেখেছি ঠিক সেই রকম একটা হাতুড়ি দাদামশায় কোথা থেকে যোগাড় করেছেন।

আমার ভাঙা ছুরি অতি সহজেই সারানো হয়ে গেল। হরিনাথবাবুর পাকা হাত। ছুরি সারিয়ে সেটা আমার হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ভাঙা ফলাটা গেল কোথায়?

আমি কিছু বলবার আগেই দাদামশায় একটু হেসে বল্লেন—সেটা আমি রেখে দিয়েছি।

ভাঙা ফলার উপর দুজনেরই সমান লোভ। ঐ এক বিষয়ে ঠাকুরবাড়ির দুই বাসিন্দার—একজন জমিদার, শিল্পী, অন্যজন তাঁরই সরকার মিস্ত্রী—আশ্চর্য মিল দেখেছিলুম।

"যাকে রাখো, সেই রাখে!"

॥ ২ ॥

রাঁচীতে এসেছেন দাদামশায় হাওয়া বদল করতে। আমরা সবাই গেছি। ভোরবেলা প্রায় সকলের আগে উঠে দাদামশায় বেড়াতে বেরতেন। হাতে একটি লাঠি। বাড়ির বাইরে গেলেই, যেখানেই থাকুন না কেন, দাদামশার হাতে লাঠি থাকত। লাঠির একটা সংগ্রহ ছিল দাদামশার। লাঠি খুব ভালবাসতেন। চেরী কাঠের একটা ভারি সুন্দর লাঠি ছিল। বেতের লাঠি, বাঁশের লাঠি, ভালো ভালো বিলিতী লাঠি, রূপো বাঁধানো, পিতল বাঁধানো, সরু, মোটা, সোজা, বাঁকা, কত-রকম লাঠিই যে ছিল। রাঁচীতে যেটা নিয়ে বেড়াতেন তার নীচে লাগানো ছিল লম্বা ছুঁচোলো একটা লোহার নাল। এই নিয়ে তিনি রাঁচীর পাহাড়ে পাথর খুঁচিয়ে বেড়াতেন।

আমি যেদিন ভোরে উঠতুম সেদিন দাদামশার সঙ্গে পাথর খুঁজতে যেতে পেতুম। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। কোন মাঠে কি রকম পাথর পাওয়া যাবে সেটা যদিও দাদামশার মোটামুটি জানা ছিল, কিন্তু প্রায়ই চেনা জায়গা থেকে অজানা পাথর বেরিয়ে পড়ত। দাদামশার মুখে পাথরের কথা শুনতে শুনতে মনে হত পাথরেরা আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। জীবন্ত তারা সব। এ-ধারে ও-ধারে, এ-খাঁজে ও-খাঁজে সব গা-ঢাকা দিচ্ছে, তাদের খুঁজে বার করাই আমাদের খেলা। এই খেলায় দেখতুম দাদামশার অদ্ভুত চোখ। চলতে চলতে হঠাৎ খোঁচা দিতেন, ধুলো-বালির মধ্যে, মাটির চাংড়ায়। ঠিকরে বেরিয়ে পড়ত চমৎকার আকৃতির নুড়ি। ঘাসের মধ্যে হয়তো চুলের মত ফাঁক, তার মধ্যে দিয়ে কি একটু দেখা যাচ্ছে। দাদামশার চোখে ঠিক পড়েছে—তাকে টেনে বার করবেনই।

আমিও পাথর খুঁজতুম। আমার চোখে পড়ত চকচকে অভ্রখণ্ড। দাদামশায় সেগুলো ছুঁতেনই না। বলতেন ওগুলো কিছু নয়। তোর এখনও চোখ হয়নি। হীরে খোঁজ, হীরে খোঁজ। খুঁজতে হয় তো হীরে! অভ্‌ভর নিয়ে কি করবি? হীরে মাটির উপর পড়ে চকচক করে না, হীরে লুকিয়ে থাকে মাটির তলায়—খুঁড়ে বার করতে হয়।

দাদামশার সঙ্গে আমিও হীরের স্বপ্ন দেখতুম।

নানারকম পাথর সংগ্রহ করে দাদামশায় বাড়ি ফিরতেন। বাড়ি এসেই সেগুলি জলে ধুয়ে ফেলতেন। জলে ধুলে তাদের জৌলুস বাড়ত। কতরকম আশ্চর্য রঙিন অজানা পাথর বার হত। তার মধ্যে থাকত কিছু জলের মতো স্বচ্ছ স্ফটিক—প্রায় হীরেরই মতো দেখতে। কিন্তু হীরের কাছাকাছি হলেও আসল হীরে কোনোদিন বেরত না। এরই মধ্যে দু-একটা বড় গোছের পাথর বেছে নিয়ে দাদামশায় হঠাৎ রহস্য-মাখা স্বরে বলে উঠতেন—এটার ভিতরে হীরে আছে বলে মনে হচ্ছে। এটাকে ভাঙতে হবে।

আমার মনে বিদ্যুতের শিহরণ খেলে যেত।

—হাতুড়ি আন্।

আমারই হাতে হাতুড়ি দিয়ে বলতেন—দে, ঘা দে, ঐ জায়গাটায় আস্তে আস্তে।

সুন্দর পাথরটাকে ভেঙে ফেলতে আমার হাত উঠত না।

দাদামশায় উৎসাহ দিতেন—চালা হাতুড়ি। ফস্ করে হীরে বেরিয়ে পড়তে পারে, বলা যায় না।

আমি অতি সাবধানে হাতুড়ি চালাতুম। দাদামশায় শেষে থাকতে না-পেরে নিজেই ঘা দিতেন। পাথর টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ত। কিন্তু হীরে বার হত না।

বড় হয়ে অনেককে আমি গাছের পাতা, ফুল, ঝিনুক, পাখির পালক, প্রজাপতি সংগ্রহ করতে দেখেছি। কিন্তু পাথর সংগ্রহ করতে কাউকে দেখিনি।

কলকাতার বাইরে গেলেই দাদামশায় পাথর কুড়োতে বেরতেন। দেওঘরে দেখেছি, রাঁচীতে তো দেখেইছি, দার্জিলিং-এ দেখেছি, কার্সিয়ং-এ দেখেছি, শান্তিনিকেতনের খোয়াই-এও দেখেছি। এ এক অপূর্ব খেলা। হীরে খোঁজার নাম করে কত রকমের কত আশ্চর্য পাথর যোগাড় করেছিলেন তার ঠিক নেই। কলকাতায় ফিরে এসে পাথরগুলি দেখাতেন সবাইকে। বড়দাদামশায়, মেজদাদামশায়ও পরম বিস্ময়ে সেগুলি দেখতেন আর তারিফ করতেন।

দাদামশার একটি মজার পাথর ছিল। দেখতে অবিকল এক টুকরো পাঁউরুটির মত। অনেককে সেই পাথর দিয়ে ঠকানো হয়েছে। প্লেটে করে হঠাৎ সামনে ধরে দিলে কেউ টের পেত না। হাতে করে তুলে মুখে দিতে গেলে ওজনে বুঝে ফেলত পাথর। তখন যা হাসির ধুম। কিছু কিছু পাথর দাদামশায় পালিশ করিয়ে নিতেন। পালিশ করালে শক্ত রুক্ষ পাথরগুলি মসৃণ হয়ে যেত। সেইগুলিই ছিল সবচেয়ে লোভনীয়। যেমন ছিল তাদের রং, তেমনই সূক্ষ্ম স্বচ্ছ রেখাবিন্যাস, তেমনি ঠাণ্ডা স্পর্শ। আমার নিজের মনে হত হীরক-খণ্ডের চেয়ে সেগুলি অনেক বেশী দামী।

দাদামশায় তবু কিন্তু হীরেই খুঁজতেন। হীরে না-পেলে তাঁর মন উঠবে না। এই ভাবে হীরে খুঁজতে খুঁজতে তিনি একবার একটি অতি আশ্চর্য পাথর পেয়ে গিয়েছিলেন সম্পূর্ণ অভাবিত এক স্থান থেকে। সেই কথা এবার বলি।

দেওঘর কি রাঁচী ঠিক মনে নেই, সেখান থেকে কলকাতায় বাড়ি ফিরে এসে দাদামশায় একদিন সকালে তাঁর সংগৃহীত পাথরগুলি একে-একে পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। পাথরগুলি স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে লম্বা একটা কাঠের টেবিলের উপর। আমরা সবাই জড়ো হয়েছি। দক্ষিণের বারান্দা। দাদামশায় তাঁর শক্ত কাঠের চেয়ারে পা গুটিয়ে বসেছেন। পরনে লুঙি। ডানপাশে জার্মান-সিলভার-এর মস্ত এক গামলায় এক গামলা জল। একটা তেপায়া টুলের উপর সেটা বসানো। একটা করে পাথর তুলছেন আর সেই জলে ডুবিয়ে নিচ্ছেন। বাঁ দিকের চেয়ারে মেজদাদামশায় বসে বই পড়ছেন। ডানদিকের চেয়ারে বড়দাদামশায় বসে আঁকছেন ছবি। আমরা দাদামশার হাত থেকে মেজদাদার হাতে নিয়ে যাচ্ছি একবার পাথর, আর একবার বড়দাদার হাতে।

—এটাকে সন্ধ্যে বেলায় কুড়িয়েছিলুম, সূর্য-ডোবার মতো রং ছিল। সকালে দেখি একেবারে সাদা!

—দেখি, দেখি। সন্ধেবেলায় তাহলে আর একবার দেখতে হবে।

—এটাকে পাথর বলে মনেই হয় না। যেন মখমলের টুকরো।

—হ্যাঁ, একটা পুতুল বানালে হয়। মনে হবে মখমলের কাপড় পরে আছে।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, আলো ফেলে, হাত বুলিয়ে, যত প্রকার সম্ভব শিলাখণ্ডের রস-গ্রহণ করা হচ্ছে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। আমরা জানি যে আজ কতকগুলি পাথর ভাঙা হবে—তার ভিতরে কি আছে কেউ জানে না। হয়তো হীরে-ও বেরতে পারে। আমাদের প্রধান আকর্ষণ, প্রধান ঔৎসুক্য সেইখানেই।

গোল নুড়িগুলি একপাশে সরিয়ে রাখা হল। স্বচ্ছ কোয়ার্টজ-গুলিকে ঠেলে দিয়ে দাদামশায় বল্লেন—এগুলো হীরে নয়, অথচ হীরের মতো দেখতে। বড্ড ঠকায়।

তারপর গোটা দুই এবড়ো-খেবড়ো গোলমত পাথর নিয়ে বল্লেন—এগুলোকে ছেনি দিয়ে সাবধানে ভাঙতে হবে। কি বেরোয় দেখা যাক।

একটা পাথর আমার হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন—দেখছিস্ কত হালকা! ভিতরটা ফাঁপা। এরই মধ্যে সারি-সারি হীরে বসানো থাকে।

হাতুড়ি আর ছেনিটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন—ভাঙ তুই!

আমার তখন বুক দুর-দুর করতে আরম্ভ করেছে। কি করে খুলব আমি এ কপাট? সরে গিয়ে বল্লুম—আমি পারব না।

তখন দাদামশায় নিজেই কোলে একটা ঝাড়ন তাল পাকিয়ে রেখে তার উপর পাথরটাকে বসিয়ে ছেনি চালাতে শুরু করলেন। আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখতে লাগলুম। বড়দাদামশায় চীনে কালি দিয়ে কালোয় সাদায় যে ছবি আঁকছিলেন তা বন্ধ করলেন। মেজদাদামশায় তাঁর বই।

ছেনি ঠুকতে ঠুকতে হঠাৎ পাথরের গায়ে ফাটল ধরল। আমরা ঝুঁকে পড়লুম। তারপর ফুস্ করে যেন একটা জোড় খুলে গেল।

আমরা পরম বিস্ময়ে দেখলুম—পাথরের ভিতরটা সত্যি ফাঁপা আর তার গায়ে পরতে-পরতে সাজানো অপূর্ব নীলাভ স্বচ্ছ মিছরির দানার মতো সব দানা!

চেঁচিয়ে উঠলুম—হীরে!

সেই মুহূর্তে আমাদের স্থির বিশ্বাস হয়েছিল আমাদের চোখের সামনে সাধনার ধন এক হীরকের খনি জ্বলজ্বল করছে।

দাদামশায় খানিক চুপ করে রইলেন, তারপর বল্লেন—এগুলো আসল হীরে নয়। একে বলে পাহাড়ের দাঁত।

হায়, হায়, এই যদি আসল হীরে না হয়, তবে আসল হীরে কি? আমাদের মনের তখন যা অবস্থা।

দাদামশায় ততক্ষণে আর একটা সেইরকম পাথর নিয়ে ভাঙতে শুরু করে দিয়েছেন। এটা আগেরটার চেয়ে শক্ত। দমাদ্দম ঘা পড়ছে কিন্তু কিছুতেই ভাঙতে চাইছে না। তারপর হঠাৎ এক সময় চার টুকরো হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল পাথরটা। একটি টুকরো ছিটকে গিয়ে পড়ল বারান্দার রেলিংএর ধারে।

—ওরে দেখ্ দেখ্। হীরে পালালো, হীরে পালালো।—দাদামশায় চেঁচিয়ে উঠলেন। আমরা হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পাথরের টুকরোটাকে কুড়োলুম।

এ পাথরটারও ভিতরে ফাঁপা আর তার গায়ে গায়ে মিছরির দানার মত সারি সারি দানা। জোরে ঘা লাগার ফলে কয়েকটা দানা ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছিল। মেঝে থেকে দানাগুলি আমরা কুড়োলুম। দাদামশায় খুঁত খুঁত করতে লাগলেন—ভালো করে দেখ্, হীরে-টিরে খসে পড়ল কি না।

হীরে না পেয়ে দাদামশার মন খারাপ হয়ে গেল। নিজে উঠে একবার খুঁজে দেখলেন কোথাও কিছু পড়ে-টড়ে আছে কি না। তারপর পাথরগুলিকে গুছিয়ে তুলে রেখে দিলেন।

পরদিন ভোরে উঠে দাদামশায় বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। জোড়াসাঁকো বাড়ির বাগান হলে হবে কি, রাঁচীর অভ্যেস তখনও যায় নি। বাগানেই পাথর খুঁজছেন। বার বার ঘুরে ঘুরে আসছেন বারান্দার নীচের সেই জায়গা-টায়—যদি কালকের পাথরের টুকরো দু-একটা পান। হীরেও তো থাকতে পারে! আমার একটি মাসতুতো বোন—ছোট একটি খুকী—বারান্দার নীচের ঠিক সেই জায়গাতেই সিঁড়ির ধারে ঘুরঘুর করছিল। দাদামশায় দেখতে পেলেন সে মাটি থেকে কি একটা চকচকে জিনিস তুলে একবার দেখেই টপ করে মুখে পুরল।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দাদামশায় বললেন—দেখি কি খেলি মাটি থেকে কুড়িয়ে।

মেয়েটি মুখ হাঁ করতে দেখা গেল ছোট্ট একটি কাঁচের টুকরোর মতো কি যেন।

—বের কর শিগগীর!

মুখ থেকে জিনিসটা বেরতে দেখেন—এতটুকু তেঁতুল বীচির মতো অদ্ভুত একটি পাথর। বাদামী তার রং। আলোর দিকে ধরলে স্বচ্ছ দেখায়। আর সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, তার ঠিক মাঝখানে একটি মৌমাছি জমে পাথর হয়ে রয়েছে।

—নিশ্চয় ব্যাটা খসে পড়েছে। কাল থেকে কেবলই মনে হচ্ছে কথাটা। এই বলতে বলতে সেটিকে হাতের মুঠোয় করে উপরের বারান্দায় উঠে এলেন। তারপর আমাদের সবাইকে ডেকে দেখালেন। প্রস্তরীভূত সেই নিখুঁত পতঙ্গ কোথা থেকে এ জোড়াসাঁকোর বাগানে এল তা কেউ বলতে পারলে না। আমরা ছোটরা চমৎকৃত হলুম।

দাদামশার-ই আনা পাথরের টুকরো থেকে জিনিসটা ভেঙে পড়েছিল, না আর কোথাও থেকে এসেছিল—এ রহস্যের সমাধান কোনোদিন হয়নি।

দাদামশাই সেই অপূর্ব পাথরটি বাঁধিয়ে আংটি করিয়েছিলেন। প্রায়ই পরতেন। অনেকেই তাঁর হাতে সে-আংটি দেখেছেন। সে আংটি আজও সযত্নে রক্ষিত আছে বড়মামার কাছে।

দাদামশায় বলতেন—হীরে পাওয়া আমার ভাগ্যে আর হল না। কিন্তু এ যা পেলুম, তা-ও বড় কম নয়।

আর বলতেন—

যেখানে দেখিবে ছাই,
উড়াইয়া দেখ ভাই,
পেলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন?

॥ ৩ ॥

আরো হীরে খোঁজার গল্প আছে। এবারে আর পাহাড়ে মাঠে নদীর কিনারায় বা ভাঙা খোয়াই-এর মধ্যে নয়। একেবারে খোদ কলকাতায়—জোড়াসাঁকোতেই।

বহু বছর দাদামশায় কলকাতার বাইরে যান নি। হীরের সন্ধান করবেন কোথা থেকে? ফলা-ওয়ালা লাঠির ফলায় মরচে পড়ে গেছে। কিন্তু হীরের স্বপ্ন তখনও দেখেন। পুরনো পাথরগুলি নাড়াচাড়া করেন, জলে ধুয়ে ধুয়ে দেখেন। পাথরে ছেনি চালান। আগে ছেনি চালাতেন পাথরটাকে ভেঙে দেখবার জন্যে, ভিতরে কি আছে। আজকাল আর ভালো পাথরগুলিকে ভেঙে নষ্ট করতে চান না। ঠুক্ ঠুক্ করে ছেনি চালান আর পাথরের মধ্যে থেকে আশ্চর্য সমস্ত মূর্তি বেরিয়ে আসে। এত সহজে এত কম ঠোকাঠুকি করে মূর্তিগুলিকে পাথরের মধ্যে থেকে বার করে নিয়ে আসেন যে অবাক লাগে।

অনেকের ধারণা দাদামশায় শেষ বয়সে টুকরো-টাকরা নুড়ি-পাথর, কাঠি-কুটি, ডাল-পালা সাজিয়ে 'কুটুম-কাটাম' বানাতে শুরু করেছিলেন। শুরু কিন্তু তিনি শেষ বয়সে করেন নি, করেছিলেন বহু আগে। এই যে পাথরগুলিকে কাটতেন সাজাতেন এ সবই কুটুম কাটাম। দাদামশায় বলতেন এরা আমার সব কুটুম। সঙ্গে নিয়ে বসতেন, সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন, সাজিয়ে রাখতেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেন। কুটুম-কাটামের প্রধান ধর্ম, ডালই হোক, শিকড়ই হোক, পাথরই হোক বা ঢেলাই হোক, তার থেকে কুঁদে কিছু বার করা চলবে না। শুধু যেখানে যা অবান্তর আছে তাকে কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। ন্যূনতম ভাঙ-চোরের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসবে সৃজিত দ্রব্যের আসল রূপ। এটা দাদামশার বরাবরই আমরা দেখেছি।

একটা পাথর পকেটে নিয়ে ঘুরছেন ক'দিন। টুক্-টাক্ ঠুক্-ঠাক্ চলেছে তার উপর। পাথরটা শক্ত। ছেনির ঘায়ে সহজে ভাঙতে চায় না। তাহলেও তার মধ্যে থেকে একটা আকৃতি বেরিয়ে আসছে। পকেটে পকেটেই থাকে পাথরটা। বসেন যখন সামনে রেখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন। দেখা হয়ে

গেলে আবার পোরেন পকেটে। গেছেন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টস্‌-এর বাড়িতে। আমরা বলতুম, 'সোসাইটি'। সোসাইটিতে তখন উড়িষ্যার কারিগর গিরিধারী আর তার ছেলে শ্রীধর পাথরের কাজ করে। দুজনেই ওস্তাদ ভাস্কর। অনেক ভালো ভালো পাথরের মূর্তি গড়েছে। শ্রীধরকে ডেকে দাদামশায় বললেন—দেখ তো শ্রীধর এই পাথরটা। শ্রীধর পাথরটা নেড়ে দেখলে একটা মূর্তি প্রায় বেরিয়ে এসেছে। চোখে তার বিস্ময়। এত শক্ত পাথর নিয়ে শ্রীধর বা গিরিধারী কাজই করে না।

দাদামশায় বললেন—এই যে দেখছ একটুখানি, এটাকে উড়িয়ে দিতে পারো শ্রীধর? বলে একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন।

শ্রীধর পাথরটা নিয়ে যায় দেখে দাদামশায় বললেন—শোনো, শোনো, শুধু এইটুকু। বেশী নয়। ছেনি দিয়ে টুক করে উড়িয়ে দাও। দেখো যেন আবার 'ফিনিশ' করতে যেও না।

পাথরটা হাতে নিয়ে নখ দিয়ে দেখিয়ে দিলেন জায়গাটা। শ্রীধর চলল পাথর নিয়ে ঘরের কোণে, যেখানে তার যন্ত্র-টন্ত্র থাকে, সেই দিকে।

কিছু দূর গেছে, দাদামশায় আবার তাকে ডাকলেন।

—দেখো যেন ফিনিশ-টিনিশ করতে যেও না। শুধু উড়িয়ে দেবে ঐটুকু। শ্রীধর থমকে দাঁড়িয়েছিল, আবার এগুলো।

দাদামশায় এবার উঠে পড়লেন। বললেন—থাক্‌ শ্রীধর। তুমি আবার ফিনিশ করে বসবে। দাও বরং আমাকে। বলে পাথরখানা শ্রীধরের হাত থেকে নিয়ে আবার পকেটে পুরলেন।

অমন যে উড়িষ্যার দক্ষ ভাস্কর, তার হাতেও পাথর দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন না। কুটুম-কাটামের কাজ বড় সহজ ছিল না।

দিদিমা একবার কেমন করে হাত ফস্কে সাদা রং-এর একখানা পাথরের রেকাবি ভেঙে ফেললেন। পুরোনো দিনের দামী রেকাবি, আজকাল সেরকম পাওয়াই যায় না। দিদিমার মনে ভারি দুঃখু। কিন্তু দাদামশার ফুর্তি দেখে কে।

বললেন—নিয়ে আয় টুকরোগুলো ধুয়ে ফেল্‌ দেখি।

পাথর পেলেই জলে ধোওয়া চাই। জলে ধুলে ভিজে অবস্থায় পাথরের রং তো খুলতই, তাছাড়া পাথরের রেখাগুলিও স্পষ্ট হয়ে উঠত।

দাদামশায় একটা টুকরো বেছে নিয়ে বললেন—দেখচিস্ কি চমৎকার ছবি রয়েচে। ওকে আটকাবে কে? ভেঙে বেরিয়ে এল।

আমাদের চোখে ছবি-টবি কিছু পড়ল না। কিন্তু দাদামশায় তখনই কাজে লেগে গেলেন। আর, কি আশ্চর্য, দু-একটা ছেনির আঁচড় পড়তেই আমরা দেখলুম একটি সুন্দর গড়নের মেয়ের আকৃতি বেরিয়ে আসছে। একদিন কি দুদিন লেগেছিল কাজটা শেষ করতে। যখন ছেনির শেষ ঘা পড়ল, তখন আর সেটা রেকাবির ভাঙা টুকরো নেই। তখন সেটা হয়ে গেছে ছবি। পাথরে কাটা মনোহর এক মূর্তি।

দিদিমাকে দেখিয়ে বললেন—এই নাও, তোমার ভাঙা পাথর। নতুনের চেয়েও দাম বেড়ে গেল।

এই ঘটনার পর এ-কোণ ও-কোণ থেকে এ-তাক ও-কুলুঙ্গী থেকে সকলে ভাঙা পাথর-বাটি খুঁজে বার করতে থাকল আর দাদামশার কাছে এনে হাজির করতে লাগল। ভাঙা বাটি গেলাস রেকাবি থেকে দাদামশায় সে সময় অনেকগুলি ভালো ভালো চিত্র কুঁদে বার করেছিলেন।

এই রকম যখন পুরোদমে পাথর কাটা চলেছে, সেই সময় হঠাৎ আমরা খবর পেলুম, কত্তাবাবা তাঁর দল নিয়ে আসছেন জোড়াসাঁকোতে। বর্ষামঙ্গল হবে-হবে শুনে আসছিলুম, সেই বর্ষাকালের আরম্ভ থেকে। এদিকে বর্ষা তো প্রায় খতম। কত্তাবাবা এসে পৌঁছতেই শুনলুম, এবার হবে 'শেষ বর্ষণ'। বর্ষার মেঘের গানও রইল, শরৎ-লক্ষ্মীও রইলেন, শিউলি ফুলও বাদ পড়বে না।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ক'দিন ধরে খুব রিহার্সাল চলল। শান্তিনিকেতন থেকে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা ছাড়াও আমাদের বাড়ির অনেকে যোগ দিলেন। অভিনয়ের তোড়জোড় শুরু হলে যেমন হয়, এ-বাড়ি ও-বাড়ি সরগরম হয়ে উঠল। তিন দাদামশায় প্রায় সব সময়ই ও-বাড়িতে গিয়ে বসে থাকতে লাগলেন, রিহার্সাল দেখতে লাগলেন, পরামর্শ দিতে থাকলেন।

কত লোক আসা-যাওয়া করত সে সময় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। হাট বসে যেত। বড় কম লোক হত না রিহার্সাল শোনবার। সে কি যে-সে রিহার্সাল? কত্তাবাবা নিজে চালাচ্ছেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। সত্যি কথা বলতে কি, আসল জলসার চেয়ে রিহার্সালটাই উপভোগ্য হত বেশী।

যাই হোক, শেষে 'শেষ বর্ষণ' হল—একদিন, ছুদিন, তিনদিন। হল জোড়াসাঁকোর ছ-নুম্বর বাড়ির উঠানে। লোকে লোকারণ্য হল। জমজমাট হয়ে উঠল জোড়াসাঁকোর গলি, জোড়াসাঁকোর বারান্দা, জোড়াসাঁকোর উঠোন আর আমাদের মন, প্রাণ, অন্তর। তারপর যেদিন শেষ জলসা দেখে আমরা ঘরে ফিরে সবে মন-খারাপ করতে শুরু করেছি সেই সময় হঠাৎ শোনা গেল, আরো একদিন শেষ বর্ষণ হবে। বেলজিয়ামের রাজা-রানী কলকাতায় এসেছেন—তাঁদের দেখানো হবে। আবার মন চাঙ্গা হয়ে উঠল আমাদের। রাজা-রানীকে 'শেষ বর্ষণ' দেখাবার তোড়জোড় শুরু হল নতুন করে। শোনা গেল, কিছু টাকার আশা আছে শান্তিনিকেতনের জন্যে।

রাজা-রানী বলে কথা, স্বয়ং লাটবাহাদুরের অতিথি। তাঁদের বসবার জন্যে ভারি ভারি মখমলের গদি-দেওয়া আরামকেদারা এল। চওড়া চওডা ধাপের উপর সাজানো হল। দেখতে হল যেন 'রয়েল বক্স'।

তারপর সন্ধের সময় রঙ্গাভিনয়ের আগে রাজা-রানী এলেন তাঁদের সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে। সেদিন-ও উঠোন-ভর্তি দর্শক—অভিনয় খুব জমেছে। কিন্তু দাদামশায় ভিতরে ঢোকেন নি। আগেই দেখে নিয়েছেন যা দেখার। স্কেচ করেছেন। ছবি আঁকাও হয়ে গেছে খানকতক। আর আসল কথা, রাজা-রাজড়া, নামজাদা হোমরা-চোমরা লোকের ভিড়ে দাদামশায় ঘেঁষতেন না কখনও।

উঠোনের বাইরে গাড়ির ভিড়, লোকজনের ভিড়। উপরের বারান্দা থেকে দাদামশায় দেখেন সেই ভিড়ের মধ্যে মোটার-বাইক-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক গোরা সার্জেণ্ট। বেলজিয়ামের রাজ-পরিবারকে লাট-সাহেবের বাড়ি থেকে পথ দেখিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে সে। রাজা-রানী

তাঁদের পারিষদ নিয়ে ভিতরে ঢুকে সোফায় বসে বেশ তোফা গান শুনছেন, আর যে-বেচারা তাঁদের হাট-মাঠ পেরিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এল, তার দিকে কেউ ফিরেও তাকাল না, এটা দাদামশার একেবারেই পছন্দ হল না।

তিনি বারান্দা থেকে নীচে নামলেন। নেমে সার্জেণ্টের কাছে গিয়ে বললেন—সায়েব, সবাই গেল, তুমি যাবে না?

সায়েব ভারি বিব্রত হয়ে পড়ল। গান শোনবার ইচ্ছে খুব, কিন্তু হাজার হোক চাকর তো? রাজা-রানীর সামনে দিয়ে আসরে গিয়ে বসে কি করে? রাজা যদি দেখতে পান, কি ভাববেন?

দাদামশায় বললেন—এই কথা? কোনো ভাবনা নেই। রাজা যেদিকে মুখ করে বসেছেন, তার পিছনে তোমায় বসিয়ে দেব—রাজা বা রানী কেউ টেরই পাবে না।

এই বলে তাকে নিয়ে গিয়ে উঠোনের অন্ধকার খিড়কি দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন।

সায়েবকে বসিয়ে দিয়ে এসে তবে নিশ্চিন্ত।

শেষ বর্ষণের গান নাচ হয়ে যাবার পর দাদামশায় কত্তাবাবাকে বলেছিলেন—রবি-কা, পুলিসের সার্জেণ্ট পর্যন্ত তোমার শেষ বর্ষণের সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে।

শুনে কত্তাবাবার মুখে হাসি আর ধরেনি।

যাই হোক শেষ বর্ষণ তো হয়ে চুকলো। পরদিন দাদামশায় ভোরে উঠেছেন। আমাদের ডেকে বললেন—চল্ একবার ও-বাড়ির উঠোনটা ঘুরে আসি।

দাদামশার সঙ্গে ঘুরতে যাবার ডাক পেলেই আমরা আনন্দে ছুটে যেতুম। চললুম সকলে। কেন যাচ্ছি জানি না—ও-বাড়ির খালি উঠোনে সারি-সারি চেয়ার কৌচ বেঞ্চি পড়েছে, এক-দিকটা ঘিরে স্টেজ বাঁধা হয়েছে—তার মধ্যে ঘুরে বেড়াতেই তো কত মজা—হয়তো সেইজন্যেই যাচ্ছি—কে জানে? অভিনয়-পর্বের সময় ও-বাড়ির উঠোনে একবার স্টেজ বাঁধা হয়ে গেলে ঐ জায়গাটা আমাদের পক্ষে বিষম আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়াত।

চিরদিনের নেহাত অকেজো সাধারণ উঠোনটা হঠাৎ কিসের ছোঁয়ায় এক রহস্যময় লোভনীয় জগৎ হয়ে পড়ত। দাদামশায় উঠোনে ঢুকেই সোজা চললেন মখমলের কৌচগুলোর দিকে, যেখানে কাল রাতে রাজা-রানী আর তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গরা জাঁকিয়ে বসেছিলেন।

বললেন—খোঁজ ভাল করে। হীরে-টীরে পাওয়া যায় কি না দেখ্।

রাজা-রাজড়ার ব্যাপার। অপেরা থিয়েটার দেখতে এসেছে—নিশ্চয় গায়ে-গলায় হীরে-জহরত ঝুলিয়ে এসেছে। এর থেকে কি দু-একখানা ছিটকে পড়বে না?

—খোঁজ্ ভাল করে। উল্টে-পাল্টে দেখ্। হীরে কি সহজে চোখে পড়ে রে—

হীরক-সন্ধানী সারা জীবন জহরতের সেরা জহরত কোহিনূর হীরে খুঁজে বেড়িয়েছেন। হীরের কথা তিনি কি ভুলতে পারেন?

আমরা ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠলুম। সত্যিই তো। রাজা-রানীর পক্ষে মুঠো মুঠো হীরে ছড়িয়ে চলে যাওয়াও কিছুই নয়। খুঁজতে লেগে গেলুম আমরা আঁতি-পাঁতি করে।

নিজেই খুঁজতে লেগে গেলেন দাদামশায় আমাদের সঙ্গে। বললেন—আরে কৌচ-এর নীচে অত খুঁজচিস্ কি? গদিগুলোর ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে দেখ। হীরে পড়লে ঐখানেই পড়বে।

বললেন—তোদের হাতগুলো সরু আছে—দে চালিয়ে গদির ভিতর।

আমরা মহা উৎসাহে সেদিন হীরে খুঁজেছিলুম। মনে মনে প্রাণপণে একখানি ছোট্ট হীরে চেয়েছিলুম—সাম্রাজ্ঞীর রত্নচূড় থেকে খসে-পড়া এতটুকু একটি হীরে! হায়, কেন যে পেলুম না!

যদি সত্যি পেয়ে যেতুম সেদিন—আঃ, কি ভালই না লাগত!

জোড়াসাঁকো বাড়ির বাগানকে আমরা ছেলেবেলায় যে-রূপে দেখেছি আমাদের কাছে তা ছিল অদ্ভুত ভাবে আকর্ষণীয়। আমাদের জন্মাবার অনেকদিন আগে, শুনেছিলুম, ঐ বাগান ছিল যাকে বলে 'সাজানো বাগান।' সাজানো বাগান কাকে বলে তার পরিচয় আমরা প্রচুর পেতুম যখন কোনো ধনী আত্মীয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণে যেতুম। সুরকি-পেটা, কাঁকর-ফেলা রাস্তা—দুধারে তার হেলানো-ইঁটের পাড়। ছাঁটাই-করা দূর্বাঘাসে ঢাকা সবুজ জমির মাঝখানকে বিদ্ধ করে গোল ফুলের কেয়ারি। সুসমতল ভূমির উপর জ্যামিতিক রেখা আর বৃত্তের কষ্টকর বন্ধন। ভাগ্যিস্ জোড়াসাঁকোর বাগান ঐ রকম ছিল না।

ইঁট, কাঠ, লোহা, সিমেণ্ট গাঁথা অতিব্যস্ত কলকাতা শহরের মাঝখানে আমাদের যে বাগান তা ছিল একেবারে ছুটির জগৎ। এক সময় শুনেছি জোড়াসাঁকোর বাগানে অনেক মালী খাটত। আমরা যখন দেখেছি তখন জোড়াসাঁকো বাড়ির মালীর বহর কমতে কমতে দু-টিতে ঠেকেছে। তার মধ্যে একজনের নাম ভাগবত—আমরা বলতুম সর্দার মালী। এককালে সর্দার-ই ছিল সে। তার তাঁবেদারি করত যারা তাদের সর্দার ছিল। এখন সর্দারের নীচে শুধু একজন—তার নাম ছিল যোগী। তবু আমরা ভাগবত মালীকে সর্দার মালী বলেই ডাকতুম। মাত্র এই দু-জন মালীর তদারকে আমাদের বাগান সেলুনে-ছাঁটা মাথার মতো দেখাত না বটে, এখানে ওখানে গাছগুলো যথেচ্ছ বাড়ার অবাধ স্বাধীনতা পেত বটে আর দূর্বার পাশে মুথা আর উলু ঘাস অব্যাহত আনন্দে গজিয়ে উঠত, কিন্তু আমাদের কাছে সেইটেই ছিল পরম বিস্ময়।

আমাদের ছিল একটা 'গোল-বাগান'। গোল তার আকৃতি, তাকে ঘিরে টালি-বাঁধানো একটি রাস্তা। গোল-বাগানের মাঝটিতে ফুলের কেয়ারির বদলে ছিল একটি ফোয়ারা—দেখতে ঠিক একটি প্রকাণ্ড ঝিনুকের মতো।

—হবে হবে, গাছ বড় হোক!

আমরা ধৈর্য ধরে থাকতুম।

প্রতি বছরই আম গাছ উঁচু হত। বাড়তে বাড়তে বাবুর্চিখানার মাথা ছাড়িয়ে গেল। বাবুর্চিখানার ছাদে উঠে আমের পাতা ছিঁড়ে আমের ডাল ভেঙে আমরা তার গন্ধ শুঁকতুম আর ভাবতুম কবে ডাল ভরে ফল আসবে। কবে পাতার ফাঁকে ফাঁকে দুলতে থাকবে গোল গোল রসাল আম। একবার মুকুল ধরল কিছু কিন্তু ফল এলো না। অবশেষে এক বছর শীতকালে সেই হিমসাগর—হিমের সাগর আমের বোলে ভরে গেল। বড়দাদামশায় যোগী মালীকে ডেকে হুকুম দিলেন—গাছে যত ফল হবে সব বাঁচানো চাই। প্রথম বারের ফল একটিও যেন নষ্ট না হয়। কী বোল-ই সেবার ধরেছিল টক-আমের গাছে হিমসাগর আমের গাছে দুইয়েতেই! তারপর এল মাঘের কুয়াশা। আমের মুকুল এসেছিল যেমন প্রাচুর্য নিয়ে ঝরেও পড়ল তেমনি। তারপর ক্রমে চৈত্রমাসে আমের গুটি ধরল। বড়দাদামশায় ভোরবেলা উঠে বাগানে নামতেন আর যোগী মালীকে সঙ্গে করে ঘাড় উঁচু করে দেখতেন কোন্ ডালে কটা গুটি ধরেছে। তারপর বৈশাখের খর-রৌদ্রে আমের গুটি ঝরতে আরম্ভ করল। তার উপর এল কাল-বৈশাখী। এক-একটা ঝড়ের ঝাপটা আসত আর দক্ষিণের বারান্দা থেকে আমরা দেখতুম গাছের ডালগুলি মাথা ঝাঁকিয়ে আমের গুটিগুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। এইভাবে কমতে কমতে সমস্ত আম পড়ে গেল, রইল শুধু একটি।

বৈশাখী ঝড় তখন থেমে গেছে। ঐ একটি আমকে রক্ষা করবার জন্যে বাড়ির আমরা সবাই উঠে পড়ে লেগেছি। বড়দাদামশায়, মেজদাদামশায়, দাদামশায় মাঝে মাঝে বাগানে নেমে এসে দেখে যান আম। দক্ষিণের বারান্দা থেকে দাদামশায়রা দেখবার চেষ্টা করেন। পাতার আড়ালে লুকো-চুরি করে আম। দেখতে না পেলে হাঁক দিয়ে ওঠেন—ও রে, দেখ তো, আমটা গেছে বুঝি! যোগী মালীর চোখে ঘুম নেই। আমগাছটা ছিল আবার বাগানের প্রান্তে মদন চাটুজ্যে লেনের গায়ে। পাছে সেই গলি থেকে কেউ আম চুরি করে নিয়ে পালায় আমাদের সব সময় সেই ভয়।

কিন্তু শিবরাত্রির সলতে সেই আম শেষ অবধি রক্ষা পেল। আম পেকে এল। হিমসাগর আম—পাকলে আবার রং ধরে না, সবুজ থাকতেই নামাতে হবে। যোগী মালী গাছে উঠে-উঠে দেখে আসতে লাগল আমের অবস্থা কেমন।

তারপর একদিন গ্রীষ্মের সকালে যখন তিন দাদামশায় দক্ষিণের বারান্দায় বসে আছেন, বড়দাদামশায় আর দাদামশায় ছবি আঁকছেন আর মেজদাদামশায় পড়ছেন বই, সেই সময় যোগী মালী একটি থালায় করে আমটি নিয়ে বারান্দায় ঢুকল।

বড়দাদামশায় বললেন—দেখি। হাতে তুলে নিয়ে একবার শুঁকে বল্লেন—হুঁ বেশ পেকেছে। ধুয়ে নিয়ে আয় তো। অবন, চাকবে নাকি?

দাদামশায় বললেন—তুমি আগে দেখ। সমর-দাকে দিও, তারপর দিও আমায়।

মেজদাদামশায় ঘাড় ফিরিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে একবার দেখলেন।

তারপর থালার উপর একটি চকৃচকে ছুরি আর সদ্যধোওয়া আমটি নিয়ে যোগী আবার বারান্দায় ঢুকলো।

কত দিনের কত বছরের কত আশার আম। বড়দাদামশায় তুলি রেখে ছুরি তুলে নিলেন। তারপর আমটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একপাশ থেকে ছোট একটি চাকৃলা কাটলেন। কেটে নিয়ে মুখে দিয়ে বললেন—বাঃ কি চমৎকার। দাও সমরকে দাও।

যোগী থালা হাতে মেজদাদামশার কাছে উপস্থিত হল। মেজদাদামশায় আর এক চাকৃলা সাবধানে কেটে নিয়ে মুখে ফেলে একবার বড়দাদামশায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—বেড়ে খেতে তো। অবন তুমি নাও এবার।

দাদামশায় দেখলেন বেশীর ভাগ আমটাই তাঁর জন্যে রাখা হয়েছে। যে ছবিটা আঁকছিলেন তাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে পাশে যে গামলায় ছবি আঁকার জল থাকতো তাইতে হাত ডুবিয়ে নিয়ে থালা সুদ্ধ আম কোলে টেনে নিলেন। বললেন—ছুরি নিয়ে যা।

তারপর আঙুলে করে খোসা ছাড়িয়ে আমে একটা কামড় দিয়েই—আরে থুঃ থুঃ! এ যে টক বিষ!

একবার বড়দাদামশায়ের দিকে তাকান, একবার মেজদাদামশায়ের দিকে। তারপর তিন ভাই-এ হো হো হাসি।

হাসির শব্দ শুনে আমরা ছুটে এসে দেখি আধ-খাওয়া আম মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। যোগী মালী হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে। দাদামশায়দের চোখে কিন্তু কৌতুকের আলো উপচে পড়ছে, হিমসাগর আম চিরতরে টকে যাওয়া সত্ত্বেও।

॥ ৫ ॥

গোল-বাগান আর বড়বাগানের মাঝে টালির ছাদ দেওয়া একখানা চালাঘর ছিল, তার চার পাশ ছিল খোলা, কোনোদিকে কোনো দেয়াল ছিল না। সেই ঘরের মেঝেয় ছিল তিনখানা লোহার বেঞ্চি আর একখানা লোহার টেবিল। টেবিলের গোল মাথাটায় ছিল চীনে রাশিচক্রের ডিজাইন জাফ্রি করে কাটা। ঘরের একদিকে ছিল এক বুগেনভেলিয়া লতা আর অন্যদিকে এক নাম-না-জানা বিদেশী লতাগুচ্ছ। বহুদিনের পুরোনো দুটো গাছ। এদের মোটা মোটা ডালপালা জড়িয়ে জড়িয়ে কালো কালো দড়াদড়ির মতো ছাদে উঠে সমস্ত ছাদটাকে ঢেকে ফেলেছিল। তারই ঘন-পাতার সবুজ ঘেরা টোপে সারা বছর সাজানো থাকত এই চালাঘরের ছাদ। আর সেই পাতা আর ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে পাখির দল নিশ্চিন্তে বাসা বাঁধত। মৌমাছিরা করত চাক। এই বিদেশী লতাটা বিরাট আকৃতি ধারণ করেছিল। তার ঘন পাতার আড়ালে বুগেনভেলিয়ার ফুল ফুটতে পেত না। তার নিজের ডালে ডালে প্রায় বারোমাসই ফুটত অজস্র ছোট ছোট সাদা ফুল। আর এই সাদা ফুলের মধ্যে মাছি আটকা পড়ত পালে পালে। কি যে সে লতার নাম তা যোগী মালীও জানত না, সর্দার মালীও নয়। এই ছিল আমাদের 'সামার হাউস', আমাদের আশ্রয়, আমাদের নীড়। বাগানে খেলছি, হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেছে, ছুটতুম সামার হাউসে মাথা বাঁচাতে।

বর্ষার সময় অক্লান্ত বৃষ্টিতে বাড়িতে বসে আর ভালো লাগছে না, ছুটলুম গাছে ঢাকা সেই ঘরে। লোহার বেঞ্চির উপর বসে সামার হাউসের চারি-পাশে ঘেরা বাগানের ঘাসের উপর বৃষ্টির খেলা দেখতে দেখতে মন খুশী হয়ে উঠত। গ্রীষ্মের প্রখর দুপুরেও সেখানকার শীতল আশ্রয়ে কত সময় পালিয়ে আসতুম আর শুনতুম গাছে-ঢাকা ছাদ থেকে ভেসে-আসা ঘুঘুর অক্লান্ত ডাক।

এই সামার হাউসের একটা অংশ ছিল জাল দিয়ে ঘেরা। ঘেরা অংশের মেঝে ফুঁড়ে বসানো ছিল ডাল-পালাওয়ালা একটা গাছের শুকনো গুঁড়ি। এটি এককালে ছিল দাদামশার পাখির খাঁচা। দাদামশায় পালে পালে পাখি কিনে এনে এই খাঁচার মধ্যে ভরতেন। তারা জল খেয়ে, দানা খেয়ে, গাছের ডালে বসে ক'টা দিন কাটাত, তারপর দাদামশায় আস্তে আস্তে তাদের ছাড়তে আরম্ভ করতেন। দাদামশার বিশ্বাস ছিল, এইভাবে ছেড়ে দিলে তারা জোড়াসাঁকোর বাগানের পরিসীমার মধ্যেই থেকে যাবে। শহরের মধ্যে বনের পাখি যাবে কোথায়? শহরের মধ্যে জোড়াসাঁকোর বাগান ছিল পাখিদের একটা 'ওয়েসিস্'—কাজেই সেখানেই তাদের থাকতে হবে। পালাতে গেলেও ঘুরে ফিরে আবার ফিরে আসতে হবে। বেশ কিছুদিন পাখিগুলো থেকেও যেত। গোল-বাগানের ফোয়ারায় ডানা ঝটপট্ করে স্নান করত। শিশু গাছে বসে শিস্ দিত। পোকা-মাকড় ধরে খেত। ক্বচিৎ কখনও দানাও খেয়ে যেত। তারপর ধীরে ধীরে তাদের দল কমতে থাকত। জোড়াসাঁকোর ওয়েসিস্ ছেড়ে বুনো-পাখির দল কোন্ বনে যে উড়ে পালাত তার খবর কেউ পেত না। তারপর সব পাখি একে-একে চলে গেলে দাদামশায় আবার এক ঝাঁক পাখি কিনে আনতেন। আবার ঐ খাঁচার মধ্যে তাদের দিনকতক আশ্বস্ত করে রেখে বাগানে ছাড়া হতে থাকত। বাগানের মধ্যে তাদের ভুলিয়ে রাখার জন্যে ডালে-ডালে বাসা বেঁধে দেওয়া হত। ঝোপ ঝাড় কুঞ্জবন বানিয়ে তাদের নিরালা নির্ভর জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করা হত। ঘর বাঁধুক, বাচ্চা পাড়ুক, সংসার পেতে বসুক—এই ছিল দাদামশার মনের ইচ্ছে। মায়ায় পড়ে পাখিরা রয়ে যেত

কিছুদিন জোড়াসাঁকোর ঐ বাগানে। তারপর কবে আবার বনের দুর্বার ডাক এসে পৌঁছত। একদিন দেখা যেত বনের পাখিরা সব বাগান ছেড়ে পালিয়েছে।

দাদামশার এ খেলা আমরা অবশ্য দেখিনি। দাদামশার মুখেই শুনেছিলুম এর গল্প। খেলার চিহ্ন সামার হাউসের লাগাও সেই জালের খাঁচাটা দেখেছি।

একদিন শীতকালের দুপুর। শীত বেশ পড়েছে। রোদে পা দিয়ে বসে থাকতে ভালো লাগে। আমরা ক'টি ছেলে সামার হাউসে বসে শীতের রোদ পোয়াচ্ছি, দক্ষিণ দিক থেকে হিজল গাছের মাথার উপর দিয়ে মিঠে রোদ এসে পড়েছে পাথরের মেঝেতে। এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল গোল-বাগানের ফোয়ারার চীনে বাড়ির উপর এক আশ্চর্য পাখি। এক সাদা রং-এর বুলবুলি। বুলবুলি চিরকেলে কালো। সাদা রং-এর বুলবুলি একেবারে অবিশ্বাস্য। দেখেও প্রত্যয় হয় না। আমরা ঠিক করলুম ওটাকে ধরতে হবে। আর স্থির হয়ে বসে থাকা অসম্ভব হল। আমাদের চঞ্চলতা আর ছট্‌ফটানি দেখেই বোধহয় একটা তীক্ষ্ণ ডাক দিয়ে বুলবুলিটা উড়ে গিয়ে বসল শিশু গাছে।

আমি ছুটলুম দোতলার বারান্দায় দাদামশায়কে খবর দিতে—বাগানে একটা সাদা বুলবুলি এসেছে।

দাদামশায় শুনে মহা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ছবি আঁকা-টাকা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বল্লেন—বলিস্ কি রে! কই দেখি। ঠিক দেখেচিস্ তো?

আমি বল্লুম—ঠিক দেখেছি। শিশু গাছে গিয়ে বসেছে।

দোতলার বারান্দার পুব দিকে প্রকাণ্ড শিশু গাছ। তার মোটা গুঁড়ি দুভাগে ভাগ হয়ে দুই বাহুর মতো আকাশে উঠেছে। এই দুই বাহুর মাঝখানে একসময় ডালপালা ছিল। এক জাপানী উদ্যান-শিল্পী একদিন দোতলার লাইব্রেরী-ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে দাদামশাদের দেখাল যে ঐ ফালতু ডালগুলো কেটে বাদ দিলে শিশু গাছের দুই বাহুর ঠিক মাঝখান দিয়ে প্রভাতের সূর্যোদয় এবং সন্ধ্যার পূর্ণ চন্দ্রোদয় দুই-ই ছবির মতো দেখা

যাবে।। ডাল কেটে ফেলা হল। আমরা জন্মে অবধি শিশুগাছকে ঐ রূপেই দেখেছি। সোনার থালার মতো কত চন্দ্রোদয় দেখেছি তার মধ্যে দিয়ে তার ঠিক নেই।

শিশুগাছের চুড়োয় ঝুঁটি মাথায়, ঘাড় উঁচু করে দৃপ্ত ভঙ্গিতে রাজপুত্রের মতো সাদা বুলবুলি বসে আছে দেখা গেল।

দাদামশায় দেখে বললেন—সত্যিই তো! এ পার্শিয়ার বুলবুল—শা-বুলবুল!

ফোয়ারার ধারে নেমেছিল শুনে বল্লেন—আবার আসবে। তোরা গোল করিসনে। খাঁচা পাত। চল্ সামার হাউসে গিয়ে লুকোই সবাই।

দাদামশার ছবি আঁকা ঘুচে গেল। একটা বাঁশের খাঁচা যোগাড় হল। খানিকটা ছাতু আর কলা। দাদামশায় বল্লেন—খাঁচার মধ্যে খানিকটা লাল রং-এর ঘুড়ির কাগজ ঝুলিয়ে দে—রং দেখে আসবে। তা-ও হল। তারপর সবাই মিলে আমরা সামার হাউসে লুকিয়ে বসে রইলুম। বাড়িতে অনেক ছেলে-মেয়ে, অনেক লোক। সকলের কাছে খবর গেল বাগানে সাদা বুলবুল এসেছে, ধরার চেষ্টা হচ্ছে, কেউ যেন গোলযোগ করে তাড়িয়ে না দেয়।

মস্ত বাড়ি যখন চুপচাপ হয়ে গেল, সাদা বুলবুলি আবার এল ফোয়ারার ধারে, এবারে তার সঙ্গে এল এক কালো বুলবুলি।

দাদামশায় বল্লেন—দেখছিস্ কেমন সেথো যোগাড় করে এনেছে! খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর দুটো পাখিই উড়ে এসে খাঁচার উপর বসল।

দাদামশায় বল্লেন—খাঁচা চিনেছে। এ ধরা না পড়ে যায় না!

আমাদের তখন ভয়ানক উত্তেজনা। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সব পড়ে আছি, কিন্তু বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে।

কলা আর ছাতুর লোভে অবশেষে সাদা বুলবুলিটা খাঁচায় ঢুকল। কালোটা বাইরেই রইল।

এখন কি করা যায়? দাদামশায় আমাকে পাঠালেন—যা শিগগির গিয়ে দরজা বন্ধ করে দে।

আমি হামাগুড়ি দিয়ে দৌড়ে গেলুম। কিন্তু কাজটা কি অতই সহজ?

পার্শিয়ার শা-বুলবুল। আমি পৌঁছবার আগেই বুলবুলি খোলা দরজা গলে উড়ে পালাল।

—যাঃ পালাল! খাঁচার দরজায় সুতো বেঁধে রাখতে ভুলে গেচিস্ তোরা!—বলে দাদামশায় উঠলেন।

বুলবুলিটা কোথায় যে পালিয়ে গেল, সেদিনের মতো তাকে আর দেখতে পেলুম না।

পাখি ধরার আশা ত্যাগ করে আমরা ঘরে ফিরলুম। দাদামশার কিন্তু একটুও স্ফূর্তির অভাব নেই। বললেন—শহরের মাঝে কি-বাগান বানিয়েচি দেখছিস্—পার্শিয়া থেকে শা-বুলবুল উড়ে আসচে!

পরদিন সকাল বেলা দাদামশায় বারান্দায় বসে ছবি আঁকতে আঁকতে হঠাৎ লাফিয়ে উঠেছেন। কানে এসেছে তীক্ষ্ণ এক বুলবুলির ডাক—পীক্ পীক্রু! হাঁকাহাঁকি শুরু করেছেন—মোহনলাল, মোহনলাল! শিগগির আয়! এ শা-বুলবুলের ডাক না হয়ে যায় না! দেখ্ কোথায় বসলো!

আমি পড়ার বই ফেলে ছুটে বারান্দায় চলে এলুম। তারপর দুজনে মিলে এ-গাছ খুঁজি, ও-গাছ খুঁজি, শেষে চোখে পড়ল, দেবদারু গাছের পাতার ফাঁকে সাদা একটি ফোঁটা!

নিঃশব্দে আবার খাঁচা পাতা হল গোল-বাগানের ফোয়ারার ধারে। দাদামশায় নেমে এলেন সামার হাউসে। বল্লেন—ফোয়ারার ধারে ওকে আসতেই হবে জল খেতে, দেখ্ না। এবারে খাঁচার দরজায় সুতো বেঁধে আমরা তৈরি হয়ে রইলুম। ধৈর্য ধরে, অপেক্ষা করার পর সাদা-কালো দুটো বুলবুলিই এল আবার খাঁচার উপরে। তারপর খানিকক্ষণ নিঃশব্দে অপেক্ষা করার পর হল কি, সাদার বদলে কালোটা ঢুকল খাঁচার মধ্যে।

—দে সুতো টেনে।

সুতো টানতেই কালো বুলবুলি ধরা পড়ে গেল। দরজা পড়ার শব্দে শা-বুলবুলি পালাল উড়ে।

তখন দাদামশায় কালোটাকে আর-একটা বাঁশের খাঁচায় বন্দী করে অন্ত

খাঁচাটার দরজা খুলে রেখে দিলেন। বললেন—এইবার ওর সেথোর টানে সাদাটাকে আসতেই হবে।

কিন্তু সেই যে সে গেল, সাদা বুলবুলি আর ফিরল না। তারপর হঠাৎ আর একদিন এসে হাজির। সঙ্গে নতুন একটা কালো-বুলবুলি, নতুন সেথো।

আমাদের নাওয়া-খাওয়া ঘুচে গেল। সারাদিন কেবল সাদা-বুলবুলির পিছনে। অপেক্ষা করছি তো অপেক্ষাই করছি। কোথায় যে মাঝে মাঝে লুকিয়ে পড়ত বুলবুলিটা, তার কোনো চিহ্ন পাওয়া যেত না। তারপর হঠাৎ একটা তীক্ষ্ন ডাক শোনা যেত। ডাক শুনেই চেনা যেত শা-বুলবুলির ডাক। খাঁচার দরজা খুলে বসে থাকতুম আমরা। শীতকালের সারা দুপুরে সামার হাউসেই কেটে যেত। দাদামশায় আমাদের সঙ্গে। কিন্তু সাদা বুলবুলি ধরা দিত না।

বুলবুলিটা যেন সারা বাগানকে যাদু করে রেখেছিল। গাছে গাছে বুলবুলি ডাকত। তাদের ডাকে খাঁচায় ধরা বুলবুলি সাড়া দিয়ে উঠত। তার মাঝে হঠাৎ শোনা যেত শা-বুলবুলির উচ্চ তীক্ষ্ন ডাক—পীক্ পীক্ পীক্রু! সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার সাদা বুলবুলিটা যখন আসত একটা-না-একটা কালো বুলবুলিকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসত ফোয়ারার ধারে। নিজে কখনো কখনো খাঁচার উপরে এসে বসত। হয়তো খাঁচার বুলবুলিটার সঙ্গে কথা-ও কইত। কিন্তু ভিতরে ঢুকত না। ভিতরে ঐ একবারই ঢুকেছিল।

কালো বুলবুলিগুলো বোকার মত ভিতরে ঢুকে যেত আর ধরা পড়ত। একবার ধরা পড়ে গেলে শা-বুলবুলি তার সেথোর দিকে আর ফিরেও তাকাত না। উড়ে যেত নতুন সঙ্গীর খোঁজে।

সেবারে একটার পর একটা এমনি করে অনেকগুলি কালো বুলবুলি আমরা ধরেছিলুম। সাদা বুলবুলিকে পারিনি।

দাদামশায় বলতেন—এ বড় ভয়ানক পাখি! পাখি সেজে পার্শিয়া থেকে কে এল, কে জানে?

তারপর একদিন বসন্তকালের আরম্ভে শা-বুলবুলি কোথায় যে চলে গেল,

আর ফিরে এল না। জোড়াসাঁকোর বাগান ছেড়ে হয়তো পারস্যের কোন ঝরনা-ধোওয়া সবুজ বাগিচায়!

সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সামার হাউসে হাজিরা দেওয়ার পালা-ও আমাদের চুকল।

॥ ৬ ॥

লেখকদের সঙ্গে আর তাঁদের লেখার সঙ্গে পরিচয় আমাদের খুব ছেলেবেলা থেকেই। কত্তাবাবা, দাদামশায় বাবার কথা ছেড়েই দিলুম, এ ছাড়া লেখক-সমাগম জোড়াসাঁকো বাড়িতে বড় কম হত না। আমাদেরও তাই শখ যেত লেখার। খুব ছেলেবেলা থেকেই। কিন্তু পারব কোথেকে? একে ছেলেমানুষ, তার উপর বিদ্যা-বুদ্ধির একান্তই অভাব। দাদামশায়কে দুঃখের কথা জানালুম। গল্প লিখতে গেলে একটা প্লট দরকার। প্লট পাই কোথা থেকে?

দাদামশায় বললেন—এর জন্যে ভাবছিস? কেন, স্বপ্ন দেখিস্ না? স্বপ্নগুলো লিখে ফেল, দেখবি গল্প আপনি এসে যাবে।

এ এক নতুন কথা শোনালেন আমাদের দাদামশায়। আমরা ভাবলুম, সত্যিই তো, স্বপ্নগুলো অনেক সময় গল্পের মতোই আসে। গল্পের চেয়েও ভালো কোনো কোনো সময়। শুধু লিখে ফেললেই হল।

দাদামশায় বললেন—কাল সকালে যে যে স্বপ্ন দেখবে, চলে আসবে আমার বারান্দায়। স্বপ্ন লিখে তারপর শুরু করবে লেখাপড়া।

পরদিন সকালবেলা মাস্টারমশায় এসে দাদামশার ব্যবস্থা দেখে তো থ। দু-তক্তা শ্রীরামপুরী কাগজ লম্বা-লম্বি চার টুকরোয় কেটে গঁদের আঠা দিয়ে জুড়ে রাখা হয়েছে। এতেই স্বপ্নের পর স্বপ্ন লেখা হবে। আর যেমন যেমন লেখা হবে তেমনি কোষ্ঠীর মত গুটিয়ে রাখা হবে। জিনিসটার নাম দেওয়া হয়েছে 'স্বপ্নের মোড়ক'।

আমরা সেদিন যে যা স্বপ্ন দেখেছি কেউ ভুলিনি। ঘুম-চোখেই চলে এসেছি এবং প্রাণপণে মনে রাখবার চেষ্টা করছি। স্বপ্নের তো প্রধান দোষই যে, ঘুম ভাঙলেই স্বপ্নটা পালিয়ে যায় আর মন থেকেও যায় মুছে। লেখা-পড়ার আগেই স্বপ্ন লিখতে হবে দাদামশার হুকুম। লেখাপড়ার চেয়ে জিনিসটা অনেক ভালো, অনেক মজার। স্বপ্নের এখানটা ওখানটা ভুলে গেলে বানিয়ে দিলেও চলবে, কেউ ধরতে পারবে না।

মাস্টারমশায় বই গুটিয়ে বসে রইলেন। আমাদের একজনের পর একজনের স্বপ্ন লেখা চলতে লাগল। প্রথম উৎসাহে সকলেই কিছু বাড়িয়ে বাড়িয়ে লিখেছিলুম নিশ্চয়, কারণ, স্বপ্নের স্রোত সেদিন যেন আর শেষ হতে চায় না। অপটু লেখক সকলেই, বাংলা বানান-ই দুরস্ত হয়নি অনেকের। কাটাকুটি আর ঘন ঘন দোয়াতে কলম ডোবানো, পড়াশুনার বদলে এ-ই চলল সেদিন সকালে। শেষে দাদামশায় বললেন—মাস্টারমশায়কে দিয়ে একটা স্বপ্ন লিখিয়ে নে।

আমরা ছাড়লুম না। স্বপ্নের মোড়কের প্রথম তারিখে মাস্টারমশায়কে দিয়ে লিখিয়ে নিলুম। পড়ার ঘণ্টা শেষ হয়ে গেল। বই খোলা আর হল না। স্বপ্নে স্বপ্নে ভরে গেল আমাদের শ্রীরামপুরী কাগজ আর আমাদের দক্ষিণের বারান্দা আর আমাদের পড়ার ঘণ্টা। এইভাবে শুরু হয় আমাদের স্বপ্নের মোড়ক। অনেকদিন চলেছিল সেই মোড়ক। দাদামশায়ও লিখেছিলেন তাতে। বড়রা অনেকে লিখেছিলেন। মাঝে মাঝে মোড়ক খুলে পড়া হত স্বপ্ন। দাদামশার একটা স্বপ্ন ছিল ভারি সুন্দর। দাদামশায় কোথা থেকে যেন একটা নতুন রকমের বীণা পেয়েছেন। সেই বীণাটা নিয়ে ছাদের এক কোণে বসে বাজাবার চেষ্টা করছেন। আকাশে কালো মেঘ। এলোমেলো হাওয়া। নৌকোর পালের মতো ফুলে ফুলে উঠছে মেঘ আর মাঝে মাঝে যাচ্ছে ছিঁড়ে। সেই ছেঁড়া মেঘের মধ্যে দিয়ে সোনার সুতোর মতো থেকে থেকে রোদ এসে পড়ছে দাদামশার কোলে। আর ঠিক তখনই বীণা উঠছে বেজে। বীণার তার থেকে সুর উঠছে কি আলোর রশ্মি থেকে ঝঙ্কার উঠছে বোঝা যাচ্ছে না। দাদামশার কোলে বীণা। হাত উঠছে পড়ছে। কখনো

বেজে উঠছে বীণা, কখনো নীরব। মেঘে ঢাকা পড়ছে সূর্যের আলো। আবার বেরিয়ে পড়ছে ফুটো দিয়ে সোনার তন্ত্রীর মতো। এই স্বপ্ন! এ রকম স্বপ্ন আমরা কখনও দেখতুম না। এ যেন একেবারে কবিতা। আমরা অনেকবার চেষ্টা করেছি দাদামশার মত স্বপ্ন দেখবার। কিন্তু পারি নি। পারব কোত্থেকে? স্বপ্ন কি আর চেষ্টা করে দেখা যায়! দাদামশার স্বপ্নগুলো হত সুন্দর-সুললিত রচনার মত আর আমাদের গুলো একেবারে বোদা। এ দুঃখ আমাদের বরাবর।

দাদামশায় বলতেন—ওরে আমি কি তোদের মত শুধু চোখ বুজে স্বপ্ন দেখি? আমি যে জেগেও স্বপ্ন দেখি। তোরাও দেখবি একদিন।

স্বপ্নের মোড়ক কিছুদিন চলবার পর তাতে আপনিই ভাঁটা পড়ে এল। স্বপ্নলেখায় আমাদের হাত ততদিনে পেকে উঠেছে। আমরা তখন ঠিক করলুম আরও কিছু করবার। দাদামশায়কে বললুম—আমরা একটা হাতের লেখা পত্রিকা বার করতে চাই।

দাদামশায় বললেন—বেশ তো। নাম দে দেয়ালা। কচি ছেলেরা দ্যায়লা করে—তাই হোক তোদের কাগজের নাম।

সঙ্গে সঙ্গে নাম পেয়ে যাওয়ায় আমাদের উৎসাহ বেড়ে গেল। আমরা তোড়জোড় শুরু করে দিলুম। আমাকে করে দেওয়া হল সম্পাদক। কাজেই সমস্ত কাজের ভার আমার উপর এসে পড়ল। খাতা বাঁধালুম একটা। মলাট দিলুম তাতে। মলাটের উপর যত্ন করে বড় বড় করে লিখলুম—দেয়ালা। তারপর দাদামশার কাছ থেকে একটা লেখা আদায় করলুম। দেয়ালা নাম দিয়ে দাদামশায় ছোট্ট একটি গল্প লিখে দিলেন।

……গাছ ঘুমোয়, গাছের পাতা ঘুমোয়, মাঠ ঘাট ঘুমোয়, মেঝেয় পড়ে কুঁড়ের মানুষ ঘুমোয়—সবাই স্বপ্ন দেখে ছাওয়া তাদের বড় হয়েছে! সেই যে এতটুকুখানি ছাওয়া—যে মাঠের শেষ দেখতে চাইতো, পাখিদের সঙ্গে পাখি হয়ে উড়ে পালাতে চাইতো আকাশের শেষে—সে এখন সেই সব তেপান্তর মাঠের চেয়ে, সেই নীল আকাশের চেয়ে বড় হয়ে গেছে। ভয়ে গাছ-পালা মাঠ-ঘাটের গা ঝিমঝিম করতে থাকে আর এক একবার চমকে

উঠে তারা স্বপ্ন দেখে, দেয়ালা করে, হাসে, কাঁদে, চায় আর ঘুমোয়। অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে সাঁতরে চলে একটার পর একটা বাদুড় ছাওয়াকে খুঁজতে খুঁজতে দূর-দূর দেশে! সেই সময় চুপি-চুপি আলো আসে—একটু-খানি চাঁদের আলো—বাতাসের গায়ে আলো পড়ে। ঘুমের ঘোরে সবাই বলে—ছাওয়া? ঘুম ভাঙানো পাখি ডেকে বলে—ওই যে আলো, ওই যে ছাওয়া! চমকে উঠে গাছ দেখে ছাওয়া!

তারপর—

······ছোট গাছের ছাওয়া বলে গাছকে—আজ কি খবর?

গাছ বলে—আজ দেখছি কি জানিস্?

ছাওয়া বলে—কি?

গাছ বলে—সেই আমাদের পাতায় ঢাকা কুঁড়ি আজ ফুটেছে।

ছাওয়া বলে—তারপর?

গাছ বলে—প্রজাপতি তাকে দেখতে এল সোনার ডানা মেলে।

ছাওয়া বলে—তারপর?

গাছ বলে—রোদ পড়ল তার গায়ে, বাতাস তাকে দুলিয়ে গেল।

ছাওয়া বলে—ওকে আমায় দে।

গাছ বলে—এই নে দেখ্ কেমন সুন্দর ফুল।

ফুলকে বুকে নিয়ে ছাওয়া বলে—ফুল!

ফুল কথা কয় না।

ছাওয়া গাছকে বলে—ফুল কথা কয় না যে?

গাছ বলে—ঘুমিয়ে আছে, জাগাস নি!

ফুল ঘুমিয়ে থাকে ছাওয়ার বুকে। ছাওয়া নড়ে-চড়ে ফুলকে দেখে।

গাছ নড়ে-চড়ে শুধোয়—কি করছে?

ছাওয়া বলে—ঘুমোচ্ছে।

আর এক সময় বাতাস এসে ফুলকে ছুঁয়ে যায়, ছাওয়া বলে—দেয়ালা করছে আমাদের ফুল।

কুঁড়ের ঝাঁপ খুলে দেখে মানুষ—গাছের তলায় ঝরা ফুল, তার গায়ে

ছাওয়া হাত বোলাচ্ছে। কুঁড়ের মানুষের ছেলেটা বেরিয়ে আসে, ফুল তোলে বেড়ার গাছে গাছে।

গাছ বলে—কি করবি ফুল নিয়ে ?

ছেলে বলে—খেলা করব।

ফুল তুলে ছেলে চলে যায়। মেয়ে আসে। সে এতটুকু—গাছে হাত পায় না, ছাওয়ায় ছাওয়ায় ফুল কুড়িয়ে বেড়ায়।

ছাওয়া বলে—কি করবি ফুল নিয়ে ?

মেয়ে বলে—ওকে মালায় গেঁথে ধরে রাখব।

ছাওয়া বলে—তারপর, খেলা হলে ফিরিয়ে দিবি তো ?

মেয়ে—দোব না—বলে ফুল আঁচলে তুলে নেয়।

ছায়া তার পা জড়িয়ে বলে—নিয়ে যেও না।

গাছ বলে—যাক্ না নিয়ে, কাল সকালে দেখবি তোর ফুল পালিয়ে এসেছে তোর বুকে।

দিন কাটে, রাত কাটে, ফুলের স্বপন দেখে গাছ আর গাছের ছাওয়া দু-জনে মিলে। সকালের কুঁড়ি ফোটে গাছে, ফুল ফেরে ছাওয়ার কোলে।

এই হল দেয়ালার প্রথম গল্প। নকল করে ফেললুম তখনই।

দাদামশায় বললেন—তোরাও লেখ।

লেগে গেলুম আমরা সকলে কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে। লেখা যোগাড়ের কোনো চিন্তাই রইল না সম্পাদকের। কাউকে তাগিদ দিতে হল না। সবাই হঠাৎ লিখিয়ে হয়ে পড়ল। বাবার কাছ থেকে লেখা আদায় করলুম। মাস্টারমশায় কাছ থেকে লেখা আদায় করলুম। এমনি করে প্রায় দু-মাসের মতো রসদ জমে উঠল আমাদের।

লেখাগুলো নকল করছি। বৈশাখ মাসের দু-তিন তারিখ হয়ে গেছে। পাঠক-পাঠিকারা সব অধৈর্য। সবাই একবার করে উঁকি মেরে যাচ্ছে আমার কাঁধের উপর দিয়ে আর জিজ্ঞেস করছে—কবে বেরবে দেয়ালার প্রথম সংখ্যা ? প্রথম সংখ্যা ভালো করে বার করা দরকার, তাই সবকিছু যত্ন করে করতে

হচ্ছে। কিছু কিছু ছবি এঁকে দিতে হচ্ছে এখানে ওখানে। এতেই দেরি হচ্ছে আরো। একদিন সারা দুপুর নকল করে বৈশাখ সংখ্যাটা প্রায় শেষ করে এনেছি, সেই সময় দাদামশায় হঠাৎ এসে বললেন—ওরে তোদের পত্রিকা ভরে গেল নাকি? একটা ধাঁধার জন্যে জায়গা রাখিস। পত্রিকা করচিস্, ধাঁধা দিবিনে? নিয়ে যা একটা ধাঁধা। লিখে দিচ্ছি। এই বলে এইটে লিখে দিলেন:

ধাঁধা

হবুচন্দ্র ঘুম ভেঙে গবুচন্দ্রকে হাঁক দিলেন—মন্ত্রী, ও মন্ত্রী! দেখ-সে পশ্চিমে সূর্যোদয় হচ্চে। মন্ত্রী ভাবলেন, রাজা দেয়ালা করছেন, তাই পাশ ফিরে নাক ডাকিয়ে চললেন। রাজা আবার ডাকলেন—মন্ত্রী, দেখ-সে আশ্চর্য ব্যাপার, পশ্চিমে সূর্য উঠছে। এমনি বার বার তিনবারের পর মন্ত্রী এসে বললেন—মহারাজ এ কি প্রলাপ বকছেন? রাজা বললেন—বিশ্বাস হল না? এই দেখ। এদিকে ঘড়িতেও ঠিক সকাল ছ-টা বাজল। গবুচন্দ্র ভাবতে ভাবতে চললেন—এ আশ্চর্য ঘটনা কেমন করে ঘটল?

ধাঁধাটা টুকে নিলুম। নিয়ে বললুম—উত্তর?

দাদামশায় বললেন—উত্তর এখন জানাবো না। ভাবুক সকলে। তারপর বললেন—আচ্ছা দে একখানা খাম। বলে এক টুকরো কাগজে উত্তরটা লিখে খামে মুড়ে আঠা নিয়ে সেঁটে দিলেন। বললেন—মাসের শেষে তবে খুলবি। এখন রেখে দে তোর ডেস্কে।

ধাঁধার সদুত্তর কেউ-ই দিতে পারল না। শেষে আমরা খাম ছিঁড়ে খুলে ফেললুম। খুলে দেখলুম উত্তরটা এইরকম—

হবুচন্দ্র রাজার ঘরে পশ্চিম দিকের দেয়ালে তার ঠাকুরদার আমলের একখানা মস্ত আয়না টাঙানো ছিল।

এই উত্তরে অনেকে আপত্তি করেছিল। তারা বলেছিল ঠাকুরদার আমলের আয়না টাঙানো থাকলে রোজই তো পশ্চিমদিকে সূর্যোদয়ের ছবি দেখা যাবে। তবে হবুচন্দ্র হঠাৎ সেইদিনই একথা বললেন কেন?

তার উত্তরে দাদামশায় বলেছিলেন—হবুচন্দ্র বলেই তো? নইলে আর হবে কেন?

দেয়ালা আমাদের বেশ রীতিমত জমে উঠল। দাদামশার আর বাবার কাছ থেকে ভালো ভালো গল্প ও কবিতা আমরা পেতে থাকলুম। এইসব লেখা পরে মৌচাকে ছাপা হয়েছিল। বাবার লেখা 'পারম্পর্য' দেয়ালাতেই প্রথম বেরয়। দাদামশার লেখা 'সহজ চিত্রশিক্ষা' প্রতি দফায় দফায় দেয়ালায় বার হত দাদামশার আঁকা স্কেচ সহ। আমাদের লেখা দাদামশায় একটু আধটু কাটাকুটি করতেন কিন্তু কখনও শোধরাতেন না। বলতেন, নির্ভয়ে লিখে যা।

এত নির্ভয় দিতেন যে, আমরা বেপরোয়া কলম চালিয়ে যেতুম। সাপ ব্যাং কি বেরচ্ছে সেদিকে লক্ষ্যই করতুম না। একবার শুধু গবামামার একটি কবিতা সম্পূর্ণ কেটে নিজে লিখে দিয়েছিলেন। সেটি কোথাও ছাপা হয়নি।

সেই যেখানে শীতের বাতাস বইছে খরতর
বৃদ্ধ তমাল শাখা তাহার কাঁপায় থরথর।
সেইখানেতে বনের তলায় সন্ধ্যা আসে নামি
ফুরায় বেলা, সূর্য ডোবে, স্বপন দেখি আমি।
নীল আকাশের সেই ওপারে আলোক সাগর দোলে
সোনার গড়া মায়াপুরীর উপবনের কোলে।
মনে করি ভাসিয়ে তরী খুঁজতে চলে যাই
কার খোঁজে যে যেতে হবে মনে কিছুই নাই
হারিয়ে যাওয়া তারে খুঁজে চলে আমার হিয়া
রঙিন সাঁঝে রঙে রাঙা আলোয় সাঁতার দিয়া।

কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ধাঁধা সব কিছুই আমাদের কলম দিয়ে বেরিয়ে চলল হু হু করে। এ সবের পিছনে ছিল দাদামশার আশ্বাস—নির্ভয়ে লিখে যা।

অরুদা এসে সেই সময় রোজই বসতেন দক্ষিণের বারান্দায়। দাদামশায় বললেন—অরুদার কাছ থেকে তোদের ম্যাগাজিনের জন্য লেখা আদায় কর। অরুদার অনেক ভালো ভালো গল্প জানা আছে।

অরুদাকে ছেঁকে ধরলুম আমরা। কিন্তু অরুদা চুপচাপ বসেই থাকতেন। তাঁকে দিয়ে কলম ধরানো যেত না। আমরাও ছাড়বার পত্র নই। রোজই বলি অরুদা আজ হল না, কাল কিন্তু চাই-ই চাই আমাদের লেখা।

একদিন সকালবেলা অরুদা এসে হঠাৎ বললেন—ওরে, লিখে নে, একটা ভালো ছড়া মনে পড়ে গেছে। তোদের ম্যাগাজিনের জন্যে বেশ হবে। দাড়ির গান।

আমি লিখে ফেললুম—

আব্ দাড়ি চাপ দাড়ি
বুলবুল চস্‌মেদার দাড়ি—
কুল পাকা এক কাচ্চা
সব্‌সে দাড়ি ওহি আচ্ছা
এক দাড়ি মান মনোহর
এক দাড়ি ভব্বো
এক দাড়ি খালিফ ফজিহৎ
এক দাড়ি ঠচ্‌ঢো।
ইত্যাদি ইত্যাদি

দাদামশায় কাছেই বসেছিলেন। বললেন—দেখি দেখি নিয়ে আয় তো। অ্যাদ্দিনে অরুদার স্টক্ থেকে বেরল কিছু।

এই বলে অরুদার সেই দাড়ির গানকে অবলম্বন করে এক সুরসাল গল্প লিখে ফেললেন। দেয়ালার আমাদের রসদ হল। 'কাঁচায় পাকায়' নামে দাদামশার এই বিখ্যাত গল্প পরে 'মৌচাক'-এ এবং 'একে তিন তিনে এক' গ্রন্থে ছাপা হয়েছিল।

এর পর অরুদাকে দিয়ে পুরো একটা গল্প দেয়ালার জন্যে লেখাতে

পেরেছিলুম। 'ফির্নি খাওয়ার গল্প' নামে তা পরে রংমশালে ছাপা হয়েছিল। অরুণেন্দ্রনাথের এ ছাড়া আর কোনো ছোট গল্প নেই।

বড়দাদামশায়কে ধরেছিলুম দেয়ালার ছবি দেবার জন্যে। ফস্ ফস্ করে চীনা কালিতে ছবি এঁকে বড়দাদা আমাকে দিতেন। সে ছবিগুলি এত চমৎকার হত যে, আমাদের দীন পত্রে সেগুলিকে আঠা দিয়ে জুড়ে নষ্ট করতে মন সরত না। ছবিগুলি জমিয়ে একপাশে রেখে দিতুম আর ভাবতুম কি করে দেয়ালার পাতে এগুলিকে দেওয়া যায়। শেষে আমরা ঠিক করলুম, কোনোদিন যদি দেয়ালাকে ছাপিয়ে বার করতে পারা যায়, সেদিনই এই ছবিগুলি ব্যবহার করা হবে। এখন জমানো থাক।

বড়দাদামশায়কে বললুম—বড়দা, তুমি বরং একটা গল্প লিখে দাও—হাতের লেখা দেয়ালায় অন্তত সেটা যাবে।

বড়দাদা বললেন—আমি কি আর গপ্প লিখতে পারি রে? ও সব অবনের কাজ।

আমরা বললুম—তা হবে না। অরুদা লিখেছেন, তোমাকেও লিখতে হবে।

দারুণ উৎসাহ তখন আমাদের। সবাইকে দিয়ে লেখাবো, এই আমাদের পণ।

শেষে হল কি, আরম্ভের দিকে অত উৎসাহ সত্ত্বেও এক বছরের কাছাকাছি এসে আমাদের হাতের লেখা পত্রিকা বার করার উদ্যম ফুরিয়ে গেল। এবং শেষ সংখ্যা যখন আধখানা নকল হয়ে পড়ে আছে, আর এগোচ্ছে না, সেই সময় বড়দাদামশার কাছ থেকে পেলুম এক অপূর্ব রচনা—'দাদাভায়ের দেয়ালা'!

এ লেখা দেয়ালায় আর দেওয়া গেল না। এটা ছাপা হল শেষে শারদীয়া বসুমতীতে এবং পরে ভোঁদড় বাহাদুর নামে সিগনেট প্রেস থেকে বই আকারে এটাই ছাপা হয়।

অরুদার মতো বড়দারও এটাই একমাত্র গল্প। দু-এরই জন্ম হয়েছিল আমাদের মতো ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেয়ালা করতে গিয়ে।

॥ ৭ ॥

—ওরে টেলিস্‌কোপটা নিয়ে যেতে ভুলিসনে। সেটা কোথায় গেল দেখ তো!

পুরোনো বই-এর আলমারিতে সারি দেওয়া বই-এর পিছনে ধুলোর মধ্যে পড়ে ছিল চামড়ার খাপে মোড়া বহুদিনের দূরবীনটা। দাদামশায় সেটাকে নিয়ে পরিষ্কার করতে বসলেন।

এটাকে নিয়ে যেতে হবে দার্জিলিং-এ। দার্জিলিং যাবার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। দাদামশায় এটা বাছছেন ওটা বাছছেন। রং তুলি কাগজ বোর্ড লাঠি আর ঐ টেলিস্‌কোপ।

—পাহাড়ে অনেক দূরে চোখ চলে। দূরবীন না হলে হয়?

রীতিমত লটবহর নিয়ে তবে দার্জিলিং যাওয়া। গোছগাছ করতে ক-দিন চলে গেল। নীল রং-এর ডোরা-কাটা বড় বড় শতরঞ্জি মুড়ে ঢাউস ঢাউস বিছানা বাঁধা হল। পেট-মোটা কাঠের সিন্দুকে বাসন-কোসন। টিনের আর চামড়ার ট্রাঙ্ক-এ গরম কাপড় জুতো মোজা গেঞ্জি। আর ঝুড়ি ভরা ভরা খাবার রাস্তায় খাবার জন্যে।

যাবার দিন দাদামশায় সকলের আগে তৈরি। প্রায় ঘণ্টা তিনেক আগে কাপড় ছেড়ে, হাতে লাঠি, মুখে চুরুট নিয়ে বসে আর সবাইকে তাড়া দিচ্ছেন।

দিদিমা বলছেন—তোমার যেমন! এত তাড়াতাড়ি গিয়ে কি হবে?

দাদামশায় বোঝাচ্ছেন—এখানে বসে থেকেই বা হবে কি? তার চেয়ে স্টেশনে গিয়ে বসে থাকা যাক।

একবার বেরিয়ে পড়তে পারলে তবে নিশ্চিন্ত। এরকম প্রায়ই দেখেছি। একবার ইণ্ডিয়ান সোসাইটির মিটিং-এ যাবেন, মিটিং সাড়ে ছটায়, দাদামশায় তিনটের সময় তৈরি হয়ে মিশির ড্রাইভারকে গাড়ি আনতে হুকুম দিচ্ছেন।

—শরীরটা এই সময় ভালো আছে, এই বেলা বেরিয়ে পড়ি। পরে আবার শরীরটা কেমন হয় কে জানে?

ট্রেনে ভোরবেলা ঠেলে তুলেছেন আমাদের। সোজা উত্তরমুখো চলেছে ট্রেন, তখনও শিলিগুড়ি পৌঁছতে কিছু দেরি। নীল আকাশের বুকে হিমালয়ের বরফ-চুড়ো পুব থেকে পশ্চিম অবধি টানা। দাদামশাই বলছেন—দেখে নে, দেখে নে। ঐ দেখ মহাদেব শুয়ে আছেন নাক উঁচু করে।

ভোরের আকাশের পটে হালকা সাদায় আঁকা অমন ছবি আমরা কি আর দেখেছি কখনও? আমরা তো হাঁ হয়ে গেছি। দাদামশায় এদিকে ট্রেনের মধ্যে মহা হই চই লাগিয়ে দিয়েছেন।—টেলিস্কোপটা গেল কোথায়? কোন্ বাক্সে রাখা হয়েছে? কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। গেল নাকি হারিয়ে? ফেলেই আসা হল নাকি বাড়িতে?

দাদামশায় হতাশ হয়ে বললেন—গেল এতদিনের দূরবীনটা। দার্জিলিং যাওটাই দেখছি এবারে মাটি।

শুনে দিদিমা বললেন—যাবে কেন? তোমার দূরবীন তো বড়-বিছানার মধ্যে প্যাক করা হয়েছে।

বড-বিছানা মানে সে এক বিরাট ব্যাপার! গদি, তোশক, বালিশ, লেপ, কম্বল থেকে আরম্ভ করে জুতো, লাঠি, আমাদের খেলনাপত্র বই সব কিছু তার মধ্যে। চারিদিক তার আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে এমন করে বাঁধা যে ট্রেনের কামরায় তাকে খোলা অসম্ভব।

দাদামশায় শুনে বললেন—ওঃ তাই বল। যা ভাবনা হয়েছিল। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন—কাঞ্চনজঙ্ঘাকে চট্ করে তোদের হাতের কাছে এনে দেব ভেবেছিলুম। তা দেখছি তোদের কপালে নেই।

আমরা তখনও মুগ্ধ হয়ে দূর কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য দেখছি।

পাহাড়ে উঠে দার্জিলিং-এর হাড়-কাঁপানো শীতে আমরা জবুথবু হয়ে গেলুম। দিনের বেলা রোদে গিয়ে বসতুম আর রাত্রে কাঠের আগুন জেলে সকলে মিলে গোল হয়ে বসে গল্প করতুম। আর একবার লেপের মধ্যে ঢুকে পড়লে সহজে বেরতে চাইতুম না। হরিদাসী পাশের ঘরে বসে আগুন পোয়াত, হী হী করে কাঁপত আর একঘেয়ে সুরে বলে যেত—এ কোন্ দেশে আনলে গো? এ দেশ যে এদের বড্ডো ভালো লেগেছে গো! এরা যে

যাবার নামটি করে না গো! এরা কবে যাবে গো! আমরা শুনতুম আর খুব হাসতুম।

সকলের মত আমিও বেশ বেলা করে উঠতুম। রোদ না উঠলে বিছানা ছাড়তে চাইতুম না। কিন্তু একদিন কি খেয়াল হল, উঠে পড়লুম ভোরে। তখনও আধা অন্ধকার। বাড়ির মধ্যে ঘুম থেকে কেউ ওঠে নি। বাইরে কুয়াশার পর্দা। উঠে মুখ ধুয়ে গরম কাপড় পরে কাঁচের জানলা ঘেরা কাঠের বারান্দায় এসেছি, শুনি ভারি পায়ের মশমশ শব্দ। দেখি অন্য দিক দিয়ে দাদামশায় বারান্দায় ঢুকছেন।

আমায় দেখতে পেয়ে খুশী। বললেন—কি রে? উঠে পড়েছিস? এখানে ভোরেই মজা। চল্ তোকে দেখাই। তার আগে খেয়ে নে কিছু।

বুঝলুম দাদামশার রোজই ভোরে ওঠা অভ্যেস। আমি বললুম—খাবো কি? এই সকালে কে খাবার দেবে আমায়?

দাদামশায় বললেন—আয় না। বলে আমায় নিয়ে ঢুকলেন খাবার ঘরে। সেখানে জাল দেওয়া আলমারিতে খাবার থাকে জানতুম, কিন্তু সে-সব আলমারিতে হাত দেওয়া আমাদেয় বারণ। দাদামশায় নিজেই টেনে খুললেন জাল-দেওয়া পাল্লাটা। তার ভিতর থেকে বার করলেন মস্ত একটা কেক!

সেই কেক থেকে এই এতটুকু করে আমাদের প্রত্যেকের সাড়ে আটটার সময় বরাদ্দ এই আমি জানতুম। দাদামশায় ছুরি দেখিয়ে বললেন—কাট বড় দেখে দুটো টুকরো। আমি ইতস্তত করছি দেখে বললেন—কাট না ভয় কি? ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ। কেক দুটো গালে ফেলে চল বেরিয়ে পড়ি।

তখন আর আমায় পায় কে? পুরুষ্টু গোছের দু-টুকরো কেক হাতে নিয়ে দাদামশায় আর নাতি বেরিয়ে পড়লুম। আঃ, সেদিন কেক খেতে যা ভালো লেগেছিল। অমন কেক সারা জীবনে খাইনি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে চললুম দু-জনে গাছপালার আড়ালে আড়ালে। বেশ শীত। দাদামশার গায়ে পা পর্যন্ত ঢাকা লম্বা তিব্বতী বকু, মাথায় মখমলের টুপি। আমার গায়ে বেখাপ্পা ওভারকোট, তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে শীতে কুঁকড়ে চলেছি। মুখের উপর ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া কিন্তু ভারি

চমৎকার লাগছে। পাকদণ্ডি দিয়ে খানিকটা উঠেই দাদামশায় থামলেন। ঘন গাছের আড়ালে খানিকটা ফাঁক। তারই মধ্যে দিয়ে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়ো। ঠিক যেন ফ্রেমে আঁটা একখানি ছবি। বরফের রং তখনও পাংশাশ, যেন মৃতের মতো।

দাদামশায় বললেন—এক্ষুনি জেগে উঠবে। দেখ্ না কি কাণ্ড হয়। তুই দাঁড়া ঐখানটায়। আমি একটু বসি। বলে একটা ওপড়ানো পাইন গাছের উপর বসে বকুর পকেট থেকে একটা বর্মা চুরুট বার করে ধরালেন।

আমাদের চোখের সামনে কুয়াশা আস্তে আস্তে ভোরের হাওয়ায় সরে যাচ্ছে। খানিক পরেই হঠাৎ কোথা থেকে আলো এসে পড়ল বরফের চুড়োয়। তারপর মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যেতে থাকল বরফের চেহারা, আকাশের চেহারা! জেগে উঠতে থাকলো পৃথিবী। রং-এর আর আলোর ঢেউ বয়ে গেল চারদিকে। আর সেই গাছপালার ফ্রেমে আঁটা কাঞ্চনজঙ্ঘার স্থির চিত্র যেন কথা কয়ে উঠল কল্‌কল্ করে। দু-জনে চুপটি করে অনেকক্ষণ ধরে দেখলুম, যতক্ষণ না সূর্য বেশ খানিকটা উঠে পড়লেন আকাশে।

দাদামশায় বললেন—রোজ এমনটি হয় না। কুয়াশা থাকলেই মুশকিল।

আমরা মনের খুশিতে আরো খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরে বাড়ি ফিরে এলুম। ততক্ষণে সবাই একে একে উঠতে আরম্ভ করেছেন। আর রান্না-ঘরের দিক থেকে ডিম ভাজার গন্ধ আসছে। দাদামশায় আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে বললেন—আর একবার হবে! বুঝলুম কেক-এর কথা বলছেন।

এর পর থেকে প্রায় রোজই ভোরে উঠে দাদামশার প্রথম একচোট হাঁটার সঙ্গী হতুম আমি।

দ্বিতীয় চোট হাঁটতে বেরতেন দাদামশায় সকালের খাওয়ার পরেই। অত বড় শিল্পী দার্জিলিং-এ এসেছেন, বনের শোভা, পাহাড়ের শোভা, মেঘের দৃশ্য দেখে বেড়াবেন, পাখির গান শুনবেন, এই বোধ হয় হওয়া উচিত, কিন্তু দাদামশায় ঘুরতেন বাজারে আর গলিতে। দোকান দেখতেন, পাহাড়ীদের ঘর দেখতেন, তাদের সঙ্গে কথা কইতেন মাঝে মাঝে। মানুষের বসতি

যেখানে, সেইখানেই ঘোরাফেরা করতেন বেশী। একদিন এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে বাজার থেকে উঠে আসছেন মল্-এর কাছে এমন সময় চোখে পড়ল সামনেই একটা ঝুটোপুটি হচ্ছে। দেখেন, একটি ভুটিয়া মেয়ে রাস্তার ধারে চীনে-বাদাম সাজিয়ে বসেছিল, দু-তিনটে সায়েবদের ছেলে তাই উল্‌টিয়ে ফেলে ছড়িয়ে দিচ্ছে, ভুটিয়া মেয়েটি সামলাতে পারছে না।

এই আর দাদামশায়কে পায় কে? লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে গেলেন। ছেলেগুলোও তেমনি ব্যাদরা—তাড়া খেয়ে পালিয়ে গিয়ে আবার রুখে আসে। কে জানে, হয়তো কোনো লাট-বেলাট-এর ছেলে, তখন তো সায়েবদের রাজত্ব। ছেলেগুলোর সঙ্গে এক চাপরাসী—সে রুখে আসে আরো বেশী। যাই হোক, দাদামশার উঁচানো লাঠি দেখে লাট-পুত্রই হোক আর উজির-পুত্রই হোক তারা তো পালালো। ভুটিয়া মেয়েটিও তার ছড়ানো চীনে বাদাম গুছিয়ে নিলে।

দাদামশায় তার পরদিন যখন মল্-এ এসেছেন, দেখেন সেই ছোট্ট চীনে বাদাম-ওয়ালী হাতে একটি ছোট্ট বাদামের ঠোঙা নিয়ে উঠে এসে দিতে চাইছে। দাদামশায় বলেন—চীনে বাদাম নিয়ে আমি কি করব? সে তবু বলে—নাও। দাদামশায় বললেন—চীনে বাদাম আমার হজম হবে না রে! রেখে দে তুই। এই বলে পাশ কাটালেন। তারপর থেকে যখনই দাদামশায় মল্-এ যেতেন, সেই ভুটিয়া মেয়েটি দেখতে পেলেই দাদামশায়কে এক ঠোঙা চীনে-বাদাম দেবার চেষ্টা করত।

এর পরের ঘটনা আমরা দাদামশার মুখে অনেক বছর পরে শুনেছিলুম, দাদামশায় যেবার কার্শিয়ং পাহাড়ে গিয়েছিলেন সেইবার। কার্শিয়ং থেকে একদিন দার্জিলিং-এ বেড়াতে গেছেন। মল্-এ এসেছেন। হঠাৎ কোথা থেকে সেই ভুটিয়া মেয়ে হাতে এক ঠোঙা চীনে বাদাম নিয়ে ছুটে এসেছে। তখন সে আর ছোট্টটি নেই, বড় হয়ে গেছে। তার বাপকে সুদ্ধু ধরে নিয়ে এসেছে দেখাবার জন্যে। এতদিন পরে তার সেই পুরোনো উপকারী বন্ধুকে দেখে কত খুশী! দাদামশায় এত বার তার দেওয়া চীনে বাদাম ফিরিয়ে দিয়ে এসেছেন, এবারে কিন্তু আর পারলেন না। নিতে হল। কার্শিয়ং-এ

ফিরে এসে গল্পখানা আমাদের বলে বললেন—চীনে-বাদাম-ওয়ালী কি না তাই ঠিক চিনে ফেলেছে।

সকালের বেড়ানো থেকে ফিরে এসে দাদামশায় ছবি আঁকতে বসতেন অথবা টেলিস্কোপ নিয়ে দেখতেন। বাড়ির সামনের জমিতে বাঁশের খুঁটি পুঁতে টেলিস্কোপ বসিবার একটা স্ট্যাণ্ড তৈরি করা হয়েছিল। তাইতে দূরবীনটা বসিয়ে পাহাড়ের শ্রেণীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখা যেত। দুপুর বেলাও খাওয়া দাওয়ার পর ছবি আঁকা দূরবীন দেখা চলত। আমাদেরও দূরবীন দেখতে দিতেন। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন দাদামশায় এই দূরবীন নিয়ে। দূরের পাহাড়ে একটি ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম ছিল। সামান্য কয়েকটি ঘরের একটি ছোট্ট বস্তি। গ্রামের বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো ছাগল আর হাঁস চরাত। দুপুরবেলাকার নিঝুম গ্রাম। গাঁয়ের মরদরা কাজে বেরিয়ে গেছে। বাচ্চারা কে কোথায় লুকিয়েছে কোন চিহ্ন নেই। সব চুপচাপ। হঠাৎ এক কুটিরের দরজা খুলে গেল। দরজার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল এক পাহাড়ী মা। চেঁচিয়ে ডাকল যেন কাকে। দূরবীনের মধ্য দিয়ে শোনা গেল না বটে কিন্তু দেখা গেল লাফাতে লাফাতে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে একপাল হাঁস খেদিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছে। পাহাড়ী মায়ের হাতে একটা টুকরি। তার থেকে এক খাবলা কি বার করে ছেলেটার আর মেয়েটার হাতে দিল। তারা বসে গেল দরজার চৌকাঠে খেতে। হাঁসগুলো কিল্‌বিল্‌ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল কুটিরের আশেপাশে। শুধু-চোখে এ-সব কিছুই দেখা যেত না। দাদামশায় দূরবীন দিয়ে বায়োস্কোপের মতো দেখতেন।

একদিন দুপুর বেলা হঠাৎ দাদামশার গলা শোনা গেল—দেখে যা দেখে যা! ওরে মোহনলাল কোথায় গেল, ডাক ডাক!

আমরা সবাই কাঁচের ঘরে বসেছিলুম, কেউ বই নিয়ে, কেউ অর্ধনিদ্রার কোলে। তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে এলুম।

দাদামশায় বললেন—চোখ লাগিয়ে দেখ। একেবারে রবি-কার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

দূরবীনে চোখ দিয়ে দেখি বরফ আর বরফ।

দাদামশায় বললেন—দেখতে পাচ্ছিস না ?

—শুধু তো বরফ দেখছি।

—দেখি। আবার নড়াস্‌নি টেলিস্কোপটাকে। বলে নিজে চোখ দিলেন।

—ঐ তো ছোট্ট একটি ঝরনা। দেখ ভালো করে। ঝুর-ঝুর করে জল পড়ছে।

তখন ভালো করে সবাই আমরা একে একে দেখলুম। বেশ স্পষ্ট একটা ঝরনা দেখা গেল বহুদূরে হিমালয়ের কোলে।

দাদামশায় বললেন—দেখছিলুম বসে বসে পাহাড়ের দৃশ্য। বরফের দিকে টেলিস্কোপটাকে ঘুরিয়ে দেখছি, হঠাৎ মনে হল কি একটা নড়ছে। বরফের উপর কোন প্রকাণ্ড জন্তু না কি—তাই মনে হল। তারপর দেখলুম একটা মস্ত বরফের ধস্—হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। তার সঙ্গে তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল ঐ নদীটা। এতদূর থেকে দেখছি—নিশ্চয় প্রকাণ্ড একটা ব্যাপার—কি হচ্ছে ওখানে এখন কে জানে !

সত্যিই কত্তাবাবার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ !

দাদামশায় বললেন—ভাগ্যিস্ টেলিস্কোপটা এনেছিলুম।

আরে টেলিস্কোপ তো কত লোকেই আনে। তাই বলে হিমালয়ের প্রাচীর ফাটিয়ে স্রোতস্বিনী বেরিয়ে আসছে টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে এ দৃশ্য দেখবার ভাগ্য কার হয়।

এরপর থেকে যতদিন দার্জিলিং-এ ছিলেন, দাদামশায় টেলিস্কোপ ঘুরিয়ে সেই ঝরনাটা বার বার করে প্রায়ই দেখতেন।

দাদামশার মুখে প্রায়ই শুনতুম—গল্পের সেরা গল্প আরব্য উপন্যাসের গল্প। ওর মত গল্প হয় না। অমন গল্প কোনো সাহিত্যে কোনদিন লেখা হয় নি। প্রায়ই আরব্য উপন্যাস পড়তেন। ইংরিজিতে মোটা মোটা কয়েক খণ্ড বার্টন-এর সচিত্র 'অ্যারেবিয়ান নাইটস্'; রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের তিন খণ্ড আরব্য উপন্যাস; বটতলার একাধিক সহস্র রজনী; তাছাড়া উর্দু কিতাবের দোকান থেকে উর্দু ভাষায় আরব্য উপন্যাসের গল্প কিনে আনতেন।

সেই আরব্য উপন্যাসের আলিবাবার গল্প। দস্যুদের গুহায় ঢুকে 'চিচিং ফাঁক' মন্ত্র ভুলে গুহায় আটকা পড়ে কাসেম দস্যুদের হাতে ধরা পড়ে যায়। দস্যুরা তাকে চার টুকরো করে কেটে গুহার গায়ে লটকে দেয়। আলিবাবা সেই কাটা দেহ গাধার পিঠে চাপিয়ে বোগদাদে ফিরে এসে চুপি চুপি এক দর্জির বাড়ি গিয়ে দর্জিকে দিয়ে কাসেমের কাটা দেহ সেলাই করিয়ে নিয়ে যায়।

এই দর্জির ছবি দাদামশায় আঁকছেন। আরব্য উপন্যাসের ছবি তখন একটার পর একটা আঁকা চলেছে, এটা তারই একটা। আঁকছেন তো আঁকছেন, কিন্তু পছন্দ আর হচ্ছে না। মন খুঁতখুঁত করছে। তুলি তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন ছবিখানা—কি হয়েছে ধরতে পারছেন না। আমাদের দেখান মাঝে মাঝে—দেখ্ তো, কি দোষ হয়েছে ছবিটার? আমরা কি বলব? দিব্যি হচ্ছে, দোষ আবার কোথায়?

প্রশান্ত রায় সে সময় প্রায় রোজই দাদামশার টেবিলের পাশে বসে বসে ছবি আঁকা দেখতেন। প্রশান্তবাবু তখন আজকের দিনের মত এত বড় শিল্পী হননি। সবে তখন তাঁর শিক্ষানবিশী শুরু হয়েছে। শিক্ষানবিশী মানে, ঐ দাদামশার পাশে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছবি আঁকা দেখা। ঐ থেকে যা কিছু সংগ্রহ হয়। দাদামশার শেখাবার পদ্ধতিটাই ছিল ঐরকম। বলতেন ঘাড় ধরে কি আর কিছু শেখানো যায়? নিজে নিজেই শিখে নিতে হবে।

প্রশান্তবাবুকেও বলেন—দেখ তো. ছবির এইখানটায় কি যেন হয়েছে'

ছবির নীচে একটা জায়গা বার করে দেখান। উপরে খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় বুড়ো দর্জি সূক্ষ্ম ছুঁচের ফোঁড় দিয়ে সেলাই করে চলেছে। নীচে তিন দস্যু নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছে। তারা বোগদাদে এসেছে কাসেমের মৃতদেহ কে চুরি করে এনেছে—তাকে খুন করতে। প্রশান্তবাবু বলেন—কেন, ঠিকই তো আছে। আমি তো কিছু দেখছি না।

দাদামশার খুঁতখুঁতানি যায় না। ছবি এঁকে চলেছেন, মনে কিন্তু স্বস্তি নেই।

দুদিন গেল এইভাবে। রং-এর পর রং চড়তে লাগল ছবিতে। ছবি প্রায় শেষ হয়-হয়। সেদিন বিকেলে রাধু এসেছে দাদামশার শরবত নিয়ে। রাধু আসতে ছবিটা উল্‌টিয়ে রাধুর দিকে এগিয়ে বললেন—দেখ তো রাধু। ক'দিন ধরে আঁকচি ছবিটা, পছন্দ হচ্ছে না ঠিক। ছবির এইখানটা কি-একটা হয়েছে।

রাধু তো আর চিত্রকর হবার জন্যে ছবি আঁকার সাধনা বা শিক্ষানবিশী করছে না। তার কোনো ভয়-ডর নেই। সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না-করে বলে দিল—ঐ নীচের লোক তিনটে কি-রকম যেন!

দাদামশায় লাফিয়ে উঠে বললেন—ঠিক বলেছিস্! বলে পাথরের গেলাস ধরে চোঁ করে শরবতটা খেয়ে নিলেন।

—দেখলে প্রশান্ত! রাধুর চোখ আছে। ঐ লোক তিনটের জন্যেই যত কিছু গোল।

সমস্যা মিটে গেল।

প্রশান্তবাবু নির্বাক। নীচে গোটাতিনেক লোক দিব্যি আঁকা হয়ে গিয়েছিল—রং-টং দিয়ে একেবারে ফিনিশ—এখন কিনা বলেন, ঐ তিন-মূর্তিই যত দোষের মূল!

রাধু শরবত খাইয়ে চলে গেল। আলো কমে আসছিল বলে সেদিনকার মত ছবি আঁকাও বন্ধ হল।

তার পরদিন প্রশান্তবাবু এসে অন্যদিনের মত দাদামশার টেবিলের পাশে ছবি দেখতে বসেছেন। ছবি আর চিনতে পারেন না। সে লোক তিনটে বেমালুম অদৃশ্য হয়েছে। তাদের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। দাদামশায় খুব খুশী।

বললেন—দেখ এইবার। ছবির দোষ ক্ষয় করে দিলুম। রাধু ধরেছে ঠিক। ঐ লোক তিনটেই গোল করছিল। দিলুম উড়িয়ে।

আরব্য উপন্যাসের ছবি যখন তেজে আঁকা চলেছে, তখন এক-একটা ছবি আঁকতে দাদামশার পাঁচ-ছ'দিন লাগত। কিন্তু প্রথম ছবিটা—যেখানে উজির-কন্যা শাহ্‌জাদী বাদশাকে গল্প বলছেন, সেখানা একবার আঁকতে শুরু করে আর শেষ হতে চায় না। কুড়ি দিনের উপর লেগেছিল সেটাকে শেষ করতে। এমন ঘষা ঘষেছিলেন যে, ভিজলে ব্লটিং পেপারের মত দেখাত। ছবিটা একবার করে জলে ডুবত আর প্রশান্তবাবু দেখে ভয়ে কাঁপতেন—এই ছিঁড়ে যায় বুঝি! কিন্তু শুকোলেই আবার বেশ খড়খড়ে হয়ে উঠত।

এইভাবে আরব্য উপন্যাস সিরিজের ছবি আঁকা শুরু হয়। কয়েকটি ছবি হয়ে যাবার পর জসিমউদ্দীন একদিন এসে হাজির। দাদামশার হাতে তখন তুলি রং কাগজ। জসিমকে দেখে বললেন—দেখ হে জসিমউদ্দীন, তোমাদের আলিফ লায়লা-ওয়া-লায়লার ছবি আঁকচি।

জসিমউদ্দীন কিছুই বুঝতে পারলে না।

দাদামশায় বললেন—নাঃ, এ নামেই মুসলমান—উর্দুর কিছুই জানো না দেখচি। আরব্য উপন্যাস হে, আরব্য উপন্যাস। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের আরব্য উপন্যাসের নাম শুনেছ?

জসিমউদ্দীন ততক্ষণে যে-কটা ছবি আঁকা হয়েছে, উল্টেপাল্টে একমনে দেখতে শুরু করেছে। দেখছে আর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। আমাদের জিজ্ঞেস করছে—কবে আঁকা শুরু করলেন এসব?

জসিমউদ্দীন আমাদের বাড়িতে এসে অবধি দাদামশায়কে ছবি আঁকতে দেখেনি। সে যে সময় আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করেছে, সে সময়টায় কি-একটা হয়েছিল, দাদামশায় ছবি আঁকতেন না। লিখতেন, কিন্তু তুলি প্রায় ধরতেনই না। অনেক দিন এইভাবে ছবি আঁকা বন্ধ থাকার পর হঠাৎ আরম্ভ করেছিলেন আরব্য উপন্যাসের সিরিজ। আর আরম্ভ করেই এই অবারিত স্রোত! তাছাড়া এবারকার ছবিগুলি একেবারে নতুন ধরনের—এর আগে কখনও এই ধাঁচে ছবি আঁকেন নি।

জসিমদ্দীন বললে,—আর কতগুলো এইরকম ছবি আঁকবেন দাদামশায় ?

—সমস্ত এঁকে ফেলব। আরব্য উপন্যাসের কিছু বাদ রাখব ভাবচ নাকি ? একাধিক সহস্র রজনী যেমন গল্পে গল্পে ভরে দিয়েছিল, তেমনি আমি ছবিতে ছবিতে ছেয়ে দেব।

জসিমউদ্দীন বললে—অতগুলি ছবি আপনি আঁকতে পারবেন ?

—নিশ্চয় পারবো। ভাবছ কি তুমি ! দেখে নিও।

—আরো ছেলেবেলায় যদি আরম্ভ করতেন বুঝতুম। কত দিন লাগবে আপনার সব ছবি আঁকতে ভেবেছেন ? সমস্ত আরব্য উপন্যাস !

—যতদিনই লাগুক না, হয়েছে কি ? হাত ব্যথা হয়ে যাবে ভাবছ ? এই তো সবে শুরু। এখনও বাকী আলাদিন, আবুহোসেন, হারুন-অল-রশিদ। তারপর চার মাছের গল্প, উড়ন্ত কার্পেট, সিন্দবাদ নাবিক। তিন আপেলের একটা গল্প আছে। তিন বোনের একটা গল্প। চীন-রাজকন্যার গল্প পড়েছ ? ন-টা পুতুলের গল্প আছে—তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে নামই শোনোনি কোনোকালে।

জসিমউদ্দীন বললে—এক-একখানা ছবি আঁকতে আপনার কতদিন লাগছে বলুন তো ? এক হাজার ছবি আঁকতে আপনার কত বছর লাগবে তাহলে ? একটা জীবনে কুলোবে ?

দাদামশায় ছবি থেকে তুলি উঠিয়ে নিয়ে জসিমউদ্দীনের দিকে চেয়ে বললেন—জসিমউদ্দীন, তুমি এখনও দেখচি জানো না যে, আর্টিস্ট যখন ছবি আঁকতে বসে তখন সে সময়ের হিসেব করে না। রং হাতে নিয়ে সে দেখে তার সামনে পড়ে আছে অনন্ত সময়, অক্ষয় জীবন। কোনোদিন তা শেষ হবে না। এই তুলি আর ঐ রং এরও কোনো ক্ষয় নেই। কবিতা লিখচ। যাও এই সাধনা করগে এবার।

আরব্য উপন্যাসের ছবি দাদামশায় সবসুদ্ধ সাঁইত্রিশখানা এঁকেছিলেন। কিন্তু তা এক হাজার একখানা ছবিরই সামিল।

॥ ৯ ॥

দাদামশায় তাঁর রং-এর বাক্সকে বলতেন অক্ষয় তূণ। ছেলেবেলায় আমরা অবাক হয়ে দেখতুম, দাদামশায় কত ছবি আঁকেন, কিন্তু তাঁর রং ফুরোয় না! অথচ আমাদের জন্যে চাঁদনী থেকে রকম বে-রকমের কেক-সাজানো যে রং-এর বাক্স আসত, তা জলে গুলে আর তুলির খোঁচায় শেষ করে দিতে কতটুকুই-বা সময় লাগত আমাদের? দাদামশায় মাঝে মাঝে রং-ভরা বাক্স, চওড়া-মুখ কাঁচের শিশি-ভরা রং-এর কাস্কেট এর-ওর কাছ থেকে উপহার পেতেন। সে-সব তিনি যেমন-কে-তেমন তুলে রেখে দিতেন। কদাচিৎ হয়তো বার করে ব্যবহার করতেন এক-আধবার। ছবি আঁকতেন সব সময় সেই পুরোনো রং-এর বাক্স থেকে। ছেলেবেলায় আমরা সত্যিই বিশ্বাস করতুম। অক্ষয় তূণ। দাদামশার রং ক্ষইতো না।

একবার একটি ছেলে এসে উপস্থিত দাদামশার কাছে। একেবারে অচেনা। সটান হাজির দক্ষিণের বারান্দায়। বগলে একগাদা কাগজ, কাঁধে একটা ময়লা থলি। টিপ করে একটা প্রণাম করেই বলে—ছবি আঁকা শিখতে এলুম।

আমরা ছিলুম তখন সেখানে। দেখলুম দাদামশায় চটেছেন। ঐরকম হঠাৎ গায়ে পড়া বা নিজেকে-জাহির-করা লোক একেবারেই পছন্দ করতেন না।

পা গুটিয়ে নিয়ে চশমার মধ্যে দিয়ে একটু ট্যারচা চেয়ে বললেন—কে তুমি?

ছেলেটি দাদামশার গলার স্বরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললে—আজ্ঞে, আমার ছবি আঁকা শেখার খুব ইচ্ছে, তাই এসেছি। কিছু কিছু চর্চা করেছি নিজে থেকেই।

দাদামশায় বললেন—তা আর্ট স্কুলে গেলেই তো পারো, এখানে কেন?

ছেলেটি দেখলে তার আপ্যায়নটা যেমন হবে ভেবে এসেছিল, ঠিক তেমনধারা এগচ্ছে না। সে নরম হয়ে বললে—আমার ছবি যদি একটু দেখেন, তাহলে হয়তো···আপনার কাছেই এসেছি কিছু শিখতে।

চটে গেলেও ছবি দেখবার ঔৎসুক্য দাদামশার খুব—যেমনই ছবি হোক না।

বললেন—দেখি কি ছবি এনেছ, বার কর তোমার থলি থেকে।

ছেলেটি কিন্তু ছবি কিছুই আনেনি। থলির মধ্যে তার রং-তুলির সরঞ্জাম। এঁকে কিছু দেখাতে চায়। সঙ্গে কাগজও আছে। দেখুন নিজের চোখে শিল্পগুরু তার বাহাদুরী!

দাদামশায় বলেন—বুঝেছি! ওরে ঐদিকের ঐ চেয়ারখানা সরিয়ে দে তো। ছবি লেখো তুমি ঐখেনে বসে, আমি ততক্ষণ ঘুরে আসছি।

বারান্দার দক্ষিণে রেলিং-এর ধারে মেঝের উপর ছেলেটির বসবার জায়গা করে দেওয়া হল। এ গামলা জল দেওয়া হল তাকে। শানের উপর কাগজ বিছিয়ে ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা শুরু করে দিল।

দাদামশায় উঠে পডলেন। চললেন বাগানে। সঙ্গে নিয়ে চললেন আমাদের।

—চল্ তোরা। আঁকুক নিজের মনে বসে-বসে ছবি। গোল করিসনে।

নতুন শিষ্য কেমন, কেমন তার হাত, এসব দেখবার কোনরকম উৎসাহ প্রকাশ করলেন না। বাগানের বেঞ্চিতে বসে একটা বর্মা চুরুট বার করে ধরালেন। বসে বসে সমস্ত চুরুট শেষ করে তারপর উঠলেন। আমরাও পিছু নিলুম। বারান্দায় পৌঁছে দেখি ছবি তৈরী। ছেলেটি খুশি-খুশি মনে বসে। মেঝের উপর দুটো-তিনটে রং-এর প্যাকেট—তাদের গা দিয়ে রং-গোলা জল উপচে মেঝের উপর গড়াচ্ছে। রেলিং আর থামের গায়ে প্রচুর লাল আর সবুজ রং-এর ছিটে। ছেলেটির জামায় রং, হাতায় রং, আঙুলে রং। দাদামশার এক গামলা পরিষ্কার জল গাঢ় খয়রিটে-সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে। মহা-উৎসাহের চোটে আশপাশের যতকিছুর উপর তার রং-এর আর প্রাণের প্রাচুর্য ফেলে ছড়িয়ে তছনছ করে বসে আছে তরুণ

চিত্রকর, এটা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। ছবিটা হয়তো মন্দ হয়নি, কিন্তু দাদামশার মুখ দেখলুম থমথমে।

বললেন, বেশ নিষ্ঠুরভাবেই বললেন—খুব হয়েছে। আর ছবি আঁকতে হবে না। রং-এর দাম যে বোঝে না, তার হাতে তুলি মানায় না। এই নাও এই ন্যাকড়া দিয়ে আমার বারান্দাটা পরিষ্কার করে দিয়ে বাড়ি চলে যাও।

বলে তাঁর দেরাজ থেকে মাইক্রোসকোপ-এর কাঁচ-মোছা একটা কাপড় বার করে ফেলে দিলেন। ছবিটার দিকে একবার দেখলেনও না।

ছেলেটি মুখ চুন করে বারান্দা মুছে তার রং-এর প্রাচুর্য গুটিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

দাদামশায় বললেন—রং-এর দাম যেদিন বুঝবে, সেদিন আবার এসো।

ছেলেটি কিন্তু আর কোনোদিন আসেনি। আমি অন্তত দেখিনি। তার নাম-ও কারুর জানা নেই। ভবিষ্যৎ-জীবনে সে রং-এর মূল্য বুঝেছে কিনা, অথবা মূল্যের প্রতীক্ষা না-করেই বড় শিল্পী হয়ে গেছে কিনা, তারও খবর পাইনি।

অতি অল্প রং খরচ করে যে-সব অতি মূল্যবান ছবি দাদামশায় আঁকতেন সেগুলি খাঁটি ভারতীয়দের আঁকা খাঁটি ভারতীয় ছবি বলেই গণ্য হত। বিদেশী গুরুর কাছে বিলিতী স্টাইলে ছবি আঁকতে শিখেছিলেন প্রথম জীবনে, কিন্তু সেসব তো ত্যাগ করেছেন বহুদিন। এবারে যখন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের কথা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল, বিলিতী কাপড় বর্জন করে লোকে খদ্দর পরল, সিগারেট ছেড়ে দিয়ে ধরল বিড়ি, সেই সময় দাদামশায় বললেন—সিগারেট তো আমি খাই না, বর্মা চুরুট খাই, অম্বুরী তামাক খাই, দুটোই খাঁটি স্বদেশী। তবে বিলিতী মর্কিনের ইজের কামিজ ছেড়ে দিয়ে খদ্দর পরতে বলো, পারবো না, গায়ে ফুটবে। তার চেয়ে আমার বিলিতী রং-এর বাক্স আমি ত্যাগ করছি—দিশী রং-এ আঁকব।

এই বলে ক্ষিতীশকে হুকুম দিলেন—যাও, বড় রাস্তার মোড় থেকে গুঁড়ো

রং কিনে নিয়ে এস যত রকম পাওয়া যায়। আমাদের বললেন—আয় তোদের শিখিয়ে দিই, দিশী রং কি করে তৈরি করতে হয়।

ক্ষিতীশ এলা মাটি আনল, গেরী মাটি আনল, ভূষো কালি আনল, খয়ের আনল, এগুলো ধরা যাক খাঁটি স্বদেশী, কিন্তু আরো যা সব গুঁড়ো এল রং-এর দোকান থেকে—কমলা, লাল, নীল, সবুজ, হলদে সেগুলো বোধ করি জার্মান বা বিলিতী মোড়ক থেকে বার করা। কিন্তু দেশী রং করার উৎসাহে তখন ও-সব ছোটাখাট বিষয় নিয়ে আমরা কেউ মাথা ঘামালুম না। পাড়ার বাঙালী রং-এর দোকান থেকে এসেছে—স্বদেশী হবার পক্ষে এই যথেষ্ট।

রং তৈরি শুরু হল। ছোটদের দল সবাই লেগে গেলুম আমরা এই স্বদেশী কারখানায়। গুঁড়ো রং বেঁটে গঁদ আর গ্লিসারিন মিশিয়ে কেমন করে রং-এর কেক তৈরি করতে হয় দাদামশায় জানতেন। আরো কি-সব মেশাতে লাগলেন নিজের মাথা থেকে বার করে। উৎসাহের চোটে গঙ্গামাটি দিয়ে একটা রং তৈরি করলেন। বললেন—বাস্ আর রং মিশিয়ে মিশিয়ে মাটি আঁকতে হবে না। এইটে গুলে লাগিয়ে দেব এবার থেকে।

কতকগুলি রং এর মধ্যে সত্যি খুব ভালো হয়েছিল। অনেক ছবি এঁকেছিলেন এই রং দিয়ে। নীল রংটা আশ্চর্য রকম উতরে গিয়েছিল। বহুদিন ছিল এই রংটা—অল্পে অল্পে খরচ করতেন। বলতেন—নীল-বড়ি। নীল-সায়েবদের আসল নীলের মতো রংটা হয়েছে। বিলাতী বাক্সে ও রং পাওয়া যায় না।

গঙ্গামাটির রং দিয়ে ছবি এঁকেছিলেন এ সময়। সে-ছবি এখনও কিছু কিছু আমাদের কাছে আছে। নীল-বড়ি দিয়ে পাহাড়ী কুটিরের একখানা ছবি এঁকে চারুদিদিকে দিয়েছিলেন। আশ্চর্য গুণ ছিল সেই রংটার। চারুদিদির বাড়ি যতবারই গেছি, দেখতুম নীল রংটা যতদিন যাচ্ছে, ততই যেন উজ্জ্বল হচ্ছে। এই সময় রং-এর চর্চা চলেছিল অনেকদিন। শুধু ছবি আঁকার রং নয়, কাপড় ছোপাবারও নানারকম দেশী রং দাদামশায় খুঁজে বার করেছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখা 'দেশী রং' নামে একখানি বই এই সময় বেরয়।

তার থেকেও অনেক তথ্য পেয়েছিলেন দাদামশায়। দিদিমার জন্যে একবার একটা কাপড়ের টুকরো টকটকে লাল রং-এ ছাপিয়ে দিয়েছিলেম। সেটা যখন ধোপার বাড়ি থেকে ফিরল, তখন দেখা গেল কাপড়ের টুকরোটা রং-ফিরিয়ে গরগরে হলদে হয়ে গেছে। তখন সকলের সে কি হাসি !

বাজারে বিলিতী প্ল্যাস্টিসিন্ পাওয়া যেত, তাই দিয়ে আমরা মানুষ, পাখি, পুতুল, খেলনা গড়তুম। খেলতে খেলতে প্ল্যাস্টিসিন শেষ হয়ে গেলে গুপীবাবু মার্কেটে গিয়ে আবার আমাদের এনে দিতেন। বিলিতী বর্জনের যুগে কেউ আর বলতে পারল না যে মার্কেট থেকে ছেলেদের জন্যে একবাক্স রংচং-এ বিলিতী প্ল্যাস্টিসিন কিনে আনা হোক। প্ল্যাস্টিসিন নিয়ে খেলতে গিয়ে নিশ্চয় আমাদের খুব ভালো লাগত, কিন্তু তাই বলে প্ল্যাস্টিসিনের অভাবে যে আমাদের খেলাঘর অন্ধকার হয়ে যাবে তা-ও নয় ; তবু দাদামশায়ের মনে জিনিসটা লেগেছিল। তিনি বললেন—আয়, তোদের জন্যে দিশী প্ল্যাস্টিসিন তৈরি করে দি। ক্ষিতীশ, যাও বেনের দোকান থেকে জমিদারী মোম আর রং কিনে নিয়ে এস তো।

ক্ষিতীশ জমিদারী মোম নিয়ে ফিরতে তাই গলিয়ে তার সঙ্গে এটা-ওটা মিশিয়ে নানারকম পরীক্ষা চালালেন কয়েক দিন। তারপর একরকম দিশী প্ল্যাস্টিসিন বার করে ফেললেন। বললেন—এতে খালি ভুষো কালির কালো রং-ই লাগল, আর কোনোরকম রং ধরাতে পারলুম না। নে তোরা এই নিয়েই খেল। বলে আমাদের এক তাল কালো প্ল্যাস্টিসিন দিয়ে দিলেন।

রংএর জন্যেই হোক বা যে-কোন কারণেই হোক আমাদের কিন্তু সে প্ল্যাস্টিসিন মনে ধরল না। কয়েকদিন খেলা করে আমরা হাত গুটিয়ে নিলুম। তখন দাদামশায় নিজেই সেই নিজের গড়া প্ল্যাস্টিসিন দিয়ে নানারকম পুতুল গড়তে শুরু করলেন। গড়তে গড়তে শেষে দেখা গেল এমনই অপূর্ব কিছু কিছু জিনিস তৈরি করে ফেলেছেন যে সেগুলিকে স্থায়িভাবে রক্ষা করলে ভাল হয়। মোমের পুতুল ফেলে রেখে দিলে বেশীদিন টিঁকবে না। তাই হরিচরণ মিস্ত্রীর ডাক পড়ল। হরিচরণ যে-কোনো জিনিস ছাঁচে ঢালাই করতে পারত কিন্তু নরম মোমের জিনিস পিতলে ঢালাই করা এক মহা সমস্যা—একটু গরম

বা একটু চাপ পড়লেই মোমের আকৃতি নষ্ট হয়ে যাবে! দাদামশার সঙ্গে পরামর্শ চললো ক-দিন ধরে। শেষে দুজনে মিলে কি একটা পদ্ধতি বার করলেন যাতে করে তুলতুলে মোমের পুতুলও পিতলে ঢালাই করা যায়।

দাদামশায় বললেন—হরিচরণ এ তুমি পেটেণ্ট করে রেখে দাও। খবরদার কাউকে শিখিও না।

জানি না, হরিচরণের বংশে আজও সেই গুপ্ত পদ্ধতি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সঞ্চারিত হয়ে আসছে কিনা, কিন্তু সে সময়কার দাদামশার অতি নিখুঁত কতকগুলি মোমশিল্প আজও পিতলের মাধ্যমে রক্ষিত হয়ে রয়েছে।

এই সময় আমাদের বাগানের মাধবীলতার ফলগুলি ফেটে তার থেকে তুলো বেরিয়ে বাগানে উড়তে আরম্ভ করল। আমরা তাদের পিছনে পিছনে ছুটলুম ধরবার জন্যে। দাদামশায় দেখে বললেন—নিয়ে আয় একগোছা তুলো, দেখা যাক স্বদেশী তুলি করা যায় কিনা। আমরা মাধবীলতায় চড়ে শুকনো ফল ফাটিয়ে নরম পালকের মত একমুঠো তুলো সংগ্রহ করে দাদামশায়কে দিলুম। সেগুলি তিনি সরু সরু তুলির মত করে সুতো দিয়ে কয়েকটা বেঁধে ফেললেন। তারপর বাগানের চীনে বাঁশের ডগা কেটে কয়েকটা তুলির বাঁট তৈরি হল। তাইতে তুলির গোড়াগুলি ঢুকিয়ে দিয়ে ঝাউ গাছের আঠা আর গালা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হল। সাদা ধবধবে তুলি তৈরি হল কতকগুলি।

কিন্তু জলে ডুবিয়ে রং তুলতে গিয়ে দেখা গেল মাধবীর ফুলও যেমন কোমল, মাধবীর তুলোও তেমনি নরম। জলে ডুবিয়ে রং তুলতে গেলে নেতিয়ে পড়ে। আঁচড় টানা তো যায়ই না, রংই উঠতে চায় না তুলির মাথায়। একেবারে জলেভেজা তুলো। দাদামশায় কয়েকবার চেষ্টা করে বিরক্ত হয়ে শেষে ছেড়ে দিলেন। বললেন—বাগানে কাঠ-বেরালী থাকলেও না-হয় দু-একটার ল্যাজ কেটে দেখতুম। তা তো নেই। গাছের তুলো দিয়ে ছবি আঁকার তুলি হয় না—একটা শিক্ষালাভ করা গেল।

এরপর একদিন দাদামশার সঙ্গে তর্ক করেছিলুম আমরা।

আমাদের যুক্তি ছিল, তুলিই হচ্ছে আসল। জানোয়ারের লোম দিয়ে তুলি তৈরি করবার কায়দা যদি আবিষ্কৃত না হত তাহলে আর্টিস্টই জন্মাত না। অর্থাৎ দাদামশার এত নামই হত না।

দাদামশায় বললেন—তুলি না থাকলে কলম দিয়ে আঁকতুম, পেন্সিল দিয়ে লিখতুম।

আমরা ছাড়বো কেন? বললুম—কলম, পেন্সিল না থাকলে?

—খড়িমাটি দিয়ে আঁকতুম।

—খড়িমাটি না থাকলে?

—এটা দিয়ে। এটা না থাকলে ওটা দিয়ে। এই চলল খানিকক্ষণ।

শেষে গাছের ডাল, পাখির পালক সব যখন ফুরিয়ে গেল, তখন দাদামশায় নিজের ডান হাতের পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে বললেন—কিছুই যদি না থাকত, তাহলেও এই আঙুল ক-টা দিয়ে দেগে চলতুম। ছবি আঁকা বন্ধ হত না। ভিতর থেকে ঠেলা দিত। আঙুল ক-টা নিস্-পিস্ করে উঠত। হাত যখন ছিষ্টি হয়েছে ছবিও ছিষ্টি হত। আগে যন্ত্র তারপর কারিগর, এ নয়। আগে হাত, পরে হাতিয়ার।

বাগানে মালীরা আগের দিন কাঠকুটো জ্বালিয়েছিল, বললেন—নিয়ে আয় কয়েকটা পোড়া কাঠি। দেখিয়ে দি।

আমরা কয়েকটা আধপোড়া কাঠকয়লা নিয়ে ফিরলুম। দাদামশায় তাই দিয়ে এক-টুকরো কাগজের উপর চমৎকার একটা ছবি আঁকলেন।

ছবিটা আমাদের খুব ভালো লাগল। কিন্তু কাঠকয়লা? কতক্ষণই বা টিকবে তার আঁচড়?

বললুম—এ তো এখনই মুছে যাবে। আর্টিস্টের নামও কেউ করবে না।

দাদামশায় বললেন—রোস্ রোস্। শেষ করতে দে আগে। বলে জলে

ডোবালেন কাগজটা। অর্ধেক ধুয়ে মুছে গেল। তারপর শুকিয়ে নিয়ে পোড়া কাঠের রেখার উপর ঘষতে লাগলেন আঙুল। কয়লা আর আঙুলের ঘষাঘষি চলল কাগজের উপর। একবার করে নতুন রেখা পড়ে, তার উপর আঙুলের ঘর্ষণ, তার উপর জলের প্রলেপ এমনি চলল সারা সকাল। শেষে একটি পাকা পোক্ত সাদায়-কালোয় ছবি শেষ করে বললেন—দে রোদে দিয়ে—আর উঠবে না।

বললেন—পোড়া কাঠের ছবি তো দেখলি? কিছু না থাকলে জ্বালানি কাঠ দিয়েও আঁকা চলত। আবার দোকান থেকে ছবি-আঁকা 'চারকোল' আর 'ফিক্সার' কিনে এনেও ছবি হয়। দেখবি?

এই বলে দেরাজের খুপরির মধ্যে থেকে টেনে কতদিনের পুরোনো চার-কোল-এর টুকরো বার করে আমাদেরই কার একটা মুখ আঁকা শুরু করলেন। তারপর পাশাপাশি দুটো ছবি রেখে বললেন—দেখ্। এ-ও ছবি, ও-ও ছবি। কিছু তফাত দেখছিস্?

আমরা বললুম—আগেরটাই বেশী ভালো।

দাদামশায় বললেন—হবেই তো। আঙুল পড়েছে কত? আঙুলের কাছে কি কিছু লাগে?

এই সময় সেই পুরোনো বাক্স থেকে বার-করা চারকোল দিয়ে কিছু ছবি এঁকে ছিলেন। চারকোল, খড়িমাটি, গেরিমাটি যা হাতের কাছে এসেছে তাই দিয়ে দাদামশায় ছবি এঁকে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। একবার টুথ ব্রাশ দিয়ে একটা ছবি আঁকলেন। দেখে কে বলবে যে জি. সি লাহার দোকানের তুলি দিয়ে আঁকা নয়? বললেন—এ-ও ব্রাশ, ও-ও ব্রাশ, আর্টিস্টের হাতে পড়ে সবই সমান।

এই সময় দাদামশায় বহুদিন পরে আর একবার পোর্ট্রেট আঁকা শুরু করেছিলেন। আমরা দাদামশায়কে এই প্রথম পোর্ট্রেট আঁকতে দেখলুম। আমরা জন্মাবার আগে দাদামশায় এক সময় কতকগুলি বিখ্যাত পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন—তার মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ছিল আর ছিল বড়মামার ছেলেবেলার এক পোর্ট্রেট—যা এঁকে

প্যারিসের প্রদর্শনীতে প্রাইজ পেয়েছিলেন। এবারে একে একে বাড়ির সকলের চেহারা এঁকে ফেললেন। আত্মীয়, ছাত্র, পরিচিত, বন্ধু তারপর রাধু চাকরও বাদ গেল না।

পোর্ট্রেট আঁকতে আঁকতে একদিন বললেন—মানুষের মুখ দেখে-দেখে এমন হয়েছে যে আজকাল মুখোশ দেখি। আসলে জানিস্ সব মানুষের মুখের চামড়ার ঠিক তলায় একটা করে মুখোশ আছে—সেগুলো আমার চোখে পড়ে এখন। ঐতেই মানুষের আসল রূপ ধরা যায়। এই বলে নানারকম মুখোশ আঁকতে শুরু করে দিলেন দাদামশায়। দেখতে দেখতে ষাট সত্তর খানা মুখোশ হয়ে গেল। কত্তাবাবার কি একটা নাট্য হচ্ছিল, বোধ হয় তপতী, তার চরিত্র নিয়ে খান দশেক মুখোশ এঁকে ফেললেন।

সেই সময় একদিন কত্তাবাবার কাছ থেকে এক চিঠি এসে হাজির। শান্তিনিকেতনে একজন সায়েব আর্টিস্ট এসেছেন, তিনি আইনস্টাইন প্রমুখ বহু মনীষী ও বিখ্যাত লোকের পোর্ট্রেট এঁকেছেন। শান্তিনিকেতনে কত্তাবাবার, নন্দদা-র এবং আরো সকলের ছবি তো এঁকেইছেন, এইবার জোড়াসাঁকোয় একবার যেতে চান, দাদামশার সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাঁদের পোর্ট্রেট আঁকবেন।

সায়েব আসছে শুনে বারান্দার চেয়ার-টেয়ারগুলো একটু নড়িয়ে চড়িয়ে সারবন্দী করা হল। কার্নিশটা ঝেঁটিয়ে রাখা হল, আর বিশেষ কিছুই হল না। সয়েবই আসুক আর যে-ই আসুক বারান্দাতেই তাদের নিয়ে আসা হত, বারান্দাতেই তাদের বসতে বলা হত। সকলেরই স্থান ছিল ঐ বারান্দা। সাজানো গোছানো লাইব্রেরী-ঘর একটা ছিল বটে, কিন্তু সেখানে অতিথি-আপ্যায়ন করতে দাদামশায়দের আমরা খুব কমই দেখেছি। অনেককাল আগে শুনেছি ঐ ঘরে দাদামশায়দের আড্ডা-টাড্ডা জমত। চীনা আর্টিস্ট, জাপানী আর্টিস্ট, লাট-বেলাটকে ঐ ঘরে বসিয়ে এককালে খাতির করা হয়েছে, কিন্তু হালে লাইব্রেরী ঘর পড়েই থাকত। শুধু গ্রীষ্মের দুপুরে ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা থাকত বলে তিন দাদামশায় দিবানিদ্রার জন্যে খানিকটা ব্যবহার করতেন, নইলে আর ঢুকতেন না।

সায়েব তো এলেন। ভারি চট্‌পটে সায়েব। আলাপ-সালাপ করেই ব্যাগের মধ্যে থেকে কাগজ আর মোটা মোটা পেন্সিল বার করে বসে গেলেন পোর্ট্রেট আঁকতে। সায়েব বললেন—যে যেমন আছেন বসে থাকুন, যা কাজ করছিলেন করতে থাকুন। ব্যস্ত হতে হবে না, পোজ দিতে হবে না। আমি স্কেচ করে যাচ্ছি।

বারান্দায় তিন ভাই যেমন দক্ষিণ-মুখো হয়ে তাঁদের চেয়ারে বসতেন তেমনই বসেছিলেন। প্রথমে বড়দাদামশায় ছবি আঁকছিলেন, তিনি। তারপর দাদামশায়, তিনিও ছবি আঁকছিলেন। শেষে বারান্দার পুব কোণে গোল-সিঁড়ির পাশে মেজদাদামশায় বসে বই পড়ছিলেন। দক্ষিণের বারান্দার পুব কোণে নীচের তলা থেকে তিন-তলা পর্যন্ত একটা কাঠের গোল সিঁড়ি ছিল, চারিপাশ তার কাঠ দিয়ে ঘেরা। অন্ধকার সিঁড়ি, মাঝে মাঝে শুধু দু-একটা ফোকর। এটা ছিল খিড়কির সিঁড়ি। এই সরু অন্ধকার-অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে শুধু বাড়ির লোকেরাই আনাগোনা করতেন। বড়দাদামশায় সকালবেলা তিনতলা থেকে দোতলায় নামতেন। দাদামশায় দোতলা থেকে নামতেন বাগানে। আমরা লুকোচুরি খেলতুম। সন্ধ্যের পর যখন ঘুটঘুট্টি অন্ধকার হয়ে যেত সিঁড়িটা তখন ওদিকে ঘেঁষতেই আমাদের সাহস হত না।

প্রথম পোর্ট্রেট হল বড়দাদামশায়ের। কখন যে আঁকা শেষ হয়ে গেল বড়দাদা টেরই পেলেন না। ছবিখানা হল একেবারে জীবন্ত। সই করে দিলেন বড়দাদা ছবির নীচে।

তারপর সায়েব গেলেন মেজদাদার সামনে। চটপট চলল হাত। চটপট শেষ হল ছবি। হুবহু মেজদাদার মুখ। মেজদাও করলেন সই।

তারপর দাদামশার পালা। দাদামশার এক মনে ঘাড় গুঁজে সটকা মুখে দিয়ে ছবি আঁকছিলেন। সায়েব এসে দাঁড়াতেই ছবি সরিয়ে রেখে মুখ থেকে সটকা নামিয়ে সোজা হয়ে বসতে যাবেন, সায়েব বাধা দিয়ে বললেন—ব্যস্ত হবেন না মিস্টার টেগোর। আপনি যেমন ছবি আঁকছিলেন আঁকুন।

দাদামশায় ছবিটাকে সবে ভিজিয়েছিলেন। সেটাকে শুকোবার জন্যে একপাশে রেখে দিলেন। তারপর আর একটা কাগজ নিয়ে বসে গেলেন

আবার একমনে। চলল ঘাড় গুঁজে ছবি আঁকা। মুখে রইল্ রুপোর মুখনল দেওয়া সটকা। ফুড়ুক ফুড়ুক করে টেনে চললেন তামাক, যেমন ছবি আঁকবার সময় সব সময় টানতেন। দাদামশার নীচের কি উপরের ঠিক মনে নাই, একটা দাঁত একটু ভাঙা ছিল। সেই ভাঙাটুকুর মাঝে রুপোর মুখনলটা কাপে কাপে বসে যেত। কত সময় দেখেছি ছবি আঁকতে আঁকতে তামাক পুড়ে গেছে, গুলের আগুন নিভে গেছে কিন্তু দাদামশায় দাঁতে নল চেপে বসে আছেন, নামিয়ে রাখেন নি। টেনেই চলেছেন। জলের মধ্য দিয়ে শব্দ আসছে—গুড়ুক গুড়ুক—ধোঁয়া আসছে কি না-আসছে খেয়াল নেই।

সায়েব একটু পরেই তাঁর আঁকা শেষ করে ছবিটা বাড়িয়ে তাঁর কাঠ-কয়লার পেন্সিল এগিয়ে দিয়ে বললেন—আপনার নামটা সই করে দেবেন মিস্টার টেগোর—দয়া করে?

দাদামশায় বললেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু দয়া করে আপনার নামটা-ও সই করে দেবেন সায়েব?

বলে যে কাগজখানা কোলে নিয়ে বসেছিলেন, সেখানা এগিয়ে ধরলেন। কাগজে সায়েবের একখানা মুখোশ!

সায়েবের চোখ তো কপালে উঠল। সায়েবের খুব নাম-ডাক যে তাঁর মতো এত তাড়াতাড়ি কেউ স্কেচ করতে পারে না। এইবার তাঁর এক প্রতিদ্বন্দ্বী জুটল নাকি?

—এ কি, মিস্টার টেগোর? আপনি তো একবারের বেশী আমার মুখের দিকে তাকান নি। কখন আঁকলেন ছবিটা? তা ছাড়া এ তো এক অপূর্ব পোর্ট্রেট। এরকম স্টাইলে যে পোর্ট্রেট আঁকতে পারা যায় এ তো ভাবতেই পারি না আমরা!

দাদামশায় নল মুখে দিয়েই হাসতে হাসতে বললেন—তুমি যতক্ষণ স্কেচ করছিলে সায়েব তারই মধ্যে এটা এঁকে ফেলেছি। একে আমি বলি মুখোশ। তবে এটা বাইরের মুখোশ নয়, ভিতরের। কেমন হয়েছে সায়েব?

সায়েব তাজ্জব বনে গিয়ে বললেন—অমূল্য! এই বলে ছবির বদলে ছবি নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন।

গান্ধীজী যেবারে ডাণ্ডিতে নুন তৈরি করতে গিয়ে সারাদেশকে আইন অমান্য আন্দোলনের পথে টেনে নিলেন সেবার আমিও দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে একদিন গ্রীষ্মের দুপুরে চুপি চুপি কাউকে না বলে জোড়াসাঁকো বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম নুন তৈরি করার মতলবে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একটা আপিস কলেজ স্কোয়ারে ছিল। সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বে-আইনী নুন তৈরি করার স্বয়ংসেবকদের একটা ঘাঁটি। মোটা খদ্দরের ধুতি আর কালো খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে একখানা ঝোলা কাঁধে দুপুরবেলা কংগ্রেস আপিসে হাজির হলুম। বললুম, এইবার আমাকে নুন তৈরি করতে পাঠানো হোক। শুনলুম মেদিনীপুরে একটা দল যাবে, তারই সঙ্গে আমি হয়তো যেতে পারি। এখন অপেক্ষা করতে হবে। পাশের ঘরে ডুপলিকেটার ঘুরিয়ে খবরের বুলেটিন ছাপা হচ্ছিল, আমি গিয়ে বসলুম সাহায্য করতে।

হঠাৎ দেখি নন্দ-দা। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর একটা গোপন যোগাযোগ ছিল জানতুম। কিন্তু নন্দ-দাকে এরকম নিষিদ্ধ জায়গায় একেবারে চোখের সামনে দেখে ফেলব ভাবিনি। মজা হল এই যে আমি নন্দ-দার কাছে ধরা পড়ে গেলুম না তিনিই আমার কাছে ধরা পড়ে গেলেন ঠিক বোঝা গেল না। দাদামশায়কে নন্দ-দা ভয় করতেন। আর দাদামশায় ভয় করতেন এই সব কংগ্রেসী আন্দোলনকে, ধড়পাকড় পুলিস আদালত জেল গুলি বন্দুককে। দাদামশার কাছে নন্দ-দা বালক, আর এই সব ভয়ানক বিপদের মুখে এগিয়ে যাওয়া মানে অবোধ শিশু। নন্দ-দা ভাবলেন মোহনলাল বাড়ি গিয়ে বাবা-মশায়কে যদি বলে দেয় তাহলেই চিত্তির। আর আমি ভাবছি নন্দ-দা যদি দাদামশার কানে কথাটা তোলেন তাহলে তো এখনি আসবেন ধরে নিয়ে যেতে।

কিন্তু দু-জনেই অপরাধী। কাজেই কেমন করে জানি না, একটা নির্বাক রফা হয়ে গেল। 'এই-যে, হ্যাঁ, তাই-তো, না' বলে দু-জনে অতি দ্রুত দু-

ঘরে সরে পড়লুম। নন্দ-দা কি জন্যে সেখানে এসেছিলেন আমি আজও জানি না। আমি যে কি করতে এসেছি, নন্দ-দাও জানতে চাইলেন না। চোখে পড়ল শুধু নন্দ-দা নন, শান্তিনিকেতনের প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও মোটা খদ্দর গায়ে এ-ঘরে ও-ঘরে ঘোরাফেরা করছেন। ' তাঁরও কি উদ্দেশ্য জানবার আগ্রহ না দেখিয়ে আমি নিজের কাজে মন দিলুম। এর কিছুদিন পরেই কংগ্রেস আপিস পুলিস এসে বন্ধ করে দেয়।

ইতিমধ্যে বাড়িতে এক কাণ্ড ঘটে গেল। আমি যে ছোট্ট চিঠি লিখে এসেছিলুম নুন তৈরি করতে যাচ্ছি বলে, তা দাদামশার হাতে পড়ল। কোথায় যাচ্ছি লিখিনি—কংগ্রেস আপিসের নামও করিনি। দাদামশায় সুতরাং বুঝতেই পারলেন না কি করা যায়। একটু ফাঁপরে পড়লেন। একমাত্র সুজন জানতো আমার গোপন অভিযানের খবর। সুজনের সঙ্গেই লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু কিছু দেশোদ্ধারের আলোচনা, নিষিদ্ধ বুলেটিন, বাজেয়াপ্ত বই আর সংবাদপত্রের আনাগোনা চালাতুম। সুজন কাউকে কিছু বললে না। দাদামশায় বাড়ির উকিলকে টেলিফোন করলেন।

তিন দাদামশার জীবনের যা-কিছু সমস্যা তা হয় বৈষয়িক না হয় রোগ সংক্রান্ত। বৈষয়িক হলে উকিলের আর কায়িক হলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে তাঁরা অভ্যস্ত। অদ্ভুত নির্ভরশীলতা ছিল বাড়ির উকিল আর বাড়ির ডাক্তারের উপর। বাড়ির মানুষদের অসুখ যে সেরে যায়, বাড়ির ছেলে-মেয়েরা যে বেঁচে-বর্তে থাকে এর একমাত্র ব্যাখ্যা মহেন্দ্র ডাক্তারের অব্যর্থ ওষুধ। মৃত্যু অবশ্য আছেই—কিন্তু সে তো ঈশ্বরের অমোঘ বিধান। তেমনি রোজকার ডাল-ভাত, একটু আধটু সুখ-সুবিধে এতগুলো মানুষের মাথার উপর আচ্ছাদন, এর আসল সহায় তো জমিদারির আয় নয়; জোড়াসাঁকো বাড়ির এই প্রবহমান স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার প্রধান উৎস বাড়ির উকিলের নির্ভুল ব্যবস্থা ও উপদেশ।

আরো একবার হয়েছিল। সে-ও কংগ্রেসের ব্যাপার। পার্ক সার্কাসে যেবার কংগ্রেস অধিবেশন হয় আমরা কয়েকজন ছেলে গানের দলে যোগ দিয়েছিলুম। একদিন রিহার্সাল দিতে দিতে এত দেরি হয়ে যায় যে আমাদের

বাড়ি ফিরতে রাত দশটা হয়েছিল। দেরি দেখে এবং কংগ্রেসের ব্যাপার বলে মেজদাদামশায় ঘনঘন উকিল-বাড়ি টেলিফোন করছিলেন—আমাদের কি হয়েছে—জেল না গুলির ঘায়ে মৃত্যু, তাই জানবার এবং তার সুরাহা করবার জন্যে। আমরা ফিরে দেখি অন্ধকারে টেলিফোনের কাছে স্তব্ধ হয়ে মেজদাদা দাঁড়িয়ে। উকিল কোনো সাহায্যই করতে পারেনি বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় !

এবারও উকিল কোনো সদুপদেশ দিতে পারলেন না। তখন বাড়িরই কে একজন পরামর্শ দিলেন কংগ্রেস আপিসটা একবার দেখে আসতে। দাদামশায় মিশির ড্রাইভারকে ডেকে মোটরটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

কংগ্রেস আপিসে ঘণ্টা তিন মাত্র ছিলুম। নিষিদ্ধ বুলেটিন ছাপার কাজে শুধু সাহায্যই করেছি—পড়বারও সময় পাইনি। এমন সময় কানে এল আমাদের চেনা মোটরের ভেঁপু। প্রমাদ গনলুম। তারপর এল দাদামশার চড়া গলা। নন্দ-দা ততক্ষণে টের পেয়ে এক দৌড়ে বারান্দার এক-কোণে দু-খানা থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছেন। প্রভাতবাবু যে কোথায় গা ঢাকা দিলেন দেখতে পেলুম না। আমি আর কোনো উপায় না দেখে আত্ম-সমর্পণ করলুম। দাদামশায় কংগ্রেসের কর্তাদের, তাঁরা নাকি ছেলেধরার ফাঁদ পেতেছেন বলে এমন ধমক লাগালেন যে, কেউ কোনো উত্তর দিতে সাহস করলেন না। তারপর আমাকে গাড়িতে তুলে হাওয়া। নন্দ-দা বেঁচে গেলেন।

বাড়িতে পৌঁছে খদ্দর-টদ্দর ছেড়ে আবার মার্কিনের জামা পাজামা পরতে হল। আমি আপত্তি করেছিলুম, কিন্তু দাদামশায় শুনলেন না। বললেন, খুব হয়েছে। ছাড়ো ওসব। ঐ কালো পাঞ্জাবি আর ঐ ঝুলিটা দেখলেই পুলিসে ধরবে।

নিজেকে পুলিসে ধরানোই যে আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল এটা দাদামশায়কে বলতে সাহস হল না। সুতরাং কালো খদ্দর ছেড়ে ফেলতে হল। তারপর দাদামশায় জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় যাবার জন্যে বেরিয়ে-ছিলুম আমি ?

—তমলুক যাবার জন্যে।

—নুন তৈরি করতে ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা ফাঁদ পেতেছে গাঁধী। নুনের টানে ছেলে ধরা। যাক্, যা বকুনি দিয়েছি ওদের, তোকে আর ওরা ছোঁবে না।

—তাই তো মনে হয়।

—যা এখন ফুর্তি-মনে খেলাধুলো করগে। নুন তৈরি করে কি হবে ? বেচে পয়সা পাবি ?

এমনভাবে ধরা পড়ে গিয়ে এবং সব প্ল্যান ভেস্তে যাওয়ায় ফুর্তি আমার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরদিন সকালে মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, দাদামশায় ডেকে বললেন—নুন তৈরি করবি ?

হঠাৎ এই প্রশ্নে আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম। কি মতলব দাদামশার বুঝতে পারলুম না।

—বাড়িতেই নুন তৈরি হতে পারে। তার জন্যে তমলুক যাবার দরকার নেই।

এইবার বুঝলুম দাদামশার মাথায় নতুন কোনো বুদ্ধি এসেছে।

—চলে যা গাছঘরের পিছনে, যেখানে যোগীমালী শুকনো নারকেল-পাতা জমা করে রেখেছে। নিয়ে যা এই দেশলাইটা। লাগিয়ে দে আগুন। আমি আসছি।

তখন মনে পড়ল, নারকেল-পাতা থেকে নুন তৈরি হয় একবার শুনেছিলুম বটে। কেমন করে করতে হয় জানতুম না।

সুজনকে ডেকে নিলুম—চলো চলো, নুন তৈরি হবে। দাদামশায় আসছেন।

শুকনো নারকেল পাতাগুলি দাউ দাউ করে জলে উঠল। যখন প্রায় সব পুড়ে গেছে, সুজন আর আমি ভাবছি, বে-আইনী নুনের জন্যে এইবার পাঁচিলের পিছন থেকে পুলিসের আবির্ভাব হবে নাকি, সেই সময় একটা বড় বাটি হাতে দাদামশায় এসে হাজির।

বললেন—ছাইগুলো ভর্ এতে।

আমরা বাটি ভরে সাদা ছাই নিলুম।

—ঢাল জল।

জল ঢালা হল বাটি ভরে।

—এইবার যা একটা ধুতি-ছেঁড়া নিয়ে আয়।

ছেঁড়া কাপড়ের সলতে পাকিয়ে সেই ছাই-গোলা জলের বাটি থেকে গোটাকতক সলতে ঝুলিয়ে দিলেন। তাই বেয়ে টপ্ টপ্ করে স্বচ্ছ জল আর একটা বাটিতে পড়ে জমা হতে থাকল।

দাদামশায় স্নানে চলে গেলেন। বলে গেলেন—বিকেল বেলা এসে দেখিস্, বাটি ভরা নুন-জল তৈরি।

সত্যিই তারপর সেই নুন-জল শুকিয়ে আমাদের বে-আইনী নুন তৈরি হল। দাদামশার বুদ্ধিতে বাটির মধ্যে লবণ-আন্দোলন হল; আইনঅমান্য হল, নুন-ও তৈরি হল, অথচ পুলিস ধরতে পারল না।

॥ ১২ ॥

কলকাতার দোকানে যখনই নতুন কোনো জিনিস উঠত, বিশেষ করে নতুন ধরনের খেলনা, বড়দাদামশায়ের তা কিনে আনা চাই। গ্রামোফোনের যুগের আগে ফোনোগ্রাফ যখন উঠেছিল বড়দাদা তাই নিয়ে অনেকদিন খেলা করেছিলেন। শব্দ তুলতেন, বাজাতেন, শুনতেন, শোনাতেন সবাইকে। আমরা ছেলেবেলায় বড়দাদার ফোনোগ্রাফের চোঙএর সামনে দাঁড়িয়ে গান শুনেছি আর বড়দাদা যখন বলেছেন যে যন্ত্রটার মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট মানুষ আছে, তারাই গান করছে, তা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছি। তারপর ফোনোগ্রাফের চোঙার আকৃতির রেকর্ডগুলো যখন অকেজো হয়ে গেছে তখন সেগুলোকে নিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে অনেক খেলা করেছি।

একদিন সন্ধ্যার সময় দক্ষিণের বারান্দায় হেবির এক বিকট চীৎকার।

আমরা ছুটে গিয়ে দেখি হেবি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর ইজি চেয়ারের উপর পা তুলে আধশোয়া অবস্থায় এক ভীষণ-দর্শন দাড়িওয়ালা মানুষ। ভয় একটু ভাঙতে কাছে গিয়ে দেখা গেল বড়দাদা মুখোশ পরে বসে রয়েছেন। হেবির ভয় দেখে মুখোশ খুলতেই বেরিয়ে পড়ল বড়দাদার মধুর হাসি-ভরা মুখ। কলকাতার বাজারে বিলিতী মুখোশ উঠেছে—একেবারে আনকোরা জিনিস—তারই কটা কিনে এনেছেন।

ট্রাইসাইকেল চড়া আমাদের পুরোনো হয়ে গেছে। বাইসাইকেল চড়ার অনুজ্ঞা তখনও আমরা পাইনি, সেই সময় কোথা থেকে বড়দাদা নিয়ে এলেন কতকগুলো স্কুটার। কাঠের একখানা পাটার দু-মাথায় লাগানো দু-খানা ছোট ছোট চাকা। তার একমাথা থেকে লম্বভাবে উঠে এসেছে একটা হাতল। সেই হাতল চেপে ধরে পাটার উপর একটা পা রেখে অন্য পায়ে মাটির গায়ে ধাক্কা মেরে মেরে ছুট দিতে হয় সামনে। এমন তাজ্জব জিনিস কেউ কখনও চোখে দেখেনি। গোল-বাগানের বাঁধানো রাস্তার উপর স্কুটারের বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল। সকালের রোদে দলে দলে আমরা গোল-বাগানের গোল রাস্তায় স্কুটারে চড়ে পাক খেতে লাগলুম। চাকার শব্দে গোল-বাগান মুখর হয়ে উঠল। বড়দাদার খেয়ালে আমাদের এইরকম নানান খেলনা লাভ হত।

একবার যখন এইরকম অনেক খেলনা আমাদের জমেছে, সেই সব খেলনা সাজিয়ে আমরা একটা মেলা করেছিলুম। উত্তরবঙ্গ সেবার বন্যায় ভেসে গেছে। চারিদিকে ভারি দুঃখ কষ্ট। অনেকে গৃহহারা আশ্রয়হারা সঙ্গতিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুঃস্থদের সাহায্যের জন্যে দেশের নানা জায়গায় চাঁদা তোলা হচ্ছে। আমরাও পড়ে গেলুম সেই স্রোতে। লেগে গেলুম চাঁদা তুলতে। আমাদের ছিল বড়দাদার দেওয়া নানা খেলনা—ভাঙা পুরোনো নতুন। তাই সাজিয়ে যে মেলা খুললাম তার নাম দিলুম—মৌচাক মেলা। ছোটদের পত্রিকা মৌচাকের তখন খুব নাম-ডাক। তারই মারফত মেলায় তোলা টাকাটা পাঠিয়ে দিলুম বন্যা-ভাণ্ডারে।

এই মেলায় আমরা প্রচুর খেলনা আর পোস্ট-কার্ডে আঁকা ছবি বিক্রি

করেছিলুম। আমরা হিজিবিজি আঁকতুম, বড়দাদা কিংবা দাদামশায় এক-আধটা আঁচড় দিয়ে ছবিগুলোকে দাঁড় করিয়ে দিতেন। বেশ দামে বিক্রি হয়ে যেত ছবিগুলি। কত্তাবাবা যেবার প্রথম বর্ষামঙ্গল করেন এ হচ্ছে সেই বছর। বহু লোক, বহু গুণী জ্ঞানী বর্ষামঙ্গলের রিহার্সাল দিতে দেখতে আর শুনতে আসতেন। রিহার্সালের ফাঁকে ফাঁকে এঁদের ধরে নিয়ে আসতুম আমরা আমাদের মেলায়। খদ্দেরের অভাব হত না। কত্তাবাবাকেও একদিন ধরে এনেছিলুম। আমাদের খেলনা তিনি কিনেছিলেন। কিন্তু আমাদের সব চেয়ে বড় খরিদ্দার ছিলেন বড়দাদামশায়। বড়দাদা একাধারে যেমন ছিলেন আমাদের খেলনা-সরবরাহকারক তেমনি ছিলেন তিনি মেলার প্রধান ক্রেতা। চাঁদার অঙ্কটা মোটা করবার জন্যে আমরা আমাদের স্কুটারগুলোকে পর্যন্ত লাটে চড়িয়েছিলুম। বড় শখের জিনিসগুলো, তবু মায়া ত্যাগ করেছিলুম। বড়দাদা এসেই সমস্ত স্কুটার কিনে নিলেন। তারপর সন্ধেবেলা ফিরিয়ে দিলেন আমাদের স্কুটারগুলো। হাতছাড়া হয়েই গিয়েছিল জিনিসগুলো—ফেরত পেয়ে বড় ভালো লাগল। বেশ করে চড়ে নিলুম ফের একবার। কিন্তু মৌচাক মেলার কি এক পরিবেশ, কি এক মোহ, আবার আমাদের ত্যাগের আমেজ লাগল। আবার আমরা স্কুটারগুলোকে লাটে চড়ালুম। বড়দাদা খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি মেলায় এসে স্কুটারগুলোকে দ্বিতীয়বার কিনে নিলেন। আমাদের উপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। তাই এবারে আর মৌচাক-মেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্কুটারগুলো আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিলেন না। না দিয়ে ভালই করেছিলেন। স্কুটারগুলো তাই শেষ পর্যন্ত আমাদের রয়ে গিয়েছিল।

এরপর হঠাৎ একদিন বড়দাদা কোথা থেকে দুটো মডেল এরোপ্লেন কিনে নিয়ে এলেন। সত্যিকারের এরোপ্লেন তখন আকাশে কদাচিৎ দেখা যেত। মডেল এরোপ্লেন পেয়ে আমরা হাতে স্বর্গ পেলুম। এরোপ্লেনের ব্লেডটা রবারে পাক দিয়ে ছেড়ে দিলে আকাশে উড়ত। কিন্তু আমাদের বাগানে অনেক গাছ থাকায় এরোপ্লেনগুলো গোঁত্তা খেয়ে প্রায়ই ডালপালার মধ্যে আটকা পড়ে যেত। তাদের পাখনাগুলো যেত ভেঙে। বড়দাদা ভাঙা প্লেনগুলো

নিয়ে বেরলেন একদিন। যাদের কাছ থেকে কিনতেন তাদের দেখালেন। বললেন—কি করে সারানো যায় এগুলো? তারা বললে—খেলনা তো ভাঙবেই, আবার নতুন কিনুন।

—উঁহুঃ!

বড়দাদার পছন্দ হল না তাদের পরামর্শ। তিনি নতুন এরোপ্লেন না কিনে নানা দোকান ঘুরে শিরীষের আঠা, সরু কাঠ, বার্নিস করা কাগজ, তার, পেরেক আর সুতো কিনে বাড়ি এলেন। তারপর ঐ নিয়েই পড়লেন বেশ কিছুদিন। ভাঙা এরোপ্লেন সারাতে গিয়ে বড়দাদা দেখলেন ঐ সব সরু কাঠ আর শিরীষের আঠা দিয়ে নতুন নতুন এরোপ্লেনও তৈরি করা যায়। এইভাবে নানা ধাঁচের এরোপ্লেন গড়তে শুরু করেছিলেন বড়দাদামশায়। শেষে নিজেই মাথা থেকে বার করলেন খুব হালকা ধরনের গ্লাইডার। দেখতে এরোপ্লেনের মতো কিন্তু তাতে প্রপেলার লাগত না। গোঁত্তা খেলে সেগুলো ভাঙতও না। বহু দূরে উড়ে যেত। অনেক রকম আকৃতির গ্লাইডার বড়দাদা তৈরি করেছিলেন।

এই গ্লাইডার নিয়ে একবার এক কাণ্ড হয়। একটা ভারি সুন্দর গ্লাইডার তৈরি করে ওড়াচ্ছেন, হঠাৎ কোথা থেকে এল এক দমকা হাওয়া। নীচে থেকে এক ঠেলা লাগল। উড়ে চল্লো সেটা পাখির মতো। উড়ছে তো উড়ছেই। শেষে বসল গিয়ে একেবারে আমগাছের মগ ডালে। প্রকাণ্ড আমগাছ—সেখানে হাত পৌঁছয় না কারো। চাকর বাকর মালীরা তার মগডাল অবধি চড়তেই পারল না। লগি দিয়েও সেটাকে নামানো গেল না। বড়দাদাই বারণ করলেন, বললেন—খোঁচা দিসনে, ছিঁড়ে যাবে। থাক বরং গাছে, গাছে চড়বার শখ হয়েছে যখন। এইভাবে সেদিন রইল বড়দাদার গ্লাইডার আমগাছে চড়ে।

পরদিন সকালবেলা বড়দাদা বারান্দায় এসেছেন ছবি আঁকবার জন্যে। নিজের জায়গায় বসতে যাবেন, দেখেন পায়ের কাছে গ্লাইডারটা রয়েছে। পোষা কুকুর যেমন শুয়ে থাকে ঠিক তেমনি।

একে ডাকেন, ওকে ডাকেন। দেখে যা দেখে যা দুষ্টু ছেলেটা ফিরে

এসেছে বলে চীৎকার করেন। চেঁচামেচি শুনে আমরা এসে ব্যাপার দেখে থ'। রাত্রে একটা ঝড়ো হাওয়া উঠেছিল, তাইতে চড়ে ফিরে এসেছেন ঘরের ছেলে ঘরে।

তারপর এল বিলিতী বর্জনের যুগ। লোকে বিলিতী কাপড় পুড়িয়ে ফেলতে থাকল। বিলিতী সাবান এসেন্স ছেড়ে দিয়ে বেসন মেখে স্নান করতে লাগল। বড়দাদাও তাই বিলিতী খেলনা কেনা বন্ধ করে দিলেন। বহুদিন আমাদের বাড়িতে আর কোনো নতুন খেলনা নেই, নতুন টুকিটাকি জিনিস নেই—সবই প্রায় পুরোনো হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে। সেই সময় ভবানীপুরের পোড়াবাজারে এক স্বদেশী প্রদর্শনী হবে বলে শোনা গেল। দাদামশায়রা বললেন—যাই একবার দেখে আসি স্বদেশী প্রদর্শনীতে নতুন কিছু উঠল কিনা। বড়দাদা বললেন—খেলনা-টেলনা ওঠে তো নিয়ে আসব।

তিন দাদামশায় গেলেন পোড়াবাজারে স্বদেশী একজিবিশন দেখতে। বিকেল বেলা গেছেন, সন্ধেবেলা হঠাৎ খবর পাওয়া গেল পোড়াবাজারের প্রদর্শনীতে আগুন লেগেছে। নবুমামাই প্রথম খবর এনেছিলেন। কোথা থেকে শুনেছিলেন জানি না—মুখ-টুখ ভয়ে তাঁর সাদা। বললেন—ভিতরে যারা ছিল শুনলুম কেউ বেরতে পারেনি, সব মাংসের কোপ্তা হয়ে গেছে। টেলিফোনের পর টেলিফোন। লোকজন ছুটল। বাড়ির সকলে মহা চিন্তিত—দাদামশাদের দেখা নেই। অনেককাল আগে একবার পুড়েছিল বলে নাম পোড়াবাজার। আবার সেখানে আগুন লেগেছে তাই ভয়টা আরো বেশী।

তারপর অনেক পরে দাদামশায়রা ফিরলেন অক্ষত দেহে। আগুন লাগার ফলে ছুটোছুটি ধাক্কাধাক্কি শুরু হওয়ায়, গেটের দিকে ভিড়ের চাপ বাড়ায় দাদামশায়রা আর সেদিকে এগোননি। আশ্রয় নিয়েছিলেন একজিবিশনের এক নিরালা কোণে। তারপর হাঙ্গামা চুকে গেলে, সব ঠাণ্ডা হলে আস্তে আস্তে বেরিয়েছেন। তাইতে ফিরতে এত দেরি।

সকলে দাদামশায়দের জিজ্ঞেস করলে—একজিবিশনে কি দেখলে?

মেজদাদামশায় বললেন—এবার থেকে বিলিতী জিনিস না, কিনলেও চলবে। সব কিছুই দেশে তৈরি হচ্ছে দেখে এলুম।

দাদামশায় বললেন—দেখলুম আগুনের বেড়াজাল। সাপের মত কিলবিল করছে দমকলের নলগুলো আর তাদের মুখগুলো ফুঁসছে। আঁকবার মতো।

আর বড়দাদামশায় বললেন—কোনো নতুন জিনিস দেখতে পেলুম না। গান্ধী এখন চরকা আর খাদি নিয়েই ব্যস্ত—নতুন জিনিস করবে কে?

আমরা হতাশ হয়ে বললুম—কিচ্ছু নতুন পেলে না?

বড়দাদা আর দাদামশায় এক সঙ্গে বলে উঠলেন—পেয়েছি, এই দেখ।

বলে জোব্বার গভীর পকেট থেকে দু-জনে টেনে বার করলেন দু-টুকরো ভাঙা কাঁচ। পুরু কাঁচের চাদর এমন করে ভেঙেছে যে দেখে মনে হয় এক একটি কাগজ-চাপা। কাঁচের ভিতরটা ভেঙে চৌচির হয়ে রয়েছে—অতি বিচিত্র কারুকার্য তার। আগুনের হলকায় কোনো বড় দোকানের প্লেট গ্লাসের জানালা যখন তেতে আগুন হয়ে উঠেছে, সেই সময় হয়তো দমকলের নলের ঠাণ্ডা জল এসে পড়েছিল। তাইতে অমনি করে ফেটে ছড়িয়ে পড়েছিল কাঁচগুলো। সারা প্রদর্শনীতে আর কিছু নতুন না পেয়ে তাই কুড়িয়ে নিয়ে এসেছেন দাদামশায়রা।

রাত্রে ভালো বুঝতে পারিনি, সকাল বেলার আলোতে কাঁচের টুকরো দুটি দেখে আমরা অবাক। তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখার জড়াজড়ি আর তারই ফাঁকে ফাঁকে সবুজে আর নীলে মিশে নানান অদ্ভুত রং খেলে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা জিনিস কুড়িয়ে এনেছেন দাদামশায়রা পোড়া একজিবিশন থেকে। দাদামশার কাঁচটা তাঁর ডেস্ক-এর মধ্যেকার গোল কাঠের বাক্সের মধ্যে টুকি-টাকি নানা সংগৃহীত জিনিসের জঙ্গলে মিলিয়ে গেল। আর বড়দাদা সকালের আলোয় নিজের চৌকিতে বসে কাঁচটা ঘুরিয়ে তার মধ্যেকার রঙ আর নানা রেখার কারিগরি দেখতে থাকলেন।

এই কাঁচটি নিয়ে কিছুদিন নাড়া-চাড়া করার পর বড়দাদা হঠাৎ একদিন মহা উৎসাহিত অবস্থায় বিকেল বেলা বাড়ি ফিরেই একটা ব্রাউন কাগজের মোড়ক খুলতে লাগলেন। কি ব্যাপার দেখবার জন্যে আমরা সবাই ঝুঁকে

পড়লুম। শুনলুম একটা রং দেখবার যন্ত্র কিনেছেন। জিনিসটা বিলিতী অবশ্য। কিন্তু বড়দাদা বোধ হয় ততদিনে ঠিকই করে ফেলেছেন যে স্বদেশীরা যখন কিছু তৈরি করতে পারলোই না তখন কিছু কিছু বিলিতী জিনিস কিনেই মজা পাওয়া যাক। ব্রাউন কাগজের মোড়ক খুলে বেরল জিনিসটা। সেটি ছোট মাইক্রোস্‌কোপের মত একটা যন্ত্র। এক দিকে চোখ লাগিয়ে অন্য দিকে টুকরো কাঁচ বা স্বচ্ছ পাথর রাখলে নানা রকম রং দেখা যায়। ভাঙা কাঁচ, পাথর অনেক কিছু যোগাড় হল। আমরা সবাই চোখ দিয়ে দেখলুম। সবুজ, বেগুনী, হলদে, নীল, লাল নানা রং ঐ ভাঙা টুকরোগুলো থেকে দিকে দিদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। যেন একটা রংএর ফোয়ারা। একটু ঘুরিয়ে দিলেই রংএর হেরফের হয়ে একটা নতুন সমবায় ও গঠনের সৃষ্টি হয়। নতুন রকমের রংএর ঢেউ উঠতে থাকে ভারি মজার ব্যাপার। যন্ত্রটা যে কি, কোথা থেকে বড়দাদা কিনে এনেছিলেন এ বিষয়ে আজও আমার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। সেটা আলোক রশ্মি বিশ্লেষণের কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, না শুধু একটা খেলনা বলতে পারি না। তবে এটা জানি যে বড়দাদা সেটাকে খেলনার মতোই ব্যবহার করতেন। ঐ নিয়ে বসে থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানারকম রংএর খেলা দেখতেন আর থেকে থেকে আমাদের ডেকে দেখাতেন। লোকে থিয়েটার দেখে, বায়োস্কোপ দেখে, নাচ দেখে, একজিবিশনে গিয়ে ছবি দেখে, পাথরে-কাটা মূর্তি দেখে, বড়দাদা রং দেখতেন।

অনেকেই জানেন না এই হচ্ছে বড়দাদামশার কিউবিজ্‌ম্‌ ছবি আঁকার প্রথম ইতিহাস। এই যন্ত্রের ভিতর দিয়ে রং আর রেখার কাটাকুটি দেখতে দেখতে বড়দাদার কিউবিজ্‌ম্‌এর ছবির প্রেরণা জাগে। প্রথম প্রথম যেসব ছবি এঁকে আমাদের দেখান সেগুলি দেখেই আমরা বলে উঠেছিলুম—আরে এ তো ঐ নলের মধ্যে দেখেছি। বড়দাদার কিউবিজ্‌ম্‌ স্টাইলে আঁকা বহু নাম-করা ছবি আছে। তার মধ্যে দু-একটি বিখ্যাত ছবি যেমন, 'দুই আলোক-পরীর নৃত্য' এ একেবারে ঐ কাঁচের পরকলার মধ্যে দিয়ে যা দেখেছিলেন হুবহু তাই আঁকা।

নতুন নতুন খেলনার শখ বড়দাদার বরাবর ছিল। বড়দাদার ছবি আঁকাটা-ও অনেকাংশে তাই। রং তুলি আর কাগজ নিয়ে খেলা। খেলার মতই তিনি ছবি আঁকতেন। পছন্দ না হলে ছিঁড়ে ফেলে আবার আঁকতেন। বড়দাদার টুকরো কাগজের ঝুড়ি প্রায়ই ছেঁড়া ছবিতে ভর্তি হয়ে উঠত। সেই ঝুড়ি হাতড়ে আমরা কত সময় টুকরো বেছে ধারগুলো কেটে নিয়ে ভালো ভালো ছবি পেয়ে গেছি।

॥ ১৩ ॥

আমাদের বাগানের পুবদিকের যে অংশটাকে আমরা বড়-বাগান বলতুম, সেখানে বর্ষার সময় আমরা খেলতুম ফুটবল। ঐ ছিল আমাদের খেলার মাঠ। মাঠের দুই প্রান্তে বাঁশ দিয়ে দুটো গোলপোস্ট পোঁতা হত আর যোগাড় করা হত একখানা চামড়ার ফুটবল। এই হলেই আমাদের খেলা শুরু হয়ে যেত। বল এবং গোল-পোস্ট থাকলেও দু-পক্ষের দুটি পুরো টীম যোগাড় করা প্রায়ই শক্ত হয়ে পড়ত আমাদের পক্ষে। এক একদিকে ছ-জন সাত-জন করে খেলবে এতগুলি আমাদের বয়সী ছেলে ছিল না। যেদিন যে-কজন জুটে যেত তাই নিয়েই আমরা খেলায় মাতত্তুম।

সে বছর বর্ষার শেষের দিকে বৃষ্টির পর বৃষ্টিতে আমাদের বড়-বাগান ভিজে সপ্-সপ্ করছে আর আমরা জল-কাদার মধ্যে প্রচুর উৎসাহে ফুটবল ঠেঙাচ্ছি, সেই সময় হঠাৎ একদল আমাদেরই বয়সী ছেলে এসে বললে—আমরা ম্যাচ খেলতে এলুম।

কে যে এরা বুঝতেই পারলুম না। দেখিনি কখনও। এ-পাড়া ও-পাড়ায় দু-চারটে ফুটবলের ক্লাব ছিল, তাদের কারো-কারো সঙ্গে আমরা কখনো কখনো ম্যাচও খেলেছি, ভাবলুম তাদেরই হয়তো কেউ অথবা পাড়ার নতুন কোনো ক্লাবের ছেলেরা হঠাৎ এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু তার পরেই আমাদের ভুল ভাঙল। এরা বললে যে এরা শান্তিনিকেতন থেকে

এসেছে। তখন বুঝলুম, শান্তিনিকেতন থেকে শারদোৎসব করবার জন্যে যে অভিনয়ের দল এসে পৌঁচেছে জোড়াসাঁকোয়, এরা তারা। তাই যদি হয়, তাহলে এদের বিপক্ষে রেখে খেলার কোনো মানে হয় না। কাজেই আমরা তাদের দু দলে ভাগ করে নিয়ে আমাদের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে সেই কাদা আর জলের মধ্যে মহা আনন্দে বল ঠেঙাতে লাগলুম। খেলার মাঠে অনেকগুলি ছেলে হওয়ায় মাঠ ভরে উঠল, খেলাও তেমনি জমে উঠল। এমনই জমে উঠল যে আমরাও যেমন ভুলে গেলুম, ওদের দলের ওরাও ভুলে গেল ওদের রিহার্সালের কথা। সন্ধ্যা হলেই যে কত্তাবাবার সামনে দাঁড়িয়ে রিহার্সাল দিতে হবে একথা কারুর মনে রইল না।

তাই সন্ধের মুখে যখন হঠাৎ খবর এসে পৌঁছল যে কত্তাবাবা আমাদের পাঁচ নম্বর বাড়ির লাইব্রেরী ঘরে চলে এসেছেন, ঐখানেই রিহার্সাল হবে, তখন দেখা গেল শান্তিনিকেতনের ছেলের দল কাদা-টাদা মেখে এমনই ভূত সেজে বসেছে যে সে অবস্থায় রিহার্সাল দিতে যাওয়া যায় না। এদিকে কত্তাবাবা এসে বসে রয়েছেন। শুধু কত্তাবাবা নন, বড়দাদামশায় আছেন, মেজদাদামশায় আছেন, দাদামশায় আছেন। আরো অনেকে এসেছেন। এঁদের সামনে এই ভাবে কি করে যাওয়া যায়? অথচ স্নান করে ফর্সা কাপড় পরে যে যাবে, তারও সময় নেই—দেরি করে রিহার্সালে এলে যে-ভাষায় কত্তাবাবা বকুনি দেবেন তা হঠাৎ শুনতে বকুনির মতো না হলেও একটু পরেই যে কী ভয়ানক লজ্জা করতে থাকবে তা সকলেরই জানা। মহা মুশকিলে পড়ল শান্তিনিকেতনের ছেলেরা।

তারক বললে—দেরি করে গিয়ে লজ্জা পাওয়ার চেয়ে ময়লা মেখে বকুনি খাওয়াই ভাল। আর কাপড়ে লাগা কাদা যদি কারু চেখে না পড়ে তাহলে তো বেঁচেই গেলুম।

আমরা বললুম—সে সম্ভাবনা কম। লাইব্রেরী ঘরে যে-রকম আলো সবার চোখে পড়ে যাবে।

যাই হোক, আর কোনো উপায় ছিল না। শান্তি, তারক, মার্কণ্ডী, নির্মল এরা সব আমাদের ফোয়ারার জলে হাত-পা-মুখ ধুয়ে যতটা সাফ-সুতরো

হতে পারে তার চেষ্টা করতে লাগল চটপট। গোলাপ গোলে খেলছিল বলে তার কাদাটাদা লাগে নি—সে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। এদিকে ছেলেদের দেরি দেখে আর তারা ফুটবল খেলছে খবর পেয়ে দাদামশায় লাইব্রেরী ঘরের দক্ষিণে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। দেখেন নীচে সবাই গোলবাগানের ফোয়ারার জলে হাত-পা ধুচ্ছে।

—উঠে আয় তোরা, রবিকা, দিনু সবাই এসে পড়েছেন।

ছেলেরা দেখল ধরা পড়ে গেছে। আর কোনো উপায় নেই। তারা একে একে আমাদের কাঠের গোল সিঁড়ি দিয়ে দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় উঠে এল। সেখানে দাদামশায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ছেলেরা ঘরে ঢুকতে ইতস্তত করছে দেখে দাদামশায় বললেন—কি রে তোদের হল কি?

একটি ছেলে ভয়ে ভয়ে তার কাপড়ের অবস্থা দেখাল।

দাদামশায় হেসে বললেন—ওরে, তোরা থিয়েটারে নামবি, কেমন করে সাজতে হয় জানিস্ নে? ধুতিটা আরেক রকম করে পরে ফেল? এই দেখ। বলে এদিকের কোঁচা ও-দিকে দিয়ে এমন উল্টো-পাল্টা করে ধুতি পরিয়ে দিলেন যে কাদা-টাদা সব ঢাকা তো পড়েই গেল বরং নতুন ধরনের একটা ধুতি পরার কায়দা শিখে নিলে ছেলেরা, যেটা স্টেজে বেশ মানাবে। অন্য ছেলেরাও দেখাদেখি যে-যার কাদার দাগ ঢেকে ফেলল। তারপর তারা একে একে সবাই লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে দিনু-মামার পাশে বসে পড়ল।

আরম্ভ হয়ে গেল রিহার্সাল আর গান। দিনুমামা সেজেছিলেন ঠাকুরদাদা। কত্তাবাবা সন্ন্যাসী। জগদানন্দবাবু লক্ষেশ্বর। নীতু উপানন্দ। দাদামশায়দের সামনে রিহার্সাল দেওয়া কত্তাবাবার বরাবরের প্রথা। দাদামশায়রা মন্তব্য করতেন, কত্তাবাবা শুনতেন, বদলাতেন। কত সময় দাদামশায়দেরই হাতে অভিনয় শিক্ষা দেবার ভার ছেড়ে দিতেন। একবার শাপমোচন কি অরূপরতন ঠিক মনে নেই, কিসের একটা রিহার্সালে অরুদা বসে বসে তালিম দেখছিলেন। প্রহরীর একটা চরিত্র ছিল। কিন্তু প্রহরী যিনি সেজেছিলেন তাঁর হাঁটার ধরন কত্তাবাবা বা কারুরই পছন্দ হচ্ছিল না। অরুদা বললেন—দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। অরুদা নিজে মস্ত অভিনেতা ছিলেন,

তাছাড়া তাঁর একটা নিজস্ব ধরনে লাঠির সঙ্গে পা ঠুকে ঠুকে হাঁটার অভ্যেস ছিল। সেইভাবে দেখিয়ে দিতেই কত্তাবাবা বললেন—এই তো ঠিক হয়েছে। অরুদার হাঁটার নমুনা সেবার এইভাবে কত্তাবাবার প্লে-র মধ্যে গৃহীত হয়েছিল। অরুদাকে ঐভাবে আমরা বহুদিন হাঁটতে দেখেছি। আমাদের ফুটবল মাঠের শেষ থেকে ও-পাশের চাঁপা গাছ পর্যন্ত লাঠির সঙ্গে পা ঠুকে ঠুকে নিয়মিত হাঁটতেন। ঘাস উঠে সেখানে একটা রাস্তাই হয়ে গিয়েছিল।

এবারে শারদোৎসবের রিহার্সাল আমাদের বাড়িতে আরম্ভ হবার পর কত্তাবাবার ইচ্ছে হল বড়দাদামশায়কে থিয়েটারে নামাবেন। বড়দাদামশায় রাজার পার্ট করতেন, ঐ পার্ট-এই তাঁকে সবচেয়ে ভালো মানাতো। আর মেজদাদামশায় সাজতেন মন্ত্রী। শারদোৎসবে একজন রাজা আছেন বটে, কিন্তু তিনি ছোটখাট সামান্য একটি রাজা—ওতে বড়দাদামশায়কে মানাবে না। শারদোৎসবের আসল যিনি রাজচক্রবর্তী তিনি তো সন্ন্যাসীর বেশে অবতীর্ণ—কত্তাবাবাই সে পার্ট করছেন। কাজেই একজন সত্যিকারের রাজা আর সত্যিকারের মন্ত্রীর পার্ট লিখে শারদোৎসবের সঙ্গে জুড়ে দিলেন কত্তাবাবা। বড়দাদামশায় সাজলেন রাজা, মেজদাদামশায় মন্ত্রী। এইভাবে শারদোৎসব দাঁড়ালো গিয়ে ঋণশোধ-এ। সেবার এইভাবে বদল-টদল করে ঋণশোধ নামেই অভিনয়টি হয়েছিল।

রিহার্সালে সেদিন সন্ধ্যায় ছেলেরা লাফালো, ঝাঁপালো, গান গাইলো, কেউ বুঝতেই পারলেন না যে তারা কাদা-মাখা কাপড়ে রিহার্সাল দিতে এসেছে। শুধু দিনুমামা একবার বললেন—তারক বেশ কায়দা করে ধুতিটা পরেছিস্ তো। বেশ দেখাচ্ছে—ঐ রকম করেই স্টেজে নামিস্। এই ঘটনায় শান্তিনিকেতনের ছেলেদের সঙ্গে দাদামশার বেশ ভাব হয়ে গেল। রিহার্সাল সেরে স্নান করে রাত্রের খাওয়া শেষ করে দুটি ছেলে ও-বাড়ি থেকে আমাদের বাড়িতে দাদামশার কাছে এসে হাজির। একজন বললে—গল্প শুনব, আর একজন বললে—ছবি দেখব।

দাদামশায় বললেন—বটে? ইস্কুল পালানো হয়েছে? নিশ্চয় তোরা

পালিয়ে এসেছিস্ মাস্টারকে না বলে! এই রাত্তিরে তোদের গল্প বলে আমি শেষকালে রবিকার কাছে বকুনি খাই আর কি!

তারা স্বীকার করল, আর সব ছেলে মশারিতে ঢোকবার পর তারা চুপিসাড়ে পালিয়েই এসেছে। দাদামশায় বললেন—যা আজ রাত হয়েছে। সারাদিন খাটুনি গেছে তোদের, এখন জিরো গে। কাল ভোরে চলে আসিস্—গল্প বলব।

তার পরদিন খুব ভোরে তারা আসতে দাদামশায় তাদের গল্প-ও শোনালেন, ছবি-ও এঁকে দিলেন। এমনি করে বেশ জমে উঠল গুটিকতক শান্তিনিকেতনের ছেলের সঙ্গে দাদামশার। এর আগে শান্তিনিকেতন থেকে ছেলেমেয়েরা যতবারই এসেছে, তারা এসেছে মাঘোৎসবের গান গাইতে একদিনের জন্যে। এমনভাবে একটানা বহুদিন ধরে কখনও থাকেনি। আমাদের বাড়ির সঙ্গে এত আলাপ-ও তাই এর আগে কখনও হয়নি। বড়দাদা মেজদাদা তাদের সঙ্গে অভিনয়ে নেমেছেন; ছেলেদের ইচ্ছে দাদামশায়-ও কোনো একটা পার্ট নিয়ে নামুন। কিন্তু রিহার্সাল ততদিনে বেশ এগিয়ে গেছে—দাদামশার জন্যে নতুন কোনো পার্ট করা সম্ভব হল না। দাদামশার একটা বাঁকা লাঠি ছিল। ঘোরানো পেঁচানো সে যে কি-রকম আঁকা-বাঁকা লাঠি না দেখলে বোঝা যেত না। কোথা থেকে যোগাড় করেছিলেন জানি না। জিজ্ঞেস করলে বলতেন—গাসীর বাড়ি থেকে পাওয়া ভূতপত্রীর লাঠি। লাঠিটা ছিল যেমন তেড়া-বাঁকা তেমনি শক্ত আর মজবুত। সেই লাঠিটা তিনি জগদানন্দবাবুকে দিলেন লক্ষেশ্বরের পার্ট-এ ব্যবহার করবার জন্যে। ছেলেদের বললেন—এবারে ঐ লাঠির মধ্যে দিয়েই আমি প্লে করব। লক্ষেশ্বরের হাতে সে লাঠি যা মানিয়েছিল, যারা দেখেছে তারাই জানে। তবে শেষ পর্যন্ত শুধু দাদামশার লাঠি নয় দাদামশায়কে নিজেকেও নামতে হয়েছিল শারদোৎসবের অভিনয়ে।

আমাদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল এই সব ছেলেদের। আমরা দলে ভাগ হয়ে ফুটবল ম্যাচ খেলতুম, দোলনায় দুলতুম, গান গাইতুম, ছুটোছুটি করতুম আর সন্ধেবেলায় রিহার্সালের পরে ও-বাড়িতে চলে যেতুম

গল্প করতে। এমনিভাবে রিহার্সাল চলতে চলতে শেষে অভিনয়ের দিন এসে উপস্থিত হল। সব ঠিক, হঠাৎ শান্তিনিকেতন থেকে এক টেলিগ্রাম এসে হাজির, দীপুদার খুব অসুখ, দিনুমামার এখনি সেখানে যাওয়া দরকার। দ্বারকানাথের বড়ছেলে দেবেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথের বড়ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ। তাঁর বড়ছেলে দীপেন্দ্রনাথ। তাঁর বড় ছেলে দিনেন্দ্রনাথ। দ-বর্ণের এই জ্যেষ্ঠপুত্রানুক্রম এই পাঁচ-পুরুষ ধরে চলে এসেছে। দ্বারকানাথের বংশের চতুর্থ দীপ দীপেন্দ্রনাথ প্রায় অস্তমান, কাজেই দিনুমামার না গেলে চলে না। এদিকে তিনি ঠাকুরদা সেজেছেন—সন্ন্যাসীর পরেই প্রধান পার্ট ঠাকুরদাদার —শারদোৎসব অভিনয় বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা। টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে, স্টেজ বাঁধা হয়ে গেছে, এমন বিপদে কত্তাবাবা কখনও পড়েন নি।

দিনুমামা চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে। টেলিগ্রামে খবর এল দীপুদা মারা গেছেন, দিনুমামা আর অভিনয় করতে পারবেন না। কত্তাবাবা দাদামশায়দের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন, কি করা যায়? সবাই ভারি মন-মরা— একে আত্মীয়-বিচ্ছেদ, তার উপর এতদূর এগিয়ে থিয়েটারও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বালকের দলের আনন্দ সব মাটি—ফুটবল পর্যন্ত খেলতে কেউ এল না। পরামর্শ চলতে লাগল, এবং শেষে শোনা গেল শারদোৎসব বন্ধ হবে না, দাদামশায় ঠাকুরদার পার্ট-এ নামছেন।

একদিন মাত্র সময়।

দাদামশায় বললেন—রবিকা, পার্ট মুখস্থ করতে পারব না। যা মুখে আসবে বলে যাবো।

কত্তাবাবার তা নিয়ে কোনো ভাবনা ছিল না। দাদামশার হাতে ঠাকুরদাদার পার্ট দিয়ে একেবারেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। বালকের দল ঠাকুরদাদাকে হারিয়ে ছিল; তারা মনের মত আরেক জন নতুন ঠাকুরদাদা পেয়ে আর অভিনয় বন্ধ হবে না জেনে আনন্দে নেচে উঠল।

দাদামশায় প্রমথ বিশীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ছিলেন প্রম্প্‌টার। তাঁকে ডেকে বললেন—প্রম্প্‌টারকে স্টেজে নামতে হবে, বুঝেছ হে?

প্রমথবাবুকে মুখোশ পরিয়ে স্টেজে ছেড়ে দেওয়া হল। লাঠির আগায়

রঙিন কাগজে মোড়া শারদোৎসবের খাতা নিয়ে তিনি মুখের কথা সরবরাহ করতে থাকলেন। দাদামশায় বিনা-মুখস্থয়, খানিকটা প্রমথ বিশীর সাহায্যে আর বাকিটা নিজের সৃজনীশক্তিতে ঠাকুরদাদার পার্ট বলে গেলেন বালকের দলের সঙ্গে তাল রেখে।

বালকের দল, প্রথম দৃশ্যে—মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি—গান শেষ করলে যখন লক্ষেশ্বর তাদের তাড়া করবে, সেই সময় ঠাকুরদাদা—কি হয়েছে লখাদাদা! মার-মূর্তি কেন?—এই বলে প্রবেশ করবেন, বইএতে এই রকম আছে। কিন্তু আমাদের বেশ মনে আছে, দাদামশায় ঐ সমস্ত কথা বাদ দিয়ে—ছুটি, ছুটি, ওরে ছুটি—বলতে বলতে এমন ভাবে স্টেজ মাতিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন যে ছেলের দল ভারি খুসী হয়ে উঠেছিল। তাদের আর কিছু বলতে হয়নি--দাদামশার সঙ্গে তারা-ও মেতে উঠেছিল।

শারদোৎসব ভারি জমেছিল সেবার। দিনুমামার হঠাৎ অনুপস্থিতিতে সেবার সবই পণ্ড হবার কথা। দিনুমামার মতো গানের গলা কারুর ছিল না —সেদিক দিয়ে খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল শারদোৎসবের গান। কিন্তু অভিনয়-কুশলী দিনুমামার অভাব দাদামশায় ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। কোনো রিহার্সাল না দিয়েই, পার্ট মুখস্থ না করেই সেবার দাদামশায় কত্তাবাবাকে সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

শারদোৎসবের কথা যখন ভাবি তখন মনে হয়, শারদোৎসব কি স্টেজে হয়েছিল? শারদোৎসব হয়েছিল সারা জোড়াসাঁকো বাড়ি ঘিরে, তার প্রতি অলিতে-গলিতে, বারান্দায় ছাদে, বাগানের ভিজে ঘাসে, নারকেল গাছের ঝিলমিলে পাতায় আর আমাদের মনে। ভাদ্রমাসের বৃষ্টি-ধোওয়া দিনে শুরু হয়েছিল আমাদের উৎসব, শেষ হয়েছিল আশ্বিনের রূপোলী জ্যোৎস্না-ভরা সন্ধ্যায়। উৎসব যখন শেষ হয়ে এল, সকলেরই যখন মন খারাপ, সেই সময় খবর পেলুম অভিনয়ের দল ফিরে যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের বালকদের জন্যে সিনেমা দেখাবার বন্দোবস্ত হয়েছে। শুনলুম আমরাও দেখতে পাব। তখনকার দিনে সিনেমা দেখতে পাওয়া

একটা মস্ত সৌভাগ্য, তা সে যেমন ছবি-ই হোক। কালেভদ্রে এক-আধটা ছবি দেখবার সুযোগ ঘটত যে-কোন বালকেরই।

আমাদেরই বিলিয়ার্ড ঘরে, ঘর অন্ধকার করে সাদা পর্দা টাঙিয়ে ছবি দেখানো হল। ছেলেরা আমরা সবাই তো দেখলুম-ই, দাদামশারাও সবাই দেখলেন। প্রথমে দেখলুম কত্তাবাবার ছবি—তিনি ইংলণ্ড থেকে এরোপ্লেনে চড়ে প্যারিসে যাচ্ছেন।

সেই বোধহয় তাঁর প্রথম এরোপ্লেনে চড়া—সে এক সাংঘাতিক উত্তেজনা-পূর্ণ ব্যাপার। তারপর হল ধ্রুব-চরিত্র।

এই সিনেমা দেখবার পর বড়দাদামশায় আঁকলেন কত্তাবাবার এক ব্যঙ্গ-চিত্র। এই বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রে কবি তাঁর চেয়ারে বসে আকাশে উড়ছেন আর তাঁর কাব্যগ্রন্থাদি উড়ে চলেছে তাঁর সঙ্গে। নাম দিয়েছিলেন—কবির আকাশ-বিহার। এই ছবি বড়দাদামশার 'নব হুল্লোড়' চিত্রগ্রন্থে ছাপা হয়। ছবি আঁকা শেষ হয়ে গেছে, বড়দাদামশায় ছবি কোলে বসে, এমন সময় আমাদের দক্ষিণের বারান্দায় ও-বাড়ির গোপাল সরকার কি কাজে এসে হাজির। গোপালবাবু ছয় নং বাড়ির সরকারবাবু ছিলেন। তিনি মাঘোৎ-সবের সময় নিমন্ত্রণপত্র বিলি করতেন। কখনও কাউকে একটির বেশী টিকিট দিতেন না। সব সময় দেখা যেত তাঁর বাক্সে একটি টিকিট আছে, তার বেশী নেই। যে-ই আসত দু-খানা তিনখানা কি চারখানা টিকিট চাইতে তাকেই বাক্সখানা দেখিয়ে বলতেন এই একটিমাত্র টিকিট আমার বাকি আছে—আর নেই। বলে সেইটি দিয়ে দিতেন। কাউকে কোনোদিন শুধু-হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। সেই গোপালবাবুকে কত্তাবাবুর ছবি দেখিয়ে বড়দাদামশায় বললেন—দেখ তো গোপাল, ছবিটা কেমন?

গোপালবাবু হাত জোড় করে বিনয়ে গলে পড়ে বললেন—আজ্ঞে?

বড়দাদামশায় বললেন—চিনতে পারছ?

—আজ্ঞে পারছি!

—কে বল দেখি?

গোপালবাবু যুক্ত-কর হয়ে দাঁড়িয়ে বড়ই ইতস্ততঃ করতে থাকলেন।

বড়দাদামশায় সাহস দিয়ে বললেন—বল না গোপাল! বলেই ফেল।

গোপালবাবু ঘাড় কাত করে একটু লজ্জিত ভাবে হেসে বললেন—আজ্ঞে বাবুমশায় উড়ছেন!

গোপালবাবুর ঐ উক্তি জোড়াসাঁকো বাড়িতে বহুদিন মুখে মুখে চলেছিল।

॥ ১৪ ॥

কত্তাবাবা মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকোয় অভিনয়ের আয়োজনে মাতিয়ে তুলতেন সবাইকে। শান্তিনিকেতনের দল যখন তৈরি হয়নি তখন যা-কিছু করত কলকাতার দল। কলকাতায় এসে কত্তাবাবাকে দল সংগ্রহ করতে হত। দাদামশায়দের টানতেন, অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুরা এসে যোগ দিতেন, শান্তিনিকেতনেরও কেউ কেউ আসতেন। এই ভাবে দল গড়ে উঠত। জোড়াসাঁকো হত জম-জমাট। রূপই বদলে যেত এ-বাড়ির ও-বাড়ির। লেখা-পড়া প্রায় হতই না আমাদের। খেলাও বন্ধ হয়ে আসত।

রিহার্সাল আরম্ভ হলে আমরা লক্ষ্য করতুম যে আমাদের ছোটদের মধ্যে থেকে একমাত্র খুকীমাসী ছাড়া আর কারুর কত্তাবাবার দলে ঢোকবার ডাক আসত না। খুকীমাসী 'ডাকঘর'-এ মালিনীর পার্ট করে একসময় খুব নাম করেছিল। সেই থেকে তার কদর। বাকিদের করবার মতো পার্ট তাঁর নাট্যে থাকত না। কিংবা এমনও হতে পারে যে আমাদের কাউকে তিনি উপযুক্তই মনে করতেন না। এর ফলে আমরা চিরকাল দর্শকের কোঠায় পড়ে থাকতুম। অবশ্য দিনের পর দিন প্রতি সন্ধ্যায় রিহার্সাল দেখে ভারি আমোদ পেতুম—পার্ট সব মুখস্থ হয়ে যেত—কত্তাবাবার শেখানো ঢংগুলো পর্যন্ত। আর তার ফলে যতদিন তালিম শুনতুম ততদিন অভিনয় করতে না পারার কোনো দুঃখ আমাদের মনকে স্পর্শ করত না। কিন্তু অভিনয় সাঙ্গ হয়ে গেলে দল ভেঙে যে-যাঁর পথে চলে গেলে, কত্তাবাবা শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলে আমাদেরও থিয়েটার করবার শখ জাগতো মনে।

বোধ হয় এই জন্যেই আমরা সেবার ঠিক করলুম পরের মুখ চেয়ে না থেকে আমরা নিজেরাই একটা কিছু করব। ভাগ্যিস করেছিলুম, না হলে জানতেই পারতুম না কোনোদিন যে আমাদের মধ্যেই যে-সব অভিনয়-কুশলী চাপা পড়ে ছিলেন, যেমন কোকোমামা, কালুমামা, শোভনলাল বা সুজন তাঁরা কেউই কত্তাবাবার দলের নামকরা অভিনেতাদের চেয়ে কম নন। এঁদের মধ্যে শোভনলাল তো পরবর্তী জীবনে সুদক্ষ অভিনেতা হিসেবে রীতিমত নাম করে ফেলেছেন। খুঁজে-পেতে দাদামশার লেখা একখানা নাটিকা বার করা গেল—ভারতীতে বেরিয়েছিল কিছুদিন আগে—নাম, এস্‌পার ওস্‌পার !

পার্ট বিলি আর রিহার্স্যাল শুরু হয়ে গেল। নাট্যের মধ্যে কিছু গান ছিল। প্রশান্ত রায়কে ধরে পড়লুম গানের ভারটা নিতে। কারণ তিনি ছাড়া হার্মোনিয়াম কে-ই বা বাজাবে ? প্রশান্তবাবু হার্মোনিয়ামে টুং টাং করে গানগুলোতে সুর দেবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। আর আমরা বই হাতে নিয়ে কার পক্ষে কোন্ পার্ট মানাবে পড়ে পড়ে দেখতে থাকলুম। এই সব ব্যাপার আমাদের চলতো একতলায়। দোতলার বারান্দায় থাকতেন দাদামশায়। কেমন করে জানি না, তিনি টের পেয়ে গেলেন আমরা রিহার্স্যাল দিচ্ছি। হঠাৎ একদিন সকালে নীচে নেমে আমাদের মধ্যে এসে হাজির।

বললেন—কিসের রিহার্স্যাল ?

—এস্‌পার ওস্‌পার।

দেখালুম ভারতী থেকে নকল করে নিয়েছি খাতায়। খাতাটা দিলুম দাদামশার হাতে। উল্টেপাল্টে দেখে বললেন—এটা লিখেছিলুম বটে মনে পড়েছে। বেছেছিস্ ভালো। কিন্তু এটা তো যাত্রা। রবি-কার প্লে-র মতো নয়। যাক্ চালিয়ে যা। দেখা যাক্ কি দাঁড়ায়।

আমরা উৎসাহ পেয়ে গেলুম।

প্রশান্তবাবুকে গানের সুর বেঁধে দেবার ভার দেওয়া তো হয়েইছিল, তা ছাড়া তিনি ছবি-টবি আঁকতেন বলে তাঁকে পার্ট দেওয়া হয়েছিল চিত্রকরের। দাদামশায় যখন এলেন তখন পার্ট চলেছে—

চিত্রকর বলছেন—আমি চিত্রকর তা জানো না বুঝি? আমাকে খুশী করা সহজ নয়। আমি বাজাতে পারি, নাচতে পারি, গাইতে পারি। এমন যে বনের হরিণ, গাছের পাখি, নদীর জল, আকাশের চাঁদ, সূর্য, তারা, আলো, অন্ধকার সব চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে থাকে আমার সামনে।

প্রশান্তবাবু ছবি আঁকতেন, আর্টিস্ট ছিলেন, কিন্তু লোকটি ছিলেন ভারি আমুদে। তাঁর মুখে ঐ সব গম্ভীর গম্ভীর কথা কেমন যেন লাগত। দাদামশায় শুনে বললেন—তোর কথাগুলো সব বদলে দিতে হবে। তোর মুখ দিয়ে চিত্রার্পিতবৎ বেরচ্ছেই না। দেখি আর কে কি করছে? বলে যা একে একে।

সমস্তটা শুনলেন। তারপর খাতাটা বগলে করে নিয়ে চলে গেলেন স্নানে।

আমরা বললুম—ভালই হল। দাদামশায় যখন হাত দিয়েছেন, উতরে যাবে।

সারা দুপুর খাতা নিয়ে কাটাকুটি চললো। বিকেল বেলায় আমাকে খাতাটা দিয়ে বললেন—নে কপি করে ফেল।

দেখলুম প্রচুর কেটেছেন। প্রশান্তবাবুর জন্যে একটা পার্ট লিখেছেন ব্যাণ্ডমাস্টারের। দাদামশায় বললেন—নাটুকে ভাবটা উড়িয়ে দিলুম। খাঁটি যাত্রার ছাঁচে ঢেলে দিয়েছি এবার। দেখিস কেমন হয়। চালা রিহার্সাল। মুখস্থ করে ফেল ভাল করে। তারপর এসে একদিন দেখব।

আমি খুব তাড়াতাড়ি নকল করতে পারতুম। সন্ধ্যার মধ্যে কপি করে ফেললুম সমস্ত লেখাটা। সবাইকে পড়ে শোনালুম। দেখা গেল আগে যারা কিছু মুখস্থ করেছিল তাদের আবার নতুন করে শিখতে হবে পার্টগুলো।

ভেবেছিলুম দাদামশায় হয়তো কয়েকদিন পরেই আসবেন, কিন্তু তর সইলো না। পরদিনই এসে উপস্থিত আমাদের আড্ডায়। খুব জমলো সেদিন রিহার্সাল। ব্যাণ্ড মাস্টার হয়ে প্রশান্তবাবু বেশ সহজ হয়ে গেলেন। কুমুদ পাল এসেছিল সেদিন—বসে বসে দেখছিল রিহার্সাল। দাদামশায়

বললেন—বসে থাকবি কেন? করে দেব তোর জন্যে একখানা পার্ট। পুলিসম্যান সাজবি?

সঙ্গে সঙ্গে গান তৈরি হয়ে গেল—

মন আমার—
হাকিম হতে পারো এবার।
মন যদি হও হাকিম
আমি হই চাপরাসী।
চাপরাসি ব্রজবাসী।

কুমুদ পাল ভারি খুশী মনে লেগে গেল যাত্রা করতে।

দাদামশায় বললেন—এ গানের সঙ্গে নাচতে হবে—পুলিসম্যানের নাচ।

আমার ঐ পরিষ্কার করে নকল-করা খাতায় সেদিন আবার কাটা-কুটি চললো। নতুন করে অনেক কিছু লিখলেন। আমি খাতার বাঁধন আলগা করে দিয়ে শোধরানো পতাকাগুলোকে নতুন করে নকল করে ফেললুম।

তার পরদিন চললো আবার রিহার্সাল।

কিন্তু দাদামশার শোধরানো থামলো না। আমারও নকল করা শেষ হল না। কত বদল কত যোগ-বিয়োগ যে হল তার ঠিক নেই। আমি তখন অগত্যা প্রম্পটারের পার্ট নিলুম, কারণ দেখলুম এমনি করে রোজ নতুন হলে কারুরই মুখস্থ হবে না। আমাকেই খাতা হাতে সকলের মুখে কথা যুগিয়ে যেতে হবে।

দাদামশায় বললেন—ক্ষতি কি? প্রম্পটারকে ঢুকিয়ে নেব যাত্রার মধ্যে। ঘুরে ঘুরে প্রম্পট্ করে যাবে।

কোকোমামা কি একটা পার্ট করছিল। সেটা বদলে হল রক্তমূর্তি। আরতি দীপালী এরা বসে বসে রিহার্সাল দেখত। দাদামহাশয় বললেন—রোস্ তোদের যাত্রার দলের সখী করে নিচ্ছি। বলে সখীর গান লিখতে বসে গেলেন। তারপর খানিক ভেবে বললেন—পুলিসম্যানের দুদিকে দুটো সখী নাচিয়ে দে।

তারপর গান নিয়ে পড়লেন। পালাটা যাত্রার মতো করে যখন বাঁধা

হয়ে গেছে তখন গানগুলোও বদলানো দরকার। সুরও দিতে হবে। প্রশান্তবাবু এতদিন সুর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। তিনি রেহাই পেলেন। প্রশান্তবাবু বসলেন হার্মোনিয়ামে আর দাদামশায় নিজের হাঁটুর উপর তাল দিয়ে দিয়ে শেখাতে লাগলেন নতুন সুর। কিছু কিছু গান কেটে দিয়ে নতুন গান লিখলেন। আর আরো সব দেহতত্ত্বের আর ফকিরের গান কোথা থেকে খুঁজে বার করলেন জানি না। নহুষের একখানা গান ছিল—

ভেসে যাক
কুল ছেড়ে কাজ ভুলে
খেয়া তরী আমারি—
ভেসে যাক
মনোতরী আমারি—

এর বদলে এলো—

আমি করবো এ রাখালী কতকাল ?
পালের ছয়টা গরু জুটে
করছে আমায় হাল বেহাল।
আমি সোজা পথে যদি যেতে চাই
তারা ঘুরে ফিরে বাঁকা পথে চলেছে সদাই।

আত্মারামের একটা গান পাওয়া গেল পুরোনো পুঁথি থেকে, সেটাও জুড়ে দিলেন—

প্রাণারাম আত্মারাম কোথায়
যারে শুধাই রে কাতরে
সেই ঘোরে ফিরে ঘোরায়।
কারে জিজ্ঞাসি ব্যথিত কে এমন
উপদেশ দানে প্রাণধনে মিলাবে আমায়।

আমরা কত্তাবাবার গানে রবীন্দ্র-সুরে অভ্যস্ত। আমাদের কানে একেবারে নতুন শোনাতে লাগল এ সব সুর। তারপর গানগুলো যখন

আমাদের সকলের গলায় সমস্বরে ধ্বনিত হতে থাকল তখন মনে হল একটা মস্ত কীর্তি করতে চলেছি আমরা।

—এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
বাসরে নাহিক দিয়া
রাজা আছে ভাই
রানী কাছে নাই
সখী গেছে পলাইয়া···

দৃশ্যপট কিছু নেই। ঘোর রজনীতে মেঘের ঘনঘটার দৃশ্য 'রাজার অসহায়তার দৃশ্য গানের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সেই রকম সুর হওয়া চাই। সেই রকম গাওয়া চাই।

একটা গানের সুর নিয়ে শেষটা ঠেকে গেলেন। ব্যাণ্ডমাস্টারের নাম হয়ছিল শেষ পর্যন্ত ব্যাং সাহেব। সাহেবের একটা ইংরেজী গান দরকার। গানটা হল—এ বি সি ডি দিয়ে আরম্ভ করে এক্স্ ওয়াই জেড্-এ গিয়ে শেষ। কিন্তু এই ইংরেজী বর্ণমালাকে ছন্দে আর সুরে বাঁধতে গিয়ে ভারি মুশকিলে পড়ে গেলেন। কিছুতেই আর বাগ মানে না। দু-তিন দিন ধরে চললো ধ্বস্তা-ধ্বস্তি। প্রশান্তবাবু হার্মোনিয়াম-এ বসে বসে ঘেমে গেলেন। একদিন সারা বিকাল চেষ্টা করে শেষটা ছেড়ে দিয়ে দাদামশায় স্নানে গেছেন। প্রশান্তবাবুও বাড়ি যাবেন বলে তাঁর মোটার বাইক্-এ স্টার্ট দিচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ দাদামশায় ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। গা ভিজে, লুঙ্গি হাঁটুর উপরে গোটানো সর্বাঙ্গ দিয়ে টস্‌টস্ করে জল গড়াচ্ছে। ভরা চৌবাচ্চায় নেমেছিলেন স্নান করতে। গা ডুবিয়ে মাথায় জল দিয়েছেন, এমন সময় সুরটা এসে গেল—

—ইউরেকা, ইউরেকা! বলে আর্কিমিডিস্-এর মতো স্নানের টব থেকে ছুটতে ছুটতে দাদামশায় এসে হাজির।

—শিখে নে এক্ষুনি নইলে ভুলে যাবো। বলে প্রশান্তবাবুকে হার্মোনিয়ামে বসিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে গেয়ে চললেন—

এ বি সি ডি ঈ এফ্ জী!
এইচ আই জে কে এলেমেনো পী!

কিউ আ রেস টি ইউউভী !

ডাবলু এক্স ওয়াই জেড্ এ বি সি !

—দেখলি তো, এ বি সি-টা শেষকালে জুড়ে দেওয়া দরকার। ঐটে হচ্ছিল না বলে যত গোল। মাথায় ঠাণ্ডা জল পড়াতে তবে এল সুরটা।

এদিকে পাতার পর পাতা যাত্রা প্রায়ই বদলে যাচ্ছে। আমি যদিও চটপট কপি করে ফেলছি কিন্তু দাদামশার সঙ্গে পেরে উঠছি না। যত কপি করছি, তত বদলাচ্ছেন। কেউ আর মুখস্থ করে উঠতে পারছে না। বেনেপুকুরের দিদিমা প্রত্যেক দিন টেলিফোন করে খবর নিতেন আজ যাত্রার রিহার্সাল হবে কি না। যাত্রার রিহার্সাল রোজই হত, একদিনও বাদ যেত না। বেনেপুকুরের দিদিমাও রোজই সন্ধেবেলা জোড়াসাঁকোয় চলে আসতেন। কিন্তু প্রত্যেকদিনই এসে দেখতেন নতুন পার্ট, নতুন গান। রোজই বদলে যাচ্ছে।

আমরা মুশকিলে পড়লুম। দাদামশার উৎসাহের অন্ত নেই। কিন্তু এই করে আমাদের যাত্রা কিছুতেই আর তৈরি হয়ে ওঠে না। রিহার্সালের শেষে খাতাটা চেয়ে নেন, ফিরিয়ে দেন যখন, অনেক কিছু বদলে গেছে ততক্ষণে। আমি বারবার পরিষ্কার করে নকল করি, দাদামশায় বারবার কেটে ছেঁটে নতুন করে দেন। তখন আমি ঠিক করলুম এইবার যাত্রার খাতাটা লুকিয়ে ফেলা দরকার। মুখস্থ যা হয়েছে হয়েছে। বাকিটা প্রম্প্‌টিং-এ চালাতে হবে। দাদামশায়কে গিয়ে বললুম—যাত্রার তারিখ আমরা ঠিক করে ফেলেছি। আর দেরি করা যায় না—পরশু হবে।

দাদামশায় শুনে বললেন—বেশ তো, দে তবে তাই লাগিয়ে। একটা ড্রেস্ রিহার্সাল দিয়ে ফেল।

ড্রেস রিহার্সালে আমরা সবাই সেজেগুজে নামলুম। র‍্যাং সাহেব প্যাণ্টালুন পরলেন, রক্তমূর্তি লাল গামছা বাঁধলেন মাথায়, হর্তাকর্তা কোটের উপর পাকানো চাদর ঝুলিয়ে দিলেন। আসরের কোথায় কে দাঁড়াবে তুড়ি জুড়ি কোথায় দাঁড়িয়ে গাইবে, দাদামশায় সমস্ত দেখিয়ে দিলেন যাত্রা করে

হবে, কবে হবে, এই যে অনিশ্চয়তাটা ছিল সেটা দূর হয়ে গেল। বোঝা গেল সত্যিই এবার যাত্রাটা হচ্ছে। রিহার্সাল হয়ে গেল। হল্ ঘরে আমাদের রিহার্সাল হত। হল ঘরের এক কোণে থাকত হার্মোনিয়মটা। হার্মোনিয়মের মধ্যে থাকত পালার খাতাটা। খানিক পরে দাদামশায় এসে খোঁজাখুঁজি লাগিয়েছেন। হার্মোনিয়মের ঢাকা তুলে দেখেন খাতা নেই। বলেন—ওরে খাতা চুরি গেছে। দেখ্ কোথায় গেল।

আমি এদিকে খুঁজি,ওদিকে খুঁজি। খাতা আর পাইনে। পাবো কোথায়? লুকিয়ে ফেলছি যে অন্য জায়গায়। কোথায় গেল খাতা, কোথায় গেল করে অনেকক্ষণ খোঁজবার পর দাদামশায় বুঝলেন ব্যাপারটা। কিছু বললেন না।

সেদিন তোতাকে সাজানো হয়েছিল দাঁড়ি। লম্বা চেহারা, হেলেও না, দোলেও না—তোতা ছিল ঠিক বাক্য-শেষের দাঁড়িরই মতো। তোতাকে দেখে দাদামশার ইচ্ছে হয়েছিল তার পার্টটাকে আরো একটু সরস করবেন কিন্তু খাতা হারিয়ে যেতে বললেন—রস-কষের কিছু দরকার নেই। দাঁড়ি হবে শুকনো। আসরে ঢুকে একেবারে দাঁড়ি টেনে দিয়ে চলে যাবে। ঘেঁটু বলে একটি ছেলে সেদিন এসেছিল রিহার্সাল শুনতে। তাকে দেখে দাদামশায় বললেন—বসে আছিস্ কেন? আয় তোকে যাত্রায় ঢুকিয়ে দি। জুতো-চোর সাজবি? ঘেঁটু পার্ট পেয়ে গলে গেল। জুতো-চোর জুতো-চোরই সই! দাদামশায় বললেন—খাতা যখন চুরিই গেছে তোর মুখে আর কথা দেব না। তুই শুধু শিস দিবি। ঘেঁটুর এক মস্ত গুণ ছিল, সে মুখে-মুখে বুলবুলির মতো শিস দিতে পারত। ঘেঁটুর পার্ট হল ঢাকা খাঁচা হাতে আসরে ঢুকে খাঁচার মধ্যে জুতো চুরি করে যেন শ্যামা পাখিকে শিস দিয়ে পড়াচ্ছে এমনি করে আসর থেকে সরে পড়া।

দু-দিন পরে আমরা সাড়ম্বরে লাগিয়ে দিলুম এস্পার ওস্পার যাত্রা, দোতলার হল্-ঘরে আলো জ্বেলে। দৃশ্য-পট নেই, ফুট-লাইট নেই, স্পট-লাইট নেই, কিছু নেই, শুধু কথার মালা, গানের সুর আর অভিনয় ভঙ্গী দিয়ে দৃশ্যের পর দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা। সম্বলের মধ্যে আমাদের শুধু অদম্য সাহস আর উত্তেজনা। আর দাদামশার অফুরন্ত উৎসাহ।

হলঘরের এক দরজা থেকে আর এক দরজা পর্যন্ত একখানা দড়ি টেনে দর্শকদের জায়গা আর অভিনেতাদের এলাকা আমরা আলাদা করে দিতে গিয়েছিলুম ; দাদামশায় এসেই দড়ি তুলে ফেলে দিলেন। বললেন—যারা দেখতে আসবে তাদেরও দলে টেনে নে, তবে তো জমবে যাত্রা।

সত্যিই তাই হল। যাঁরা দেখলেন আর উপভোগ করলেন, আর দেখতে দেখতে আত্মবিস্মৃত হলেন তাঁরাও যেন অভিনয়ের অংশগ্রহণ করেছেন বলে মনে হতে লাগল।

তিন দিন অভিনয় হয়ে যাবার পর কত্তাবাবা এসে দেখলেন। হল্-ঘরে এসে বসলেন পা গুটিয়ে সকলের সঙ্গে। যাবার সময় প্রচুর হেসে বললেন—এ জিনিস অবন ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না!

যাত্রয় আমাদের মোট খরচ হয়েছিল সাড়ে তের আনা। কিছু কর্ক কিনেছিলুম পুড়িয়ে গোঁফ-দাড়ি করবার জন্যে। কিছু রঙিন কাগজ আর দড়ি। সবচেয়ে বেশী খরচ পড়েছিল রক্তমূর্তির খাঁড়াটা তৈরি করতে। এই খাঁড়ার জন্যে পিচবোর্ড আর জগজগা কিনতেই আমাদের পড়ে গিয়েছিল বারো আনা।

॥ ১৫ ॥

আমাদের বাগানের গাছগুলির খুব যে একটা পরিচর্যার প্রয়োজন হত তা নয়। তারা ছিল বেশ খানিকটা স্বাবলম্বী। আমরাও সহজভাবে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে তাদের মধ্যে বিচরণ করতে পারতুম। মালী ছিল মাত্র দুটি —তার মধ্যে একজন সর্দার মালী, যে মনে করত সর্দারী করাই তার কাজ এবং যেহেতু তার অধীনস্থ বারো-চৌদ্দজন মালী কমতে কমতে এক-এ এসে দাঁড়িয়েছিল, সে তাই সর্দারীও করত না, মালির কাজও করত না। বাগানের গাছগুলির যেটুকু তদারক দরকার তার ভার নিয়েছিলেন মেজদাদামশায়। দোপাটি, কস্‌মস্, গাঁদার বীচি এনে যোগী মালী মেজদাদামশার নির্দেশ নিত

কোথায় লাগানো হবে! সরু রাস্তার ধারে ধারে জায়গাগুলি দেখিয়ে দিতেন মেজদাদা, যোগী মালী চারা লাগাত। সন্ধ্যামণির আর কুন্দফুলের ঝোপ কোথায় বসবে, স্থলপদ্ম, সোঁদাল, বকফুল বাগানের কোন্ জায়গায় লাগালে বেমানান হবে না, রঙ্গনের ঝাড় কতটা ছাঁটা দরকার, এসব ভাবনা ছিল মেজদাদার। গোল-বাগানের কোকো-গাছ আর কুমায়ুন পাইনের গাছও শুনেছি মেজদাদা লাগিয়েছিলেন। বড়দাদা আর দাদামশায় এ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁরা শুধু দেখে খুশী হয়ে জানিয়ে দিতেন তাঁদের অনুমোদন। বড়দাদা দুপুরের ঘুম সেরে বারান্দায় বেরিয়ে এসে চোখ দুটোকে সরু করে এনে বাগানের সবুজ ঘনিমার দিকে চেয়ে থাকতেন। কি দেখতেন তিনিই জানেন। তারপর মাথাটা একটু তুলে নারকেল গাছের চুড়োগুলো একবার দেখে নিয়ে এঁকে ফেলতেন শরতের আকাশ-পটে নারকেল-শ্রেণীর ছবি কালোয় সাদায় চীনে কালি দিয়ে। বর্ষার সময় দেখেছি মহানিম আর বকুল গাছ পাতার ভারে জলে ভিজে নুয়ে পড়েছে—আর বড়দাদা তারই সঙ্গে দুটি-চারটি চাতক-পাখি জুড়ে দিয়ে চমৎকার একটা ভিজে ভিজে ছবি আঁকছেন। বড়দাদার অনেক ছবি থেকেই জোড়াসাঁকো বাগানের গন্ধ পাওয়া যেত।

দাদামশার বাগানের শখ ছিল একটু অন্যরকম। বড় গাছ, ফলের গাছ বা ফুলের গাছ তিনি কোনোদিন লাগান নি। গোল-বাগানে ঢোকবার মুখে সরু সরু কাঁটাওয়ালা একটা মনসার ঝোপ ছিল, লাল লাল ফুটকির মতো ফুলে ভরা থাকত ঝোপটা বার মাস। শুনেছিলুম ঐটিই নাকি একমাত্র গাছ যা বাগানের মাটিতে দাদামশার লাগানো। এ ছাড়া, ছিল দাদামশার অনেকগুলি চীনে-মাটির টব। সেই টবে তিনি মাটি আর পাথর ভরে নানারকম গাছ লাগাতেন আর দেখতেন যাতে তারা কিছুতেই বড় হতে না পারে। গাছগুলি ছোট্টটি হয়ে থাকত চিরকাল। জাপানীরা যেমন বন্‌সাই করে তেমনি। গোল-বাগানের উত্তর দিকটা, যার বাঁদিকে ছিল বাঁশের মাচার উপর মাধবীলতার ঝাড় আর যার ঘন পাতার মধ্যে বাসা বাঁধত ঘুঘু আর টুনটুনি আর যার শুকনো পাতা কুড়িয়ে আমরা খেলাঘরের ঝাঁটা

বাঁধতুম, তারই ঠিক মাঝখানে টালি বাঁধানো রাস্তার ধারে সারি সারি ইঁটের ধাপের উপর সাজানো থাকত দাদামশার বন্‌সাই। এরই থেকে একটি দুটি টব-সুদ্ধ গাছ—যেগুলির গড়ন বেশ মানান-সই হয়ে উঠেছে—মাঝে মাঝে দোতলার বারান্দায় এনে তুলতেন। বারান্দার পুব-রেলিংএর গায়ে কাঠের পাটা লাগানো ছিল। তারই উপর বসিয়ে দিতেন তাদের। নিজের চেয়ারে বসে দেখতেন ছোট্ট গাছগুলির পিছনে ভোরের স্বর্যোদয় হচ্ছে, পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে।

এই গাছগুলির মধ্যে সব সেরা ছিল একটি তেঁতুল গাছ। অনেকে দেখে গেছেন এ গাছ। যথেষ্ট গর্ব ছিল দাদামশার এ গাছের। তেঁতুল গাছটির উপর দাদামশার সবচেয়ে বেশী যত্ন ছিল। গুঁড়ি যখন নরম ছিল তখন দড়ি দিয়ে বেঁধে তাকে নুইয়ে নতশির করে দিয়েছিলেন। আমরা সেইভাবেই তাকে দেখেছি। ছোট ছোট কচিপাতায় ভরে যেত ডালপালা। গাছতলার নুড়িগুলি শেওলায় ঢাকা পড়ে সবুজ হয়ে উঠত। ফড়িং উড়ে এসে বসত তার ডালে। গাছটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নিজেরা ছোট্ট হয়ে যেতুম, আর গাছটাকে মনে হত বিরাট এক বৃক্ষ—বড় বড় পাথরের গায়ে পাকিয়ে পাকিয়ে তার শিকড়গুলো মাটির গহ্বরে ঢুকে গেছে। গাছতলাটা যেন অন্ধকার রহস্যে ভরে থাকত।

শুনেছিলুম, কাসাহারা নামে এক জাপানী মিস্ত্রি জোড়াসাঁকো বাড়িতে কাজ করতে এসেছিল। কাঠের কাজে আশ্চর্য তার হাত। কিন্তু দাদামশায় হঠাৎ যেটা আবিষ্কার করে ফেললেন সেটা আরো আশ্চর্যজনক। কাসাহারা শুধু ছুতোরের কাজই জানে না, জাপানী উদ্যানশিল্পে যাকে বলে ল্যাণ্ডস্কেপ গার্ডেনিং, তাইতে তার পাকা হাত। দাদামশারা তাকে নিয়ে বাগানে নামলেন। বললেন—দেখ দেখি কাসাহারা এই বাগানটা। কিছু করতে পারো এটাকে নিয়ে?

কাসাহারা বললে—আপনাদের লাইব্রেরী ঘরের দরজা-জানলাগুলোয় হাত লাগিয়েছি—ওটা আগে শেষ করি। তারপর দেখা যাবে। তবে একখানা গাছে এখনই অস্ত্র চালানো যায়। আসুন আমার সঙ্গে।

এই বলে দাদামশায়দের নিয়ে ফিরে এল লাইব্রেরী ঘরে। লাইব্রেরী ঘরের পূবদিকের দেয়ালে কাসাহারা যে গোল জানলাটা ফোটাচ্ছিল তার পিছনে এনে দাঁড় করাল দাদামশায়দের। বললে—দেখুন সামনের ঐ গাছটা। সামনে ছিল একটা প্রকাণ্ড শিশুগাছ শাখা-প্রশাখা নিয়ে। আঙুল দিয়ে দুটো মোটা ডাল দেখিয়ে বললে—ঐ দুটোকে উড়িয়ে দেব। পূবের আকাশটাকে ঢেকে রেখেছে। খুলে দিই একবার আকাশটা, তারপর দেখবেন পূর্ণিমার চাঁদ কেমন ওঠে।

এই বলে কাসাহারা হাতে এক কুঠার নিয়ে নিজেই গিয়ে উঠে পড়ল সেই শিশু গাছে। তারপর কোপ মেরে উড়িয়ে দিল মাঝখানের মোটা মোটা দুটো ডাল। গাছটার ঈষৎ বক্র দুই প্রকাণ্ড বাহুর মাঝে সমস্ত পূবের আকাশটা বেরিয়ে পড়ল। জানলা আর বাগান, বাগান আর গাছ, গাছের সঙ্গে আকাশ। কাসাহারার হাতে পড়ে লাইব্রেরী ঘরের জানলার পরিকল্পনা আর বাগানের শিশু গাছের কাণ্ডবিন্যাস যেন একই চিত্রপটে আঁকা হয়ে পূর্ণ সঙ্গতি পেয়েছিল।

দাদামশায় বুঝলেন, কাসাহারা সামান্য মিস্ত্রি নয়, রীতিমত শিল্পরসিক। বললেন—কাসাহারা, তোমার যা ক্ষমতা, তোমার যা শিল্পজ্ঞান তার পূর্ণ বিকাশ হওয়া দরকার। জোড়াসাঁকোর বাগানে হবে না। তোমাকে মাইনে দিয়ে বহুদিন রাখতে পারলে একটা কথা ছিল। সে ক্ষমতা আমার নেই। এখানে ঐ একখানি গাছের উপরেই তোমার যে হাতের কায়দা দেখিয়ে গেলে তাতে করে এ জায়গায় তুমি অমর হয়ে রইলে। তোমার জন্যে আমি একটি ভালো বাগানের ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তার আগে তুমি বাপু আমার এই জানলার ধারে বসাবার জন্যে তোমার দেশের কিছু বন্‌সাই আনিয়ে দাও।

দাদামশায় কাসাহারার জন্যে প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের কাশীপুরের বাগান বাড়ি 'এমারেল্ড বাওয়ার'-এ চাকরির বন্দোবস্ত করে দিলেন। সেখানে কাসাহারা বাগানের একটি অংশকে সাজাল মনের মত করে। গাছ লাগিয়ে গাছকে বাড়িয়ে তারপর গাছের ডাল কেটে কেটে তার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার তার অপূর্ব হাত ছিল। আস্তে আস্তে সে প্রদ্যোৎকুমারের বাগানে যে জাপানী

ল্যাণ্ডস্কেপ গার্ডেনটি করেছিল সেটি দেখে মুগ্ধ হননি এমন কোনো মানুষ, কোনো জ্ঞানী গুণীই ছিলেন না তখনকার দিনে।

ইতিমধ্যে জাপান থেকে তিন তিনটে টবে-লাগানো বামন-গাছ এসে গেল। অতি সুন্দর আদত জাপানী বন্‌সাই। কাসাহারার তৈরি পুব-মুখো গোল-জানলার ধারে চমৎকার মানালো। বন্‌সাই আর দু-বাহু মেলা শিশু গাছ—এরই পিছন দিয়ে সোনার থালার মতো চন্দ্রোদয়ও দেখলেন দাদামশায়রা। কিন্তু জাপানী বন্‌সাই এ-দেশের গরম হওয়ায় হঠাৎ একদিন শুকিয়ে গেল। শূন্য পড়ে রইল টব।

তখন আবার ডাক পড়ল কাসাহারার। কাসাহারাকে ডেকে দাদামশায় বললেন—বিদেশী গাছ এখানের মাটিতে, এখানের হাওয়ায় টিকবে না। তুমি শেখাও আমায় গাছকে কি করে বেঁটে করতে হয়। আমি দেশী গাছের বন্‌সাই বানিয়ে নেব।

কাসাহারা বললে—আমি বড় গাছের ডাল কেটে কেটে গাছকে দুরস্ত করতে শিখেছি। বাগান সাজাতে জানি। গাছ বেঁটে করার আমি জানি কি? বন্‌সাই তো এক বিশেষ বিজ্ঞান। বড় বড় মাথাওয়ালা লোক এর চর্চায় মেতে আছেন।

দাদামশায় বললেন—তা হোক! যা জানো সাহেব তাতেই হবে। এসো লেগে যাই দুজনে—কিছু না কিছু বেরবেই মাথা থেকে দেখে নিও ঠিক। এই বলে দুজনে মিলে একটা তেঁতুল গাছ লাগালেন টবে। তারপর তাকে নানান কায়দায় সত্যিই করে ফেললেন বেঁটে বামন। এই হচ্ছে দাদামশার বিখ্যাত তেঁতুল গাছ। দাদামশার প্রথম বন্‌সাই।

এই তেঁতুল আর এরই মতো অন্য কয়েকটা গাছ নিজেরা যেমন ছোট হয়ে গিয়েছিল, তাদের ডালপালা তো বটেই, পাতাও গিয়েছিল ছোট হয়ে। কিন্তু দাদামশার আরো অনেকগুলি গাছ ছিল তাদের সবকিছু ছোট হত কিন্তু পাতা কিছুতেই ছোট হতে চাইত না। পাতার কুঁড়ি বেরলেই নখ দিয়ে সেগুলিকে উপড়ে ফেলতেন। কাঁচি বা ছুরি দিয়ে কাটতেন না। বলতেন, নখের বিষ লাগুক, তবে ছোট হবে। কাসাহারার কাছ থেকে শিখেছিলেন

কায়দাটা। কিন্তু এই যে ক'টা গাছ, যারা বেঁটে হয়ে গিয়েও নিজেদের পাতাকে ছোট করতে চাইত না, তাদের নিয়ে দাদামশার ভাবনার অন্ত ছিল না। বলতেন—বেটাদের তেজ দেখেছিস্? টব থেকে ফেটে বেরতে চায়। যত ছিঁড়ছি তত বেরচ্চে। এইরকম একটি পাঁকুড় গাছ একবার নন্দ-দাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। বললেন; যাও তোমাদের কলা-ভবনের বাগানে লাগিয়ে দাও। বাড়ুক সেখানে। এখানে থাকতে চাইচে না।

নন্দ-দা সেটিকে অতি শ্রদ্ধায় বয়ে নিয়ে গিয়ে শান্তিনিকেতনে কলাভবনের জমিতে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। দাদামশায় বছর দুই পরে গিয়েছিলেন একবার কলাভবনে। টবের পাঁকুড় তখন এক বিরাট মহীরুহ।

দেখে বললেন—টবের মধ্যে আটকা পড়ে ছিল এতদিনের বাড়। ছাড়া পেয়ে কি কাণ্ড করে ফেলেছে দেখেছো?

সেবারে কার্শিয়ং পাহাড়ে গেছেন, আমরাও সবাই গেছি। পুজোর পর পাহাড়ে-শীত, তবু ভোরে উঠতেন। উঠে পায়ে সেপাইদের মতো পট্টি জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধতেন। তারপর তিব্বতী জোব্বা পরে হাতে একটা লোহার ফসা-বাঁধানো খোঁচালো লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন পাংখা-বাড়ি রোডের দিকে। পথের ধারে বা বনের মধ্যে হয়তো চোখে পড়ল একটা পাথর, খোঁচা দিয়ে তুলতেন তাকে। কিন্তু পাথর বলতে কার্শিয়ং-এ বিশেষ কিছুই পাননি। বলতেন, জমি সব শ্যাওলা আর বুনো ঝোপে ঢাকা, পাথর চোখে পড়বে কোত্থেকে?

হঠাৎ একদিন বেলা করে ফিরলেন। মাথার টুপি খোলা, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, ডান হাতে লাঠি, বাঁ হাতে লাঠির ভাঙা ফলাটা। খুব উত্তেজিত। বললেন—একটা শাবল-টাবল কিছু নিয়ে শিগ্‌গীর আয়। আমরা ভাবলুম হীরের খনিই আবিষ্কার করে ফেলেছেন বুঝি বা। তারপর শুনলুম, তা নয়। রাস্তার ধারে চমৎকার নাকি এক বেঁটে গাছ পাওয়া গেছে। সেটাকে প্রথমে মাটি আল্‌গা করে টেনে তোলবার চেষ্টা করেছেন, পারেন নি। তারপর লাঠির ফলা দিয়ে খুব করে খুঁচিয়েছেন, তাতেও হয়নি। শেষে ফলা দিয়ে জোর করে চাড় দিতে গিয়ে ফলাই গেছে ভেঙে। আমরা একটা ছোট-খাট

শাবল যোগাড় করে অমৃৎ বাহাদুরকে নিয়ে দাদামশার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। নাওয়া খাওয়ার কথা সবাই ভুলে গেল। বেশ মাইলখানেক পথ। জায়গাটায় পৌঁছে দেখি, রাস্তার ধারে কই, রাস্তার উপরেই একটা গাছ। বড় বড় ক-টা পাথর সরিয়ে দাদামশায় সরকারী সড়কে বেশ একটা গর্ত করে ফেলেছেন। মিউনিসিপ্যালিটির লোকে একবার দেখলেই হয় আর কি! কিন্তু তখন আর ও-সব ভাববার সময় নেই। কি সুন্দর গাছখানা! আঁকাবাঁকা শক্ত গড়ন। পাতাগুলি ছোট্ট ছোট্ট। একেবারে আসল বন্সাই।

দাদামশায় বললেন—দেখছিস্ একেবারে তৈরি গাছ। এ কখনও ছাড়া যায়? চালা শাবল চট্‌পট্—আবার কে কোথায় দেখে ফেলবে।

আশ্চর্য চোখ দাদামশার! কত লোক হেঁটেছে—কই কারুর চোখে তো পড়েনি এমন সুন্দর একখানা বন্সাই, যা তুলে নিয়ে গিয়ে পাথর দিয়ে টবে সাজিয়ে দিলেই হল। যে দেখবে সে-ই মুগ্ধ হবে।

অমৃৎ বাহাদুর মাটি খুঁড়ে চললো। কিন্তু কী সর্বনাশ! যত খোঁড়ে ততই শিকড় বেড়ে চলে। গাছের উপরটি এতটুকু কিন্তু দেড় হাত মাটি খুঁড়ে ফেললো তখনও শিকড়ের শেষ নেই। আমরা দেখলুম লোহার মত শক্ত শিকড় পাকিয়ে পাকিয়ে পাথর ফাটিয়ে নেমে গেছে।

দাদামশায় বললেন—এ যে পাতালে প্রবেশ করেছে দেখচি। এত বড় শিকড় তো টবে ধরবে না। কি করা যায় তাহলে?

বলতে বলতেই অমৃৎ বাহাদুর হেঁচকা টানে শিকড় শুদ্ধ্ গাছ উপড়ে ফেলেছে।

বেলা হয়ে গিয়েছিল বলে ভাগ্যিস রাস্তায় কেউ ছিল না। আমরা মাটি আর পাথর দিয়ে গর্তটা বুজিয়ে ফেললুম কোনরকমে। দাদামশায় বল্লেন—নিয়ে চল্ গাছটাকে, দেখা যাক এটাকে সাজানো যায় কিনা!

সেদিন-ই মাটি খুঁড়ে বাগানে লাগানো হল গাছটাকে। অত বড় শিকড় শুদ্ধ্ গাছ—কোনো টবেই লাগানো যেত না তাকে! জল ঢালা হল গাছের গোড়ায়। খুব যত্ন করলুম আমরা। কিন্তু সব করেও সে গাছ বাঁচল না।

অমন জোয়ান শক্ত সমর্থ গাছ দু-দিনে শুকিয়ে গেল তার পাতা—ঝরে গেল একটি একটি করে। পল্লবগুলি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

দাদামশায় বললেন—না আনলেই হতে দেখছি। পাথরের রস খেয়ে বেড়েছিল—মাটির রসে ওর কি হবে!

এবার জোড়াসাঁকোর এক গল্প বলি।

একবার বর্ষার শেষের দিকে জোড়াসাঁকোর বাগানে শরতের রোদ যখন থেকে থেকে উঁকি দিচ্ছে, হঠাৎ বর্ষা আবার ফিরে এল। আকাশ অন্ধকার করে নামল বাদলা। ভিজে হাওয়া আর অক্লান্ত বৃষ্টি। টিপ্ টিপ্ টিপ্ টিপ্ করে দিনে রাতে সমানভাবে চলল আট দিন। বাড়ির বাইরে বার হবার যো নেই। বই খাতা কাপড়-চোপড় স্যাঁতসেঁতে। বারান্দার মেঝে শুকোতেই চায় না। দাদামশারা বারান্দাতেই বসে থাকতেন আর বৃষ্টির ধারা-বর্ষণ দেখতেন। তারপর হঠাৎ রাত্রে যেদিন বৃষ্টি থেমে গেল আর ভোরের রোদে ঝলমল করে উঠল আমাদের বাগান, সেদিন আমরা কেউ ওঠবার আগেই অতি প্রত্যূষে উঠে দাদামশায় গিয়ে হাজির হয়েছেন বাগানে। রাত্রে বিশেষ ঘুম-টুম হত না—টের পেয়েছিলেন ঠিক কখন অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টি থেমে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

আমরা ঘুম থেকে উঠেই শুনলুম, ভয়ানক কাণ্ড, দাদামশার তেঁতুল গাছ চুরি গিয়েছে। ভোরে উঠে দাদামশায় বাগানে গিয়েছিলেন। ফোয়ারার মাঝখানে যেখানে গাছটা থাকত, দেখেন সেখানে গাছ নেই—বেমালুম অদৃশ্য হয়েছে। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না! দেখলুম মহা চিন্তিত হয়ে দোতলার বারান্দায় দাদামশায় বসে রয়েছেন। মুখে একখানা আধ-পোড়া চুরুট, তাতে আগুন নেই, সেইটাই টানছেন। আমাদের দেখে বললেন—কার কার কাছে বলেছি বল্ তো 'ডোয়ার্ফ ট্রী'গুলো জাপানে হাজার টাকায় বিক্রি হয়?

আমরা বললুম—এ তুমি অনেকের কাছেই বলেছ। বলে অতি সৎ এবং ভদ্র দেশী-বিদেশী কয়েকজন আগন্তুকের নাম করলুম যাঁরা মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকো-বাড়িতে আসতেন।

দাদামশায় বললেন—কাউকে বিশ্বাস নেই। আমার তেঁতুল গাছের উপর

সবার নজর। জাপানেই চলে গেছে কি না দেখ্। সেদিন কাকে বলছিলুম, ঐ তেঁতুল গাছে যখন তেঁতুল ফলবে তখন তার দাম হবে দশ হাজার টাকা।

দাদামশার প্রিয় তেঁতুল গাছে ছোট্ট ছোট্ট গুটিপোকার মতো তেঁতুল ধরবে এ স্বপ্ন দাদামশার অনেক দিনের। আমাদের কতবার বলেছেন।

কিন্তু ভদ্রই হোক অভদ্রই হোক, এ-কদিনের প্রচণ্ড বৃষ্টিতে কেউ যে জোড়াসাঁকো বাড়ির গেট পার হয়ে ঢুকেছে তারও কোনো প্রমাণ নেই। বেশীর ভাগ সময় আমাদের বাড়িতে ঢোকবার গলিই ছিল এক-হাঁটু জলের তলায়।

দাদামশার কিন্তু খুঁতখুঁতুনি গেল না।

—কে জানে, যখন এদিকে বৃষ্টি চলেছে, ঘরের মধ্যে আমরা বন্ধ, কে ঢুকে পড়েছে ফাঁক দিয়ে? দরোয়ানরাই কি আর নজর রাখতে পারবে? গেল এতদিনের তেঁতুল গাছটা!

আমরা সবাই খুঁজলুম। মালীরা খুঁজলো। কিন্তু সবই হল নিষ্ফল। কোথাও পাওয়া গেল না। দাদামশার অত দিনের অত যত্নের তেঁতুল গাছটা চুরি হয়েছে বলেই সাব্যস্ত হয়ে গেল।

তারপর বেরল সেটা গাছঘরের নিভৃত কোণ থেকে। যে রেখেছিল সে-ই পরম কর্তব্যের খাতিরে বার করে সেটা দাদামশার হাতে পৌঁছে দিলে। ইতিহাসটা হচ্ছে এই। বাড়ির একটি চাকর বৃষ্টির মধ্যে বাগানে বিচরণ করবার সময় দেখতে পায় দাদামশার শখের গাছটির অবস্থা সঙ্গীন। বৃষ্টির তোড়ে ফোয়ারার মধ্যাংশ থেকে পিছলে পড়ে ফোয়ারার জলে অর্ধমগ্ন। সে সেটিকে বাঁচাবার জন্যে যত্ন করে তুলে নিয়ে যায় গাছঘরের আশ্রয়ে। সেখানেই ছিল গাছটি। বেশ ভালোই ছিল। শুধু বৃক্ষোদ্ধারের খবরটি কারো কানে পৌঁছে দেবার কথা উদ্ধারকর্তার মনে পড়েনি।

—গাধাটার বুদ্ধি দেখেছিস্! বলে দাদামশায় হারানো গাছ ফিরে পাওয়ার আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেন।

এই তেঁতুল গাছ যখন একবার দক্ষিণের বারান্দায় পূব রেলিংএ লাগানো

কাঠের পাটার উপর থাকত সেই সময় দাদামশার একটি ছাত্র আমাদের বাড়িতে ছিলেন। দাদামশায় তাকে ডেকে একদিন বললেন—আঁকো দেখি আমার এই তেঁতুল গাছের একখানা ছবি।

ছবি তিনি আঁকতেন ভালো। অন্তত আমরা তাঁর ছবি খুব পছন্দ করতুম। সারাদিন খাটলেন। বন্সাই তেঁতুল গাছের সামনে রং তুলি হাতে একনিষ্ঠ সাধকের মতো বসে কাজ করে গেলেন। সন্ধ্যার সময় ছবিটি শেষ করে ভিজে ছবি শুকিয়ে দাদামশার কাছে নিয়ে এলেন। দাদামশায় তখন বসে বসে 'ডিকেন্স্'-এর 'ব্লীক হাউস' পড়ছিলেন। বললেন—সন্ধেবেলায় কি ছবির রং দেখা যায়? দিনের বেলায় দেখিও।

চলে যাচ্ছিলেন, দাদামশায় আবার কি ভেবে তাঁকে বললেন—আচ্ছা দেখি!

ব্লীক হাউস মুড়ে রেখে দিলেন এক পাশে। ছবিটা হাতে নিয়েই বললেন—অ্যাই দেখ। তেঁতুল গাছ কোথায়? এ যে টব এঁকেছ!

টবে লাগানো তেঁতুল গাছ তিনি যেমন দেখেছিলেন তেমনই এঁকেছিলেন।

দাদামশায় বললেন—গাছ আঁকতে বললুম, তুমি টব এঁকে বসলে। আমার তেঁতুল গাছকে তাহলে তুমি দেখতেই পাওনি। আমার গাছ কি ঐটুকু নাকি? ছবি আঁকছিলে যখন, তখন গাছের বয়সের কথা মনে হয় নি? কি দেখছিলে ঠিক করে বল তো? টব না গাছ?

—আজ্ঞে, গাছও দেখছিলুম, টবও দেখছিলুম।

—কে তোমায় টব দেখতে বলল? অর্জুনের লক্ষ্যভেদের গল্প পড়েছ? পড়ে নিও। শুধু যদি গাছটাকে দেখতে চোখের সামনে, গাছটা বড় হয়ে যেত। তুমি হয়ে যেতে ছোট। গাছের গুঁড়ি গাছের ডাল যে কতকালের পুরোনো, কত তার বয়েস পষ্ট দেখতে পেতে। চলো ঠিক করে দিই তোমার ছবি।

বলে উঠলেন ছবিটা নিয়ে। দক্ষিণের বারান্দায় ছবি আঁকবার জায়গায় গিয়ে চেয়ারে পা গুটিয়ে বসলেন। দেরাজ থেকে বেরল একটা কাঁচি।

কচাকচ্ কেটে দিলেন। টবের অর্ধেকটা কাটা পড়ল। বাকি অর্ধেকটাকে রং দিয়ে ঢেকে দিলেন জমির সঙ্গে মিলিয়ে। তারপর ছাত্রটিকে বললেন—যাও, দাঁড়াও গিয়ে সামনে ঐ রেলিংটার ধারে। তোমাকে এঁকে দিই ছোট্টটি করে।

বলে তেঁতুল-গাছতলায় আঁকলেন তার অনুগতভাবে দাঁড়ানো চেহারা। বিরাট গাছের তলায় আশ্রিত এক পথিক। আর আঁকলেন একটুখানি আকাশ।

তারপর বললেন—কতদিনের গাছ—কত এর বয়েস! এর সঙ্গে চালাকি? দিলুম তোমাকে বুড়ো-আংলা করে। নাও।

ছবি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—আচ্ছা রোজ ভোরবেলা উঠে তো তুমি সূর্যোদয় দেখ। যাও, কাল থেকে ঐখানে বসে সূর্যোদয় দেখবে। তোমার চোখ তৈরি হওয়া দরকার। যেদিন আমায় এসে বলবে, আজ্ঞে আজ তেঁতুলতলায় বসে সুয্যি ওঠা দেখেছি, সেইদিনই আবার ছবি আঁকতে পাবে, তার আগে নয়।

এই বলে ডিকেন্সএর ব্লীক হাউসটা তুলে নিয়ে আবার পড়ায় মনোনিবেশ করলেন।

॥ ১৬ ॥

দাদামশার এক গুণ ছিল, তিনি কখনও খবরের কাগজ পড়তেন না। আমরা দেখতুম সবাই কাগজ পড়তেন, কেউ বেশী, কেউ কম, অন্তত একবার চোখ বুলিয়ে নেন সকলেই, কিন্তু দাদামশায় খবরের কাগজ ছুঁতেনই না। দাদামশায় বলতেন—খবর কি পড়তে হয়? খবর পড়ে আরাম নেই, খবর শুনে আরাম। দাদামশায় খবর শুনতেন লোকের মুখে। খবর শুনে ওয়াকিবহাল হতেন দুনিয়া সম্বন্ধে।

খুব সকালে সাহাদের বাড়ি থেকে পুন্নবাবু আসতেন দোতলার দক্ষিণের

বারান্দায়। থেলো হুঁকোয় এক কলকে তামাক পুন্নবাবুর বরাদ্দ ছিল রোজ। পুন্নবাবু ঢুকলেই বিশ্বম্ভর বেহারা কলকের গুলে আগুন দিয়ে হুঁকোয় বসিয়ে দিয়ে যেত আর পুন্নবাবু এক হাতে হুঁকো আর এক হাতে খবরের কাগজ নিয়ে বাগানের দিকে পিঠ করে বসে যেতেন। পুন্নবাবুই ছিলেন আমাদের বাড়ির খবরের কাগজের প্রথম পড়ুয়া। পুন্নবাবু এক সময় ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান পাঠের ডেমনস্ট্রেটার। গাছ-পালা সম্বন্ধে তাঁর প্রচুর উৎসাহ ছিল, জ্ঞানও ছিল। আমরা যখন তাঁকে দেখেছি তখন তিনি কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। তখন তিনি জোড়াসাঁকো বাড়ির নিত্য-আগন্তুক। আফিম ধরেছেন। আমরা দেখতুম হুঁকো হাতে নিয়ে পুন্নবাবু ঝিমোচ্ছেন, হাতের খবরের কাগজ খোলা। পড়া হচ্ছে না। ওদিকে মেজদাদা অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করে আছেন কখন পুন্নবাবুর পড়া শেষ হয় তারপর তিনি পড়বেন। কখনো দেখতুম চটকদার কোনো খবর পুন্নবাবু সকলকে পড়ে শোনাচ্ছেন। খবরের চটকে তাঁর আফিমের মৌতাত ছুটে যেত। কখনো দেখেছি খবরের কাগজ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে পুন্নবাবু আর মেজদাদামশায় উদ্ভিদ্ বিষয়ে, উদ্যান পরিচর্যা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। মেজদাদামশার কাগজ পড়া হয়ে গেলে আর সকলে পড়তেন। মোটামুটি খবরগুলো দক্ষিণের বারান্দাতেই প্রতিদিন সকালবেলা মুখে মুখে আলোচিত হয়ে যেত। দাদামশায় ছবি আঁকা থেকে চোখ না তুলেই কগজে ছাপা খবরগুলো সব জেনে ফেলতেন।

কলকাতার আকাশে যখন প্রথম এরোপ্লেন আসে পুন্নবাবুই খবরের কাগজ থেকে সে খবর দিয়েছিলেন দাদামশায়দের। সে কি উত্তেজনা! উড়োজাহাজ যা কেউ কোনদিন চোখে দেখেনি, ছবিতেই দেখেছে, তারই একখানা একেবারে জলজ্যান্ত উড়ে আসবে শহরের মাথার উপর দিয়ে। খবরটা দু-বার তিন-বার পড়া হল কখন এরোপ্লেনটা আসবে, কোথায় গিয়ে নামবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হল। তারপর যেদিন এলো উড়োজাহাজটা সকাল থেকে বাড়িসুদ্ধ সবাই ছাদে। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে সবার চোখ ব্যথা হয়ে গেল। শেষে ছোট্ট বিন্দুর মতো উত্তর আকাশে ক্ষুদে এক ফুটকির উদয়।

ক্রমে বড় হতে-হতে মাথার উপর দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দে উড়ে পালালো দৈত্যটা। ছোট একটা 'টু সীটার' প্লেন। তখনকার দিনে ঐটেকেই মনে হয়েছিল এক উড়ন্ত দৈত্য। তারপর দশ-বারো দিন ধরে রোজ খবরের কাগজ পড়ে পুন্নবাবুকে শোনাতে হত এরোপ্লেন বিষয়ক নানা খবর।

ভূমিকম্প বন্যা দুর্ভিক্ষের খবর, লাট-বেলাটের খবর, পদ্মার উপর রেলের পুল খোলার খবর, চিড়িয়াখানায় সাদা হাতী আসা, কলকাতা শহরে মনুমেণ্টের মাথা ছাড়িয়ে বাড়ি ওঠা আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল খোলার খবর— এই সব খবর পুন্নবাবু দাদামশায়কে শুনিয়ে দিতেন। দাদামশায়কে খবর যোগানো আর মেজদাদামশায়কে ভালো ভালো গাছ যোগানো চলেছে, পুন্নবাবুকে এইরূপে আমরা অনেক দিন দেখেছি। তারপর হঠাৎ পুন্নবাবু মারা গেলেন।

ইতিমধ্যে ক্ষিতীশ আমাদের জোড়াসাঁকো পরিবারে এসে গিয়েছে। ক্ষিতীশের কোনো ধরাবাঁধা কাজ ছিল না। কিছু ফাই-ফরমাশ খাটত আর জোড়াসাঁকো বাড়িতে কোনো অভিনয় হলে রাস্তায় যখন গাড়ির ভিড় হত তখন গাড়ির গতি এবং অভিমুখ নিয়ন্ত্রণ করে খুব আনন্দ পেত ক্ষিতীশ। আর সন্ধ্যে বেলায় কোথা থেকে একটা খবরের কাগজ যোগাড় করে এনে দাদামশায়কে খবর শোনাত। পুন্নবাবুর স্থান ক্ষিতীশ পূর্ণ করেছিল। তবে তফাত ছিল একটুখানি। ক্ষিতীশের খবর শোনাবার সময় ছিল সন্ধ্যেবেলা। আর ইংরেজী খবরের বদলে ক্ষিতীশ শোনাত বাংলা খবর। এ দুটোই দাদামশার পক্ষে অধিকতর উপভোগ্য হয়েছিল বলে আমাদের বিশ্বাস।

ক্ষিতীশ একদিন বললে—আমার জাত-ব্যবসা কবিরাজী। আমি মাথায় মাখবার তৈল্ তৈরি করব। বাবামশায় একটা নাম দিয়ে দিন।

দাদামশায় বললেন—তইল্ তৈরি করবে? কবিরাজী তইল্? বেশ, নাম দাও অলকানন্দ।

ক-দিনের মধ্যে দেখি ক্ষিতীশ হাঁড়ি, কড়া, তেল, মসলা, গন্ধ, রং সব

কিনে নিজের ঘরের কোণে রীতিমত এক কারখানা সাজিয়ে ফেলেছে। আর তৈরি করিয়ে এনেছে একটা রবার স্ট্যাম্প—ছাপ মারলে তার থেকে এই লেখা বেরুচ্ছে—

অলকানন্দ কেশ তৈল
ডাক্তার শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি আই ই
কর্তৃক প্রদত্ত নাম
মাখিলে মাথা ঠাণ্ডা হয় ও কেশ বৃদ্ধি পায়
মূল্য প্রতি শিশি ৮০

একদিন সকালে ক্ষিতীশ রাশি রাশি কাগজে এই ছাপ মেরে ফেল্লে। দাদামশার কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাতে দাদামশার তো চক্ষু স্থির। বললেন—করেছ কি ক্ষিতীশ? ডাক্তার, সি আই ই! তারপর তোমার ঐ পাগলের তেল মেখে লোকের যদি মাথা খারাপ হয় তখন তো আমাকেই ধরবে! নাম দিয়ে আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়লুম দেখচি!

ক্ষিতীশ দমবার পাত্র নয়। হেসে গলে পড়ে বললে—আজ্ঞে, তেলের শিশির প্যাকেটের মধ্যে একটা হ্যাণ্ডবিল দেব। আপনার একটা সার্টিফিকেট তাইতে থাকবে···

—তোমার তৈলই মাখলুম না, চোখেও দেখলুম না, তার আবার সার্টিফিকেট! ওরে ও মোহনলাল, মোহনলাল! এ দিকে আয়। দেখ কাণ্ড! বলে চেঁচিয়ে আমায় ডাকতে লাগলেন।

আমি ছুটে এলুম। ক্ষিতীশ বললে—আজ্ঞে তেল আমি নিজে হাতে আপনার মাথায় মাখিয়ে দেব। আপনি সার্টিফিকেটটা লিখে দিন, নৈলে আমার তেল বিক্রি হবে না।

—মোহনলাল, কাগজ নিয়ে আয়।

আমি একখানা কাগজ বাড়িয়ে দিতেই দাদামশায় অলকানন্দ কেশ তৈলের বেশ ভাল করে একখানা প্রশংসাপত্র লিখে দিলেন। তারপর আমায় বললেন—কালিদাসের ঋতুসংহারটা নিয়ে আয় তো। ঋতুসংহার আনতে দাদামশায় গ্রীষ্মবর্ণনা থেকে আরম্ভ করে বসন্ত বর্ণন পর্যন্ত দু-চার লাইন

করে তুলে নিতে বললেন। প্রচণ্ড-সূর্য্যঃ স্পৃহনীয়চন্দ্রমাঃ থেকে শুরু করে প্রফুল্লচুতাঙ্কুরতীক্ষ্ণসায়কো পর্যন্ত টোকা হল।

—দে ঐগুলোকে ক্ষিতীশের হ্যাণ্ডবিলে ঢুকিয়ে। ছ-ঋতুতেই অলকানন্দ কেশ তৈল মাখা চলে—থাকুক কালিদাসের এই সার্টিফিকেট। আমার সার্টিফিকেটটা তাহলে আর লোকের অত চোখে পড়বে না।

এই ভাবে ক্ষিতীশের কেশতৈলের প্রচার শুরু হয়েছিল।

একদিন সন্ধ্যায় ক্ষিতীশ এক চারপেজী খবরের কাগজ হাতে মহা উত্তেজিত অবস্থায় দাদামশার সান্ধ্য বৈঠকে এসে হাজির।

—দেখুন বাবামশায়, আমার তৈলের কথা লিখেছে।

দাদামশায় বললেন—কি লিখল আবার দেখি। আমাকে ধরবে-টরবে না তো?

ক্ষিতীশ দেখাল লিখেছে— ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুল প্রশংসিত এক শিশি অলকানন্দ কেশ তৈল পাইয়া আমরা সবিশেষ প্রীত হইয়াছি। ইত্যাদি।

দাদামশার মুখে হাসি ফুটে উঠল। তারপর বললেন—কত টাকা লাগল ক্ষিতীশ তোমার এই খবরটা কাগজে ওঠাতে?

ক্ষিতীশ মাথা চুলকে বললে—আজ্ঞে, টাকা তো লাগেনি। আপনার নাম করতেই হয়ে গেল।

—আমার নাম করতে? আমার নামে বিল্ আসবে না কি?

—আজ্ঞে না, ওদের কাগজে আপনার লেখা ছাপা হবে এই বলে এসেছি।

—ও মোহনলাল, মোহনলাল। এদিকে আয়। ক্ষিতীশ কি কাণ্ড করে এসেছে দেখ!

শুনলুম সব। বললুম—খবরের কাগজের সম্পাদক যদি এখন তোমার কাছ থেকে লেখা চেয়ে বসেন, তাহলে দিতেই হবে, এড়াবার কোনো উপায় নেই।

এই সময় একদিকে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, অন্য দিকে সন্ত্রাস আন্দোলনের খবর খবরের কাগজে যা বেরত ক্ষিতীশ বেছে বেছে সেইগুলিই

দাদামশায়কে শোনাত। রাজনৈতিক খবর ছাড়া কোনো আজগুবি অবিশ্বাস্য খবর থাকলে তো কথাই নেই, ক্ষিতীশ আগে সেটা শোনাবে। ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে, সুতরাং খবর তো বটে! আর শোনাত ফুটবলের খবর। তবে ফুটবলের খবর শোনাবার সময় ক্ষিতীশের বেশ একটা ভেদনিরূপণের ক্ষমতা দেখা যেত। ক্ষিতীশ ছিল ঢাকার বাঙাল। ঈস্ট বেঙ্গল ক্লাব জিতলে সেই খবরের পাতাটা খুলে দাদামশার পায়ের কাছে বসে পড়ত শোনাত। কিন্তু মোহনবাগান জিতলে খবরটা একেবারেই চেপে যেত। আমরা কেউ খবরটা চুপি চুপি দাদামশার কানে পৌঁছে দিলে দাদামশায় বলতেন—ও ক্ষিতীশ, আজকের ফুটবলের খবর তো কই বললে না?

ক্ষিতীশ যেন শুনতে পায়নি এমন ভাব দেখিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠত—এই দেখুন কুয়োর ভিতরে পড়ে এক বুড়ী মৃত হয়েছে। খবরটা পড়ছি। বলে বিশদভাবে বুড়ীর মৃত হওয়ার খবরটা পড়তে শুরু করত। ফুটবলের প্রসঙ্গ আর উঠত না।

তারপর দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন এমন জায়গায় এসে পৌঁছল যে গভর্নমেণ্ট সব দিশী খবরের কাজগুলোকে বন্ধ করে দিলেন।

দাদামশায় বললেন—কি মুশকিল দেখ তো। এই সময়েই খবরের সব চেয়ে বেশী দরকার আর এই সময় খবর নেই! ও ক্ষিতীশ, কি করা যায়? সময় কাটে কি করে? দেখো তো ক্ষিতীশ পায়ের এখানটা কি হল? ফুলে উঠে বড় ব্যথা করচে।

ক্ষিতীশ টিপে টুপে দেখে বললে—আজ্ঞে দেখে তো বিস্ফোটক বলে মনে হয়। ওষুধ লাগানো দরকার।

—তোমার কোনো কবিরাজী ওষুধ জানা আছে না কি?

—আজ্ঞে আছে বই কি। এখনই ব্যবস্থা করছি।

—থাক থাক, তোমায় ব্যবস্থা করতে হবে না। ডাক্তারকে খবর দাও, কাল এসে দেখে যাক।

ক্ষিতীশের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা মঞ্জুর হল না দেখে ক্ষিতীশ নিরাশ হল বটে, কিন্তু ডাক্তার এসে যখন বললেন, ফোঁড়াটা বাঁকা রকম এবং ওষুধ দিয়ে

ওটাকে ফাটিয়ে বেশ সাবধানে ড্রেসিং করে আস্তে আস্তে সারাতে হবে, তখন মহা উৎসাহিত হয়ে ক্ষিতীশ সমস্ত সেবার ভার নিজেই গ্রহণ করলে।

তারপর বেশ কিছুদিন এই ফোঁড়ার চিকিৎসা নিয়ে কাটলো। যন্ত্রণা বেড়ে উঠলো। পাকলো ফোঁড়া। তারপর ফাটলো। ধোয়া মোছা। বাঁধন খুলে গরম জলে ওষুধে ফোঁড়ার মুখ পরিষ্কার করা। তুলো আর ওষুধ দিয়ে পরতে পরতে জড়িয়ে জড়িয়ে আবার নতুন করে বাঁধা। ক্ষিতীশের সাহায্যে দাদামশায় রোজ দু-বেলা ঘণ্টা খানেক ধরে এই করতেন। বাঁধন নিয়ে নানারকম এক্সপেরিমেণ্টও চলত। কি ভাবে বাঁধলে সহজে চলা-ফেরা করা যায় অথচ বাঁধন ফস্কে পড়ে না, কিভাবে বাঁধলে রক্ত চলাফেরা ব্যাহত হয় না, এই সব নানারকম ভৈষজ্য তথ্য আলোচিত ও পরীক্ষিত হত।

শেষে ফোঁড়া যেদিন সেরে গেল, দেখা গেল আর ড্রেসিং দরকার হবে না, দাদামশায় ভারি ভগ্নোৎসাহ হয়ে বললেন—বেশ সময় কাটছিল ক-দিন। কি যে করি এখন ? ও ক্ষিতীশ, কি করা যায় ?

একে খবরের কাগজ নেই, তার উপর ফোঁড়ার কাজও শেষ। ক্ষিতীশও দেখা গেল বড় দমে পড়েছে।

দিদিমা ভয়ানক চটে গেলেন। বললেন—তোমার যেমন কথা ! ফোঁড়া সারলে আমার হরির লুট মানত করা আছে। আবার ফোঁড়া বাধাতে চাও নাকি ?

ক্ষিতীশ সেদিন সন্ধ্যেবেলা খুব রহস্যজনক ভাবে দাদামশার ঘরে প্রবেশ করে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে ধপ্ করে দাদামশার পায়ের কাছে বসে পড়ল। তারপর পাঞ্জাবি উল্টে ফতুয়ার পকেট থেকে কতকগুলো ভাঁজ করা ময়লা কাগজ বার করে নীচু গলায় বললে—বাবামশায়, আপনার জন্যে নিষিদ্ধ খবরের কাগজ নিয়ে এলাম।

দাদামশায় চমকে উঠলেন—নিষিদ্ধ ? নিষিদ্ধ কি হে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, খবরের কাগজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কংগ্রেসীরা এগুলো বার করছে। বোমার দলের কাগজও এনেছি। সেগুলো আরো ভালো।

—কি সর্বনাশ ! তুমি কি আমার হাতে দড়ি দেওয়াবে না কি ?

কোত্থেকে পেলে তুমি এসব? তুমিও ঐ দলে বুঝি? বিদেয় কর বিদেয় কর।

—দেখুন খুব ভালো খবর আছে। বলে ক্ষিতীশ দাদামশার প্রতিবাদে দৃক্‌পাত না করে লোমহর্ষক সব খবর পড়ে যেতে লাগল। সেই সব খবরের মধ্যে কতক ছিল ব্রিটিশের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী আর কতক ছিল বিপ্লবী দলের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাবার পরিকল্পনা। খবরগুলি যেমনই হোক, দাদামশায় শুনে খুব মজা পেলেন।

তারপর থেকে যতদিন খবরের কাগজ প্রকাশের নিষেধ-আজ্ঞা প্রত্যাহার হয়নি রোজ ক্ষিতীশ নানা রাজনৈতিক দলের গোপন এবং নিষিদ্ধ হাতে-ছাপা বুলেটিন কোথা থেকে যোগাড় করে এনে দাদামশায়কে শোনাত আর দাদামশায় খুব হাসতেন।

দাদামশায় বলতেন—ক্ষিতীশ এ এক আচ্ছা মৌতাত ধরিয়ে দিয়েছে। ভয়ে কাঁপছি সব্বোখ্‌খন, অথচ ছাড়তেও পারছি না।

॥ ১৭ ॥

অলকানন্দ তেল বেচে ক্ষিতীশ ভেবেছিল বড়লোক হয়ে যাবে। কিন্তু তা আর হল না। প্রথম দিকে উৎসাহের অন্ত ছিল না ক্ষিতীশের। কালিদাসের শ্লোক আর দাদামশার সার্টিফিকেট এরই জোরে ব্যবসাটা অনেকদূর এগিয়ে যাবার কথা। তেল তো খারাপ নয়, যেমন বর্ণ, তেমনি গন্ধ, গুণও ভালো—মাখলে সত্যিই মাথা ঠাণ্ডা হত। তার উপর দামেও সস্তা। প্রথম আশি নব্বই শিশি তেল দোকানে দোকানে বেশ চটপট নিয়ে নিলে। শোনা গেল. বিক্রিও হচ্ছে ভালো। ক্ষিতীশ এসে দাদামশায়কে খবর দিলে—আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে আমার ব্যবসা, বলতে নেই হেঁ হেঁ হেঁ—বলে একগাল হেসে ফেল্লল। আমরা ভাবলুম, জবাকুসুম, লক্ষ্মীবিলাস, কেশরঞ্জনের মতো ক্ষিতীশের অলকানন্দের নামও হাটে-বাজারে শোনা যাবে; সকলের মুখে

ধ্বনিত হবে এইবার অলকানন্দ, অলকানন্দ! কিন্তু দ্বিতীয় দফা তেল নিয়ে ক্ষিতীশ যখন দোকানে বাজারে বেরল, তখন দেখা গেল, তেল নেবার ইচ্ছে থাকলেও তেল-বেচা পয়সা তাড়াতাড়ি উসুল করবার ইচ্ছে খুব বেশি লোকের নেই। কেউ বললে,—মাস কাবার হোক। কেউ বললে—পরে আসবেন। তেলের ব্যবসার এদিকটা ক্ষিতীশের জানা ছিল না। টাকা আদায়ের কত ঝঞ্ঝাট, তাতে কত নাজেহাল হতে হয়, সেদিক দিয়ে যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা হতে লাগল ক্ষিতীশের। শেষে একদিন দাদামশার সামনে এসে খুলে বললে সব কথা। বললে—ব্যবসা তো আর চলে না বাবামশায়। পাওনাদারেরা খেয়ে ফেলল। এদিকে আদায় উসুল কিছু নেই।

দাদামশায় শুনে বললেন—হয়েছে। কথায় বলে, ফেল কড়ি মাখ তেল! তোমাদের দেশে বুঝি এ-প্রবাদবাক্যের চল নেই? তেলের ব্যবসায় নেমেছ আর এটা জান না?

ক্ষিতীশ স্বীকার করলে—এ-সদুপদেশ সে কখনও শোনেনি।

দাদামশায় তখন ক্ষিতীশের দেনার হিসেব নিলেন। হিসেব টিসেব নিয়ে দেখা গেল, কাঁচা তেল, কাঁচা মসলা প্রভৃতি বাবদ ষাট-সত্তর টাকা দেনা।

দাদামশায় বললেন—তেলের নাম দিয়ে আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল তো! এ-ঋণভার থেকে উদ্ধার পাই কি করে? ভেবেছিলুম ছোকরা তেল বেচে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এখন দেখছি এর ঋণভার তো বটেই, এর ভারও আমার উপর এসে পড়ল।

এই বলে ক্ষিতীশের দেনা দাদামশায় মিটিয়ে দিলেন। বললেন—ব্যবসা তো চুকলো। আর তো আর কোনো কাজ নেই—পা টেপো এখন বসে বসে।

ক্ষিতীশ দাদামশার পা টিপতে বসে গেল।

এইভাবে একদিন সন্ধেবেলায় পা টিপতে টিপতে ক্ষিতীশ বললে—বাবামশায়, বড় ভূতের ভয় হচ্ছে।

দাদামশায় অবাক হয়ে বললেন—সেকি ক্ষিতীশ? ভূত আবার কোথায় পেলে?

—আজ্ঞা, আমার ঘরের পাশেই আপনাদের পিতৃপুরুষের ক্যাশঘর। ঐখানেই।

—পিতৃপুরুষের ক্যাশঘরে কি? ঐখানে ভূত ঢুকেছে?

—আজ্ঞা।

একতলায় দোলনার বাগানের পশ্চিম দিকে কাছারি ঘর—লম্বা ফালির মত। তার এক কোণে সারি সারি কাঠের র‍্যাক-এর উপর সাজানো বহু যুগের নথী-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ ধুলোয় ঢাকা। বড় বড় ইঁদুর তার ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়ায়। বর্ষার শেষের দিকে আরশোলায় ভরে যায় অন্ধকার ঘরের কোণগুলো। জমিদারী সেরেস্তার এই সব পুরনো দলিল নিয়ে কেউ কোনদিন ঘাঁটাঘাঁটি করে না। বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণে এই কাছারি-ঘর শেষ হয়েছে। তার গায়েই উত্তর দিকের প্রথম ঘর হচ্ছে ক্ষিতীশের। এই ঘরে খুব ছেলেবেলায় আমরা দেখেছিলুম দাদামশার লিথোর ছাপাখানা ছিল। বিরাট বিরাট পাথর সাজানো থাকতো এক কোণে আর ঘরের মাঝখানে ছিল লিথো প্রেসটা। সেই সব পাথর ঘষে ঘষে মসৃণ করে তার উপর ছবি ট্রান্সফার করে এক-একটা পাথরে এক-এক রকম রং দিয়ে যখন তিনরঙা, চার-রঙা ছবিগুলো ছাপা হয়ে বেরত, আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম আর দু-একখানা আধ-ছেঁড়া ছবি যদি এসে পড়ত আমাদের হাতে, তাহলে দৌড় দিতুম তাই নিয়ে আমাদের ঘরে। দাদামশায় নিজহাতে লিথোর পাথরে ছবি আঁকায় সাহায্য করতেন। এই লিথোযন্ত্রে ছাপা হয়েছিল বড়দাদার ব্যঙ্গচিত্রের বই 'অদ্ভুতলোক' আর 'বিরূপবজ্র'। এই ছাপাখানা উঠে যাবার বহুদিন পরে ক্ষিতীশের অধিকারে আসে এই ঘর। সেই ঘরের পাশেই হচ্ছে ক্যাশঘর। সত্যিই এক সময় জমিদারির খাজনা এই ঘরে এসে জমা হত। মোটা মোটা লোহার গরাদ-ঘেরা ঘর। লোহার ফ্রেমে গরাদ বসানো দরজা, তাতে মস্ত তালা ঝোলানো। ঘরে খাজনা জমা থাকলে গাদা-বন্দুক হাতে পাহারা থাকতো শান্ত্রী। কিন্তু বহুকাল হল সে-সব রীতি আর নেই। বাক্স ভরে, নৌকা বোঝাই হয়ে, রেলে করে টাকা আসার বদলে আজকাল টাকা আসে ইনশিয়োর হয়ে। আমরা তো

দেখিইনি, আমরা জন্মাবার কতকাল আগে থেকে ঐ ঘরের আসল ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে জানি না। তবুও ঘরটাকে বলা হয় ক্যাশঘর। ঘরটাকে আজকাল ব্যবহার করা হয় গুদম ঘরের মতো। তার মধ্যে আছে দ্বারকানাথের আমলের 'ডাইনিং-রুম'-এর কিছু আসবাবপত্র, ঝাড়, লণ্ঠন, কাঁচের আর চীনেমাটির বাসন ইত্যাদি। তালাবন্ধ পড়ে থাকে জিনিসগুলো —কেউ কোনোদিন খোলেও না।

এই ঘরে ক্ষিতীশ বলছে ভূত ঢুকেছে! দাদামশায় বললেন—কি করে টের পেলে হে?

—আজ্ঞা, গভীর রাতে আওয়াজ শুনতে পাই!

—কিসের আওয়াজ?

—কে যেন লোহার দরজা ভাঙছে।

—দরজা ভাঙছে কি রকম?

—ঝন্ ঝন্ শব্দ হয়। এতদিন বলিনি আপনাদের। কিন্তু ভয় ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। তাই আর না বলে থাকতে পারলাম না।

দাদামশায় আমাদের ডেকে পাঠালেন। তারপর বললেন—ঐ শোন্! নীচের ক্যাশঘরে কি কাণ্ড চলেছে। বলে ভূত! ক্ষিতীশ তো ভয়েই গেল। তারপর বললেন—ওরে চোর নয় তো? মাটির নীচে দ্বারকানাথের কিছু পোঁতা ছিল কিনা, কে জানে? চোরেরা হয়তো খবর পেয়েছে। ভূতও হতে পারে, বলা যায় না। সে-আমলের ডাকাত ভূত!

শুনে আমাদের ব্যাপারটাকে বেশ লোমহর্ষক বলে মনে হল। কল্পনায় রং চড়িয়ে মনের মধ্যে অনেক রকম ছবি আঁকা চলতে থাকল। দাদামশায় নিজেই অনেক রকম ব্যাখ্যা করতে থাকলেন। একবার বললেন—চোরেরা ক্যাশঘরের খবর পেয়েছে নিশ্চয়। বাড়ির নীচে দিয়ে ঢুকে সিঁদ কেটে ক্যাশঘরে ঢোকবার চেষ্টা করছে। গাঁইতির শব্দ শুনে ক্ষিতীশ বলছে ভূত।

আমাদের বাড়ির একতলার মেঝের নীচে পুরনো বাড়ির রীতি অনুযায়ী এ-পার থেকে ও-পার অবধি খিলেন-করা টানা ফাঁক ছিল অনেকগুলো। তার মধ্যে বেজী থাকত, খট্টাস থাকত, গোসাপও থাকত দু-একটা। এর

মধ্যে দিয়ে সিঁদেল চোর প্রবেশ করে মাটি ফুঁড়ে ক্যাশঘরে গিয়ে ঢুকবে, এটা বিশ্বাস করা যতটা শক্ত হোক, কিন্তু জোড়াসাঁকো বাড়ির সন্ধ্যার আমেজে বেশ রসিয়ে রসিয়ে কল্পনা করে নেওয়া একটুও কষ্টসাধ্য ছিল না। কিন্তু প্রশ্ন ছিল ক্যাশঘরে অত কষ্ট করে চোর যে ঢুকবে—কিসের লোভে ঢুকবে? এর কোনো সদুত্তর ছিল না। এক যদি ধরে নেওয়া যায় গুপ্তধনের লোভে, যার খবর এক দ্বারকানাথ জানতেন, আর কেউ জানে না, তাহলেও খানিকটা মানে পাওয়া যায়। কিন্তু সেদিক দিয়ে দেখতে গেলেও মেনে নিতে হয় যে গুপ্তধন বার করতে গেলে উপর থেকে মাটি খুঁড়তে হবে—তার জন্যে মাটির নীচে ঢুকে সুড়ঙ্গ কেটে উপরে ওঠবার দরকার কি? এইসব গোলমেলে যুক্তিতর্কের ফলে শেষ অবধি সিদ্ধান্ত হল, ক্ষিতীশ যদি সত্যিই কোনো ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনে থাকে তা হলে তা ভূতের থেকেই নিঃসৃত। আর চোর যদি নেহাত হয়ই, তাহলেও সে চোরের ভূত।

দাদামশায় ক্ষিতীশকে বললেন—এবার যদি গভীর রাতে তুমি কোনো শব্দ শোনো তাহলে আমাদের ডেকে তুলবে। আমরা গিয়ে দেখব।

ক্ষিতীশ বললে—আজ্ঞে আমি থাকব নীচে, আপনারা উপরে! বেশী ডাকাডাকি করতে গেলে ভূতই হোক, চোরই হোক, পালিয়ে যাবে।

অনেক ভেবে চিন্তে একটা উপায় ঠিক হল। দাদামশার ঘরের দক্ষিণ দিকের জানলার ঠিক নীচে একটা কলতলা। জায়গাটা তিনদিকে ঘেরা বলে বেশ নিরিবিলি। ক্ষিতীশ ভূতের শব্দ শুনলেই চুপি চুপি কলতলায় চলে আসবে। সেখানে দাদামশার ঘরের জানলা থেকে ঝুলবে একটা দড়ি। সেই দড়ির আগায় বাঁধা থাকবে একটা ঘণ্টা। ক্ষিতীশ দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজিয়ে বেশী শব্দ না করে আমাদের ডেকে তুলুক।

আমাদের বাড়িতে যে স্কুল বসত, সেই স্কুলের একটা পিতলের ঘণ্টা ছিল। মাস্টারমশায়ের টেবিলে থাকত সেটা। তিনি পড়ার শুরুতে আর ক্লাশের শেষে সেটা বাজাতেন। সেই ঘণ্টাটা কাজে লাগল। সেটাকে নিয়ে এলুম দাদামশার শোবার ঘরে। তারপর কলতলার দিকে জানলার গায়ে টাঙিয়ে একখানা দড়ি বেঁধে দড়িখানা নীচে কলতলা অবধি ঝুলিয়ে দিলুম। প্রতি রাতেই

যে ভূত আসে একথা ক্ষিতীশ হলপ করে বলতে পারল না, কিন্তু ঠিক রইল সেদিন রাতে যদি ক্যাশঘরে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ ওঠে তাহলে ক্ষিতীশ উঠে এসে ঘণ্টার দড়ি ধরে টানবে।

দুরু দুরু বুকে সে-রাতে সকলে আমরা শুতে গেলুম। দাদামশায় বললেন —দ্বারকানাথ ঠাকুরের ক্যাশঘর বাবা! ওখানে কি আছে কিছুই বলা যায় না। দেখ্‌ কি বেরয়!

উত্তেজনায় আমাদের চোখে ঘুমই আসতে চায় না। তারপর নানান ভাবনা ভাবতে ভাবতে কখন আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। কত রাত হয়েছে, ঘুমের মধ্যে শুনি দাদামশার গলা—ওরে ওঠ্‌, ক্ষিতীশ ঘণ্টা টেনেছে।

ধড়মড় করে উঠে বসলুম। তারপর চুপি চুপি পা টিপে-টিপে সকলে মিলে হাজির হলুম দাদামশার শোবার ঘরে। দিদিমা দেখলুম জেগেছেন। বলছেন —তুমি একলা যেও না। চরিত্রাকে সঙ্গে নাও। দাদামশার ঘরের পূব জানলা দিয়ে নীচে ক্ষিতীশের ঘর আর ক্যাশঘর দুই-ই দেখা যায়। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম নীচের বারান্দা আর তার গোল গোল থামগুলো ফিকে চাঁদের আলোয় আর অন্ধকারে থম থম করছে। ঠিক সেই সময় ক্যাশ-ঘরের দিক থেকে হঠাৎ একটা ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ উঠে আমাদের হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

ক্ষিতীশ তখনও কলতলায় দড়ি হাতে দাঁড়িয়ে। আর একবার সে ঘণ্টার দড়িতে টান দিলে। আমরা কলতলার জানলার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে ক্ষিতীশকে বললুম—শুনেছি। তৈরী থাকো, আমরা যাচ্ছি।

চরিত্রা একটা বেঁটে মোটা লাঠি হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো; আমরাও যে যা পারি নিলুম। তারপর সকলে খালি পা করে অন্ধকারের মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে চললুম নীচে নেমে। দাদামশায়ও চললেন তাঁর বাঁকা লাঠি হাতে আমাদের সঙ্গে। ক্রমে যখন প্রায় কলতলার কাছে নেমে এসেছি, আবার সেই ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ।

দাদামশায় চরিত্রাকে বললেন—চরিত্রা এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌ তো!

চরিত্রা সাহসী ছিল। চট্‌ করে কলতলা ছাড়িয়ে কাছারিখানার কাছ

থেকে উঁকি মেরে ফিরে এল। ক্যাশঘরের দরজার কাছে ছায়ামূর্তি বা ঐ ধরনের কিছুই সে দেখতে পেলে না।

তারপর সাহসে ভর করে আমরা দল বেঁধে এগলুম। কিন্তু নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে। শেষে ক্যাশঘরের সামনে এসে আমরা দাঁড়ালুম। সেই সময় আবার ঝন্ ঝন্ শব্দ। এবার রীতিমত জোরে—আমাদের একেবারে চমকে দিয়ে। ভয়ে আমরা পরস্পরের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালুম। শব্দটা ক্যাশঘরের মধ্যে থেকে আসছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কি সর্বনাশ! ভিতরে লোক আছে নাকি? গাঁইতি দিয়ে কিছু ভাঙছে? ঢুকলোই বা কি করে? দিব্যি তো তালা ঝুলছে লোহার দরজায়? তবে কি সত্যিই সুড়ঙ্গ কেটে ঢুকেছে? না, সমস্তটাই ভৌতিক ব্যাপার? এইসব প্রশ্ন এলো সবার মনে।

ক্যাশঘরের তালা খোলা সাব্যস্ত হল। কে যেন আলো জ্বালতে চাইলো। দাদামশায় বারণ করলেন। বললেন, ভূত পালিয়ে যাবে।

যতদূর সম্ভব শব্দ না করে এবং আলো না জেলেই সেই মর্চে-পড়া তালা আস্তে আস্তে আমরা খুলে ফেললুম। ঠিক সেই সময় ঝন্ঝন্ ঝন্ঝন্ শব্দে সমস্ত ক্যাশঘর যেন কেঁপে উঠল। ভয়ে পিছিয়ে গেলুম সকলে। কিন্তু দাদামশায় দেখি ফস্ করে একটা দেশলাই জেলে ফেলেছেন। ক্যাশঘরের খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল দ্বারকানাথের কাঁচের বাসনের আলমারির পাল্লা ফাঁক করে এয়া বড় এক ইঁদুর তার লম্বা ল্যাজ মাটিতে লুটিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। ক্ষিতীশ, চরিত্রা আর আরেক জন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দেশলাই জেলে দেখা গেল, বাসনের আলমারির মধ্যে আরো দুটো ধেড়ে ইঁদুর। সে দুটোকে তাড়িয়ে আলমারি খুলতেই অল্প আলোয় দ্বারকানাথের ডিনার সেট্ চকচক করে উঠল। ড্রেসডেন আর মাইসেন্ থেকে আনানো কোন্ যুগের জিনিস এখনও নতুনের মতো। ভারি ভারি প্লেটগুলোকে ইঁদুরে দাঁতে করে টেনে তুলছিল আর ফেলছিল। আলমারির মধ্যে থেকে সেই আওয়াজ বার হচ্ছিল যেন লোহার দরজা ভাঙ্গার শব্দের মতো। এই ব্যাপার তাহলে?

খুব খানিকটা হাসাহাসি হল, তারপর দাদামশায় বললেন—এ কি যে-সে

জিনিস ? দ্বারকানাথের প্লেট—আওয়াজ কি ! বাড়ি সুদ্ধ মানুষকে ঘুম থেকে টেনে তুলেছে।

এইসব সূক্ষ্ম কারুকার্যে ভরা কাঁচের বাসন আর ড্রেস্‌ডেনার-মাইস্‌নার চায়নার কথা বাড়ির কর্তারা ভুলেই বসেছিলেন। কারুর মনেই ছিল না এমন সম্পদ ঐ এঁদো-পড়া ঘরের মধ্যে ধুলো চাপা পড়ে আছে। তারপরদিন বাসনগুলোকে বার করে ধুয়ে মুছে দোতলার বারান্দায় নিয়ে গিয়ে তিন দাদামশার সামনে সাজানো হল। অনেকদিন পরে পূর্বপুরুষদের সম্পত্তির উপর চোখ বুলিয়ে তিনজনেই খুব আনন্দ পেলেন। তারপর ঠিক করলেন, ওগুলোকে ক্যাশঘরে আর না রেখে নিজেরাই ঘরে সাজিয়ে রাখবেন, মাঝে মাঝে ব্যবহার করবেন। তিন ভাগে ভাগ হয়ে তিন দাদামশার ঘরে চলে গেল জিনিসগুলো।

ক্যাশঘরে ভূতের উপদ্রব বন্ধ হল। ইঁদুরগুলো কেন যে ঐ প্লেটগুলোকে নিয়ে মাঝরাতে অমন পাগলামি করত জানি না। দ্বারকানাথের জীবদ্দশায় তিনি কত যে এলাহি ডিনার-পার্টি দিয়েছিলেন তার লেখাজোখা নেই। তারই গন্ধ লেগে আছে নাকি ঐ প্লেটগুলোর গায়ে ? এতদিনেও ধুয়ে মুছে যায়নি ? কে জানে ?

॥ ১৮ ॥

দাদামশার তালাবালি বাবুর্চি একবার দেশে গেল, আর ফিরল না। চিঠি এল, তালাবালি মারা গেছে। দাদামশারা যৌবনে যে বাবুর্চির হাতে রান্না খেতেন তার নাম ছিল নবীন। সে ছিল মস্ত বাবুর্চি। আমরা তাকে কোনো-দিন দেখিনি, কিন্তু নবীন বাবুর্চির এলাহি রান্নার যে-সব গল্প শুনতুম, তাতে আমাদের মুখ হাঁ হয়ে যেত। এই নবীন বাবুর্চির 'মেট' ছিল তালাবালি। নবীনের দেখে দেখে এবং নিজের বুদ্ধিবলে তালাবালি কিছু কিছু মোগলাই এবং সাহেবী খানা পাকাতে শিখেছিল। নবীনের পরে তাই তালাবালি বাহাল হল বাবুর্চির পদে।

আমরা জিজ্ঞেস করতুম—দাদামশায়, তুমি তো নবীনের রান্না খেয়েছ, তালাবালিরও খেয়েছ—কে ভালো রাঁধে?

দাদামশায় বলতেন—নবীনের কাছে কি তালাবালি? কত বড় বাবুর্চি সে! আবার এটাও বলতেন, নবীন ছিল বড় বড় পার্টি দেবার বাবুর্চি। বাইরের লোক ডেকে ঘর সাজিয়ে টেবিলের উপর চাদর বিছিয়ে কাঁটা চামচ ছুরি প্লেট গুছিয়ে রীতিমত জমকালো ভাবে খেতে বসলে তবে নবীনের রান্নার আসল তার পাওয়া যেত। সে সব দিনও আর নেই, সে সব প্রথাই গেছে উঠে। ঘরে বসে নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া ভাবে কনুই-এর উপর হাতা গুটিয়ে তারিয়ে তারিয়ে মোগলাই খানা বা সাহেবী ডিনার খেতে হলে তালাবালির রান্নাই ভালো।

সেই তালাবালির সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল রাধুর। রাধু কোনোদিন তালাবালির কাছে রান্না শেখেনি, রাধু তালাবালির 'মেট'ও ছিল না। সন্ধেবেলায় দাদামশার থালা-বাসন সাজিয়ে রাধু তালাবালির বাবুর্চিখানায় গিয়ে দাঁড়াতো। রাধু এলে তালাবালি বাটি ভরে মুর্গির স্টু আর রেকাবি ভরে পুডিং দিত। রাধু তাই নিয়ে আসত দাদামশার খাবার ঘরে। তালাবালির মৃত্যুর পর এটি বন্ধ হল। বাবুর্চি ছাড়া আমাদের একজন ঠাকুরও ছিল অবশ্য আর এক মহলে—সেখানে দেশীয় প্রথায় সোনা মুগের ডাল, সুক্তো, মাছের কালিয়া প্রভৃতি রান্না হত। দাদামশার জন্যে দু জায়গা থেকেই আসত খাবার। ঠাকুরের খাবারে দাদামশার অরুচি ছিল না বটে, কিন্তু দু-বেলা শুধু 'বামনাই' খাবারও পছন্দ করতেন না। সন্ধেবেলায় ওরই সঙ্গে কিছু পদ বাবুর্চিখানা থেকে না আসলে খাওয়াটা পরিপূর্ণ হত না। তাই তালাবালি গিয়ে অসুবিধে হল দাদামশার।

রাধু ছিল অতি সজাগ চাকর। চট্ করে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে শুরু করে দিলে দাদামশার জন্যে বিদেশী কেতায় রান্না। রান্নায় নতুন হাত হলেও কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল রাধু বেশ রাঁধছে তালাবালির স্টাইল-এ। তালাবালির কাছে বহুদিন ধরে আনাগোনা করে করে নিজের অজান্তেই কেমন করে যেন রাধু মোগলাই রান্নার ধরণ-ধারণগুলো শিখে গিয়েছিল।

তারপর রাধু যেদিন এসে বললে—বাবু, তালাবালি কমলালেবু দিয়ে একরকম জেলি করত, লেবুটা কাটলে আধখানা সাদা আর আধখানা লাল বেরিয়ে পড়ত, সেটা করতে পারছি না—তখন দাদামশায় মহা উৎসাহ পেয়ে গেলেন। বল্লেন—দাঁড়া তোকে আমি 'অরেঞ্জ ব্লুম' করা শিখিয়ে দিচ্ছি।

মিসেস বীটন-এর 'কুকারি-বুক' বেরল আলমারি থেকে! তাতে দেখা গেল রাধু যেটাকে জেলি বলছে সেটা আসলে জেলি নয় মোটেই। সেটা বরফে জমানো দু-রঙা 'কর্ন-ফ্লাওয়ার' পুডিং। শিখে নিল রাধু চট করে।

এই ঘটনার পর দাদামশার মাথায় ঢুকলো রান্না। লাইব্রেরী থেকে আরো রান্নার বই বেরল। রন্ধন-বিদ্যা পড়া শুরু করলেন। বাংলা রান্নার বই যোগাড় করলেন। মুসলমানী রান্নার কেতাব কিনলেন। 'হাজার জিনিস' বইটা কিনলেন— তাতেও একটা রান্নার পরিচ্ছেদ আছে। রাধুকে পড়ে পড়ে শোনাতেন। বুঝিয়ে দিতেন কিসের পর কি করতে হবে। নিজে গিয়ে উঠে দেখে আসতেন রান্না কেমন এগোচ্ছে। রাধু রীতিমত শিক্ষানবিশী শুরু করে দিলে দাদামশার কাছে। দেখতে দেখতে সে পাকা রাঁধিয়ে হয়ে উঠল। তালাবালি গিয়ে যে অভাবটা ঘটেছিল সেটা রাধু এবার পূর্ণ করে ফেললে।

আমরা আর একদিন সেই পুরোনো প্রশ্ন করেছিলুম—আচ্ছা দাদামশায়, রাধু কি তালাবালির মতো রাঁধে না তার চেয়েও ভাল রাঁধে?

দাদামশার এবারকার উত্তরটা ঠিক আগের মতো। বললেন—তালাবালি ছিল বাবুর্চি আর এ হল বিষ্টুপুরের ছোকরা। এক কখনও হয়? তবে হ্যাঁ, আমার মুখের স্বাদটি ঠিক বুঝে নিয়েছে।

তারপর বললেন—রান্না যেই করুক সে নিজের মতো রাঁধবে। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। পর-রুচির বদলে আপ-রুচি। যতই সে শিখুক না গুরুর কাছে, নিজের ঢং ফুটে বেরবেই। রাঁধছে দেখে মনে হবে পরের জন্যে রাঁধছে—হয়তো প্রকাণ্ড ভোজের পর্ব, তাই ধরেছে হাতা-বেড়ি—কিন্তু আসলে মনে-মনে রান্না তার নিজেরই জন্যে। নিজের মনের মত না হলে তার রান্নাই

হবে না।•এই হচ্ছে ভালো রাঁধিয়ের গুণ। রাধু এই দলের। তালাবালি ছিল এই দলের ; নবীনও এই দলের।

এত বড় সার্টিফিকেট রাধুকে কেউ দেয়নি।

দাদামশায় বলেন—আয় একটা রান্নার ক্লাস খোলা যাক। তোরা সব শিখবি। তারপর দেখিস এক-একজনের হাত থেকে এক-একরকমের রান্না বেরুচ্ছে। সব নিজের নিজের মতো।

আমরা যে আবার রাঁধতে শিখে পাকা রাঁধুনি হয়ে যাবো, একথা বিশ্বাস করাই আমাদের পক্ষে শক্ত। কাঁচা কাঁচা জিনিসগুলো আমাদের হাতে পরিপক্ক হয়ে সুস্বাদু ভোজ্যে পরিণত হবে এ যে অভাবনীয় ব্যাপার। যাই হোক, আমরা উৎসাহ পেয়ে সব যোগাড়যন্ত্র করে ফেললুম। ঘুঁটে দিয়ে উনুন ধরাবার বিদ্যে আমাদের কারো জানা ছিল না। তা ছাড়া ওসব ধোঁয়া টোঁয়া বাদ দিয়েই রান্না শিখতে পারলে ভালো হয় এই মনে করে কেরোসিনের স্টোভ নিয়ে এলুম। একতলার দক্ষিণের বারান্দায় দোলনার বাগানের পাসে আমাদের রান্নার ক্লাস খোলা হল। আমগাছের মাথা ছাড়িয়ে জোড়াসাঁকোর পশ্চিম আকাশ যখন অস্তরাগে লাল হয়ে আসছে, ঠিক সেই সময় স্টোভ জ্বেলে সোঁ সোঁ শব্দের মধ্যে শুরু হল আমাদের প্রথম পাঠ! দাদামশায় বললেন—প্রথম দিন হবে শুধু আলু-ভাজা। যে যেমন চায় আলু কেটে ফেলুক।

আমরা কেউ চাকা-চাকা কাটলুম, কেউ সরু সরু, কেউ গোল গোল। কেউ মিহি, কেউ মোটা। ওঃ সেদিন যে কতরকম আলু ভাজা হয়েছিল তা আর কি বলব! কারুর ভাজা হল কড়া-কড়া, কারুর নরম নরম, কারুর মুচমুচে, কারুর মুড়মুড়ে, কারুর দিশী আলু ভাজা, কারুর বিলিতী আলুর 'চিপ্‌স্', কারুর ফরাসী আলুর 'সোতে'; কারুর সোনার মত রং, কারুর খয়েরী মত, কারুর হলদে, কারুর সাদাটে। রকম বেরকম আলুভাজার মেলা বসে গেল। আর খেতে যা ভালো লাগল! তবে আলু ভাজা খেয়ে সেদিন পেট যে রকম ভরে গিয়েছিল তাতে করে রাত্রের খাবার সকলেরই ফেলা গেল।

দাদামশায় এ দিকটা আগে ভাবেননি। রান্নার ক্লাস করলে খাবার নষ্ট

হয়। কাজেই আমাদের শরীর-পুষ্টির জন্যে রোজকার খাবারের ব্যবস্থা করা যাঁদের দায়িত্ব তাঁরা আপত্তি জানালেন। রান্নার ক্লাস প্রচুর উৎসাহ নিয়ে শুরু হলেও বেশী দিন টিকলো না।

কিন্তু দাদামশার ততদিনে রান্নার নেশা লেগেছে। রাধুকে শিখিয়েছেন, আমাদের কিছু কিছু বিদ্যা-দান করেছেন, নতুন ধাঁচের রান্না আবিষ্কার করে ফেলেছেন, কাজেই আর থামতে পারছেন না। রাধুকে অবলম্বন করে বাবুর্চিখানায় ঢুকে দাদামশায় আরো নানারকম রান্নার এক্সপেরিমেণ্ট লাগিয়ে দিলেন। আমরা মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখতুম, গন্ধ শুঁকতুম আর জিভ দিয়ে জল ঝরত। প্রায়ই রান্নার প্রচলিত প্রথাগুলো উল্টে দিতেন। যেখানে প্রথমে পেঁয়াজ ভাজবার কথা সেখানে ভাজতেন শেষে। যেখানে সাঁতলাবার কথা শেষে সেখানে রান্না শুরু করতেন মাছ-তরকারি সাঁতলে নিয়ে। যেখানে সিদ্ধ করবার কথা সেখানে ভেজে ফেলতেন। যেখানে ভাজবার কথা সেখানে সিদ্ধ করতেন। তারপর এইসব উল্টো প্রক্রিয়ার বিপরীত ফলগুলো সামলাতেন নতুন নতুন উপায় আবিষ্কার করে। আরো কত কি সব করতেন। এইভাবে মুর্গির মাছের ঝোল আর মাছের মাংসের-কারি বার করেছিলেন।

এমনি করে যখন রান্না নিয়ে দাদামশায় মেতে আছেন বেশ কিছুদিন, সেই সময় আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা একটা ক্লাব করার কথা ভাবছিল। ঠাকুর বাড়িতে এমনি ক্লাব কত হয়েছে ভেঙেছে তার ঠিক নেই। কত বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এবং কত সময় উদ্দেশ্য ছাড়াই সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে বাড়ির এবং আশপাশের মানুষেরা যে ওটা এমন কিছু নতুন জিনিস নয়। তবে এবারকার প্রচেষ্টার নতুনত্ব হচ্ছে এই যে ক্লাবটা প্রায় উদ্দেশ্যহীন হলেও ক্লাবের একজন সভাপতির কথা ভাবা হচ্ছে যিনি সশরীরে বর্তমান থাকবেন। কবি জসীম উদ্দীন হচ্ছেন এই ক্লাবের সভাপতির পদপ্রার্থী। আর কোনো প্রার্থীই নেই, তাই জসীম উদ্দীনের খুব ইচ্ছে তিনিই যাতে ঐ পদে নির্বাচিত হন। ক্লাবের সভ্যেরা জানিয়েছেন, ভালো করে না খাওয়ালে জসীম উদ্দীনকে তাঁরা সভাপতির পদে ভোট দেবেন না। জসীম উদ্দীনের তাই মহা চিন্তা, ঠাকুর বাড়ির ছেলেমেয়েদের কি খাইয়ে পরিতুষ্ট করা যায়?

জসীম উদ্দীন বললে—দেখ সকলে, আমি হচ্ছি গ্রামের মানুষ, গেঁয়ো কবি। আমি তো আর রাজভোগ দিতে পারব না। আমি যা খাওয়াবো তাই খেয়েই তোমাদের খুশী হতে হবে।

সকলেই বললে—বেশ তো তাই হোক।

জসীম উদ্দীন তখন আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে বাজার করতে বেরল। ভাল ঘী কিনলে, তেল কিনলে, চিনি কিনলে, ময়দা, সুজি, আলু, বেগুন, কিস্‌মিস্‌, বাদাম, দই, সন্দেশ ইত্যাদি নিয়ে পুরোপুরি রাজসিক না হোক ব্যবস্থা বড় মন্দ হল না।

তারপর রান্না চড়লো। সকলে মিলে আমরা যে যা পারি হাত লাগালুম। রাধু এসে একবার দেখে কি করতে হবে না-হবে বলে গেল। ভুরভুরে গন্ধে ভরে উঠল জোড়াসাঁকোর বারান্দা। শেষে রান্না সারা হলে বসে গেল সবাই পাত পেতে। খেলে সবাই আনন্দে পেট ভরে। কিন্তু ভোট দেবার সময় দেখা গেল কেউ ভোট দিতে চাইছে না। সবাই বেঁকে বসেছে। কী ব্যাপার? না, খাওয়া তো খুব ভালই হয়েছে, তবে এ খাবার অন্য যে-কেউ খাওয়াতে পারতো। জোড়াসাঁকো বাড়ির ছেলেমেয়েদের ক্লাবের সভাপতি হবার মতো খাওয়ানো হয়নি!

বেচারী জসীম উদ্দীন! অত কষ্ট করলে, খাটলে খুটলে খরচ-পত্র করলে, তার কি না এই ফল? ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের খুশি করা কি এতই শক্ত!

জসীম উদ্দীন মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—দাদামশার চোখে পড়ল। দাদামশায় বল্লেন—কি হে, জসীম উদ্দীন? রান্না করলে, খাওয়ালে, কই বললে না তো আমাকে!

জসীম উদ্দীন বললে—ছোটদের খাওয়াচ্ছিলুম দাদামশায়।

দাদামশায় বললেন—তাই তো দেখলুম। তবে শুনছি খরচ-পত্র নাকি তোমার বৃথাই গেল, ব্যাপার কি?

জসীম উদ্দীন তখন সব খুলে বললে। বললে—দাদামশায়, আপনাদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের মন পাওয়াই ভার।

দাদামশায় বললেন—এই কথা? কি রান্না হয়েছিল শুনি?

জসীম উদ্দীন একটা লম্বা হিসেব দিলে।

—কি কি কিনেছিলে? সব লেগে গেছে রান্নায়?

—আজ্ঞে, সব লাগবে কি করে? আমি কি আর রান্নার হিসেব বুঝি? অনেক কিছু বাড়তি হয়েছে।

—বেশ দেখি কি বেঁচেছে। নিয়ে এস তোমার বাড়তি জিনিস!

জমীস উদ্দীন্ জিনিসগুলি নিয়ে এলে দাদামশায় বললেন—বলে দাও সকলকে কালকে আবার খাওয়ানো হবে। তোমার এই বাড়তি যা আছে এই দিয়েই আমি রাঁধবো—কিচ্ছু ফেলা যাবে না, একটু গুঁড়ো পর্যন্ত নয়। জানিয়ে দাও কাল জোসী কাবাব খাওয়ানো হবে।

একটা সাড়া পড়ে গেল। জোসী কাবাব—সে আবার কি? জসীম উদ্দীনের জোসী কাবাব—সবাই আমরা উৎগ্রীব হয়ে রইলুম।

তারপর দিন জসীম উদ্দীনের সেই খানিকটা বাড়তি সুজি, খানিকটা বাড়তি বাদাম, আরো সব যা ছিল তাই নিয়ে রাঁধতে বসলেন দাদামশায়। আমরা রইলুম অপেক্ষা করে। কাবাব তৈরী হতে লাগল—জোসী কাবাব!

অবশেষে দাঁড়ালো সবাই সারি বেঁধে হাতে এক একটা খুরী নিয়ে। প্রত্যেকের জন্যে এক-একখানা গরম গরম জোসী কাবাব। তার বেশী আর কুলোলো না। আমাদের মুখে সেই কাবাব লাগলো অপূর্ব। এবারে আর জসীম উদ্দীনকে ভোট দিতে কেউ আপত্তি করলে না।

দাদামশার সেই জোসী কাবাব আর কোনোদিন রাঁধা হয়নি। হবে কোত্থেকে? তার ফরমুলা তো কোনো রান্নার বইয়ে নেই। তাতে কি কি কতখানি করে লেগেছিল তাও কেউ মনে রাখেনি। ঐ একবারই হয়েছিল, আর তার ফলে জসীম উদ্দীন জিতে গিয়েছিল তার ভোটে।

জোড়াসাঁকো বাড়িতে ছোট-লাট কিংবা কোনো উর্ধ্বতন সায়েব রাজ-পুরুষের আগমন ঘটলে যখন সিঁড়িগুলোকে কার্পেট মুড়ে ফেলা হত তখন আমরা খুব ছোট। হঠাৎ খবর এসে যেত লর্ড কারমাইকেল কিংবা রোনল্ড্‌শে আজ তিনটের সময় দাদামশাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। দেখা করতে আসার প্রধান উদ্দেশ্য নতুন ছবি-টবি কি আঁকা হল তাই দেখা, তার উপর গল্পগুজব আর ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টস্ নিয়ে যদি কিছু কথা থাকে সেই সব আলোচনা। তখনকার এইসব সায়েবরা শিল্পরসিক ছিলেন। ভাল ছবির কদর বুঝতেন আর বুঝতেন জলজ্যান্ত পরিচিত শিল্পীর হাতের তৈরী টাটকা জিনিস দেখার মূল্য। সেটাকে দুর্লভ সৌভাগ্য বলেই মনে করতেন।

বড়-লাটের মধ্যে আসতেন লর্ড রেডিং আর লর্ড মণ্টেগু। মণ্টেগু সায়েব দাদামশার 'সাজাহানের মৃত্যু' ছবিখানা দেখে একেবারে মুগ্ধ। চোখ আর ফিরতে চায় না। দাম জানতে দাদামশায় বললেন—ও ছবি তো বিক্রি করবার উপায় নেই—পারিবারিক সম্পত্তি হয়ে গেছে। তবে সায়েব তুমি ভেবো না। আমি ঐ ছবিই তোমায় আর একখানা করে দেব। মূল ছবিটি ছিল তেলের রঙে আঁকা। কিন্তু সে সময় দাদামশায় জলের রঙে হাত পাকিয়েছেন। তাই ছবিটিকে নকল করলেন জলের রং দিয়ে। জলের রংএ আঁকা সাজাহানের সেই ছবি অদ্ভুত উতরোলো। অনেকেই যাঁরা দেখেছেন সে ছবি তাঁরাই বলেছেন মূল ছবির চেয়েও নাকি সেটা আরো ভালো হয়েছিল। ছবিটি চলে গেল মণ্টেগু সায়েবের সঙ্গে বিদেশে সায়েবের নিজস্ব সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত হত। নিজের ছবির নকল দাদামশায় ঐ একটিই করেছিলেন। আর কখনও করেন নি।

এই সব লাট-বেলাটের আগমন সংবাদে বাড়িতে সাজ-সাজ রব পড়ে যেত। কাঠের প্রকাণ্ড সিঁড়িটা ঘষে ঘষে চকচকে করা হত। তার উপর পড়ত কার্পেট। গাছ-ঘর থেকে টেনে বার করা হত টব-লাগানো পাম গাছ।

টবের ধুলোকাদা ঝেড়ে তাদের সাজানো হত সিঁড়ির তলায়, দেউড়ির ধারে। লাইব্রেরী ঘরে ঝাঁট পড়ত। সায়েবরা সেখানেই বসতেন। আমাদের, মানে ছোটদের উপর হুকুম জারি হত ঐ সব দিক না মাড়াবার, কোনোরকম গোলমাল না করার। আমরা যতটা সম্ভব উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখতুম। দেখতুম দাদামশারা লম্বা লম্বা জোব্বা পরছেন। লাইব্রেরী ঘরের নীচু টেবিলের উপর চুরুটের বাক্স রাখা হচ্ছে—তাতে বর্মা চুরুট। দাদামশার আর বড়দাদামশার নতুন আঁকা ছবিগুলি কাগজের ঢাকনার মধ্যে একপাশে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। আলমারির মাথায় একটা ব্রোঞ্জের কালো দক্ষিণ ভারতীয় নটরাজ মূর্তি ছিল, সেটাকে সামনে এনে বসানো হচ্ছে। আজকাল যেমন ঘরে ঘরে পিতলের সস্তা নটরাজ সাজানো দেখা যায় তখনকার দিনে দাদামশারাই একমাত্র এর কদর বুঝতেন। কোথা থেকে যেন নিখুঁত এক নটরাজের নৃত্যপর মূর্তি সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

সায়েব অতিথিরা এসে পড়লে আর আমাদের কোনোমতেই সেদিকে যেতে দেওয়া হত না। কিন্তু সায়েবরা চলে গেলে পরে আমরা বাড়ির সাজানো গোছানো অংশটায় ঢুকে পড়তুম। টবের পাম-গাছের আড়ালে লুকোচুরি খেলতে অথবা সিঁড়ির কার্পেটের উপর স্রেফ বসে থাকতে কি ভালই লাগত। তারপর সন্ধের সময় লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে পড়তুম। রোজকার লাইব্রেরী ঘর একটু আধটু সাজানোর ফলে একেবারে নতুন লাগতো। লাইব্রেরী ঘরের আসবাবপত্র দাদামশারা নিজেদের রুচিমত গড়েছিলেন। একদিকে জাপানা মিস্ত্রী কাসাহারা আর অন্য দিকে আচারিয়া নামে এক দক্ষিণ-ভারতীয় মিস্ত্রী। এই দুই জাতীয় নৈপুণ্যের সংমিশ্রণে লাইব্রেরী ঘর ধীরে ধীরে এক নতুন রূপ নিয়েছিল। আচারিয়াকে দিয়ে দাদামশারা নিজেদের ডিজাইনে নীচু তক্তপোশ, চেয়ার, টেবিল, আলমারি করিয়েছিলেন। কাসাহারাকে দিয়ে দেয়ালের গায়ে কাঠের ফ্রেমে 'শীতল পাটি' লাগিয়ে দেয়াল ঢেকে দিয়েছিলেন। লাইব্রেরী ঘরের মেঝেতে ফরাশ, জাজিম, শতরঞ্জি, কার্পেটের বদলে পেতেছিলেন বেত-বোনা বড় বড় কাঠের ফ্রেম। তার উপর ছিল কয়েকটা কাঠের ঠেস আর তাকিয়া। গরমের

সময় তাতে শুয়ে পড়তে যা আরাম হত। এই সমস্ত নতুন উপায়ে দেশী কায়দায় ঘর সাজানোর প্রথা ছিল দাদামশাদের নিজস্ব। যে সমস্ত রুচিসম্পন্ন সায়েবরা জোড়াসাঁকো বাড়িতে আসতেন তাঁরা ভারি পছন্দ করতেন আমাদের লাইব্রেরী ঘরের পরিবেশকে। তাঁরা ভারতের বড় বড় রাজা-রাজড়ার গৃহেও আমন্ত্রিত হয়ে যেতেন বটে কিন্তু এমন অনাড়ম্বর অথচ রুচিময় মৌলিক গৃহসজ্জা আর কোথাও দেখতে পেতেন না। কত্তাবাবা যখন আরো অনেক পরে উত্তরায়ণকে সাজাতে শুরু করেন তখন সেখানকার আসবাবপত্র, দেয়াল, মেঝে, তাকিয়া, বালিশ সব কিছুর সজ্জার প্রেরণা এসেছিল জোড়াসাঁকো বাড়ির দাদামশাদের লাইব্রেরী ঘর থেকে।

কেন যে ঘরটাকে লাইব্রেরী ঘর বলা হত আমরা জানতুম না। কোনোদিন প্রশ্নও করিনি। আমরা যখন দেখেছি তখন সে ঘরে কোনো লাইব্রেরী নেই। পরে শুনেছিলুম অনেক কাল আগে ছিল। ঐ ঘরের উত্তরদিকের এক-তৃতীয়াংশ জোড়া ছিল একটা স্নান-ঘর। দক্ষিণ দিকের বাকি অংশটায় দাদামশাদের বাবামশায়ের ছিল একখানি সাজানো গোছানো লাইব্রেরী। ঘরটা ছিল বিলিতী কায়দায় সাজানো। সেই স্নানের ঘর ভেঙে দাদামশারা ঘরটাকে উত্তর-দক্ষিণ খোলা একখানা প্রকাণ্ড হল্-এ পরিণত করেছিলেন। আর সেই ঘর দেশী প্রথায় সাজাবার জন্যে এনেছিলেন কাসাহারা আর আচারিয়াকে। লাইব্রেরীর বই আর আলমারিগুলিকে সেই সময় অন্যান্য নানা ঘরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কত্তাবাবা যখন লালবাড়িতে 'বিচিত্রা' ক্লাব খোলেন তখন দাদামশাদের লাইব্রেরীটা চলে গিয়েছিল বিচিত্রায়।

লাইব্রেরী ঘরের পূব দিকের দেয়ালে যে গোল জানলা দাদামশারা তৈরি করিয়েছিলেন সেই জানলার নীচে একটুখানি কোণ। কোণটিকে ঘিরে কাঠ দিয়ে বাঁধানো বসবার জায়গা। সাহেবরা চলে গেলে সেইখানে গিয়ে আমরা বসে পড়তুম। জানলার ধারে যেন রেলগাড়ির সীটের মতো জায়গাখানি। গোল জানলার ভিতর দিয়ে দেখলে দেখা যেত প্রকাণ্ড শিশুগাছটা। শিশুগাছের মোটা গুঁড়িখানা মাটি থেকে খানিকটা উঠেই যেন দু-হাত মেলে দু-পাশে ছড়িয়ে গেছে। এই দুহাতের মাঝখান দিয়ে পূব

আকাশে চাঁদ উঠত। এই দুই ডালের মাঝখানের যে দুটি শাখাকে দাদামশায়েরা কাসাহারাকে দিয়ে কাটিয়ে চাঁদ ওঠার আকাশটাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন আর যার ফলে চাঁদ উঠলে পূব দিকের আকাশটাকে প্রকাণ্ড মনে হত, সেই কাটা ডাল দুটিকে এনে করাত দিয়ে কেটে পালিস করিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলেন ঐ গোল জানলার ধারের বেঞ্চির গায়ে। শিশুগাছের সেই ডালের সীট-এ বসে পড়ে জানলা দিয়ে পূব আকাশে উঁকি দিতে আমাদের বেজায় ভালো লাগত।

এর অনেকদিন পরে, দাদামশাদের পুরীর বাড়ি তখন বিক্রি হয়ে গেছে, জোড়াসাঁকো বাড়ির আগের মতো অত আর জাঁকজমক নেই, শোনা গেল কে যেন একজন আসছেন। লাট-বেলাট নন, তবে বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি। দুঃখী বেহারার কাছে তখন কার্পেট জমা থাকত। সে বেচারা মুখ শুকিয়ে এসে দাদামশাদের বললে—হুজুর, সিঁড়ির কার্পেট ছিঁড়ে গেছে। ইঁদুরেও কেটেছে অনেক জায়গায়।

শুনে দাদামশার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সকলেই জানেন অতবড় সিঁড়ি-ঢাকা কার্পেট ছিঁড়ে গেলে আর একখানা নতুন কার্পেট কেনার কোনো প্রশ্নই এখন আর ওঠে না। ধীরে ধীরে মাসের থেকে মাস, বছরের থেকে বছর প্রাচুর্য লোপ পাচ্ছে দাদামশাদের জোড়াসাঁকো বাড়ি থেকে। দাদামশারা মনে মনে জানতেন সে কথা। তা হলেও কথাটা ভুলে থাকতেই ভালো লাগত। ও নিয়ে বিশেষ আলোচনা হত না। কার্পেটের অভাবটা এমনভাবে ঘোষিত হওয়ায় শূন্যতাটা চোখের সামনে হঠাৎ এগিয়ে এল। দাদামশায় কিন্তু বললেন—ভালই হয়েছে। কার্পেটে শুধু ধুলো জমত। অমন চমৎকার কাঠের সিঁড়ি আমাদের—লোকে দেখুক এবার।

বলে সিঁড়ির কাছে গিয়ে সিঁড়ির ঠিক মাথায় উত্তর দিকে একটা বেশ বড় কাঠের গণেশ-মূর্তি বসিয়ে দিলেন।

আশ্চর্য ব্যাপার! সিঁড়ির চেহারাটাই সঙ্গে সঙ্গে অন্যরকম হয়ে গেল। ঐ এক গণেশেই কার্পেটের অভাব ঘুচিয়ে দিলে।

কার্পেট গেল, গালিচা গেল, দ্বারকানাথের আমলের ঝাড় লণ্ঠন ছিল,

কেই বা তার তদ্বির করে, সে-ও গুদাম-জাত হল। আয়না, সেজ একে একে সরে গেল। কিন্তু রয়ে গেল আমাদের লাইব্রেরী ঘর। লাইব্রেরী ঘরে রইল আচারিয়ার হাতের মজবুত কাঠের অপূর্ব আসবাব, মোটা বেতের ফ্রেমে ঘেরা পূব কোণের গোল জানলা আর তার নিবিড় কোণটি বেঞ্চি আর টুল দিয়ে সাজানো। লাইব্রেরী ঘরের দেয়ালে রইল নন্দ-দার আঁকা বড় বড় অজন্তার গুহাচিত্রের নকল আর সেগুন কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো কিছু অনবদ্য রাজপুত চিত্র। আর রইল প্রকাণ্ড এক লোহার বাক্সে ভরা 'টেগোর কালেক্‌শান'—মোগোল, রাজপুত, কাংড়া চিত্রাদি এবং অন্যান্য নানা শিল্প-সামগ্রী যা দাদামশারা তিন ভাইএ অতি যত্নে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। লাইব্রেরী ঘর রইল তার ঐতিহ্য নিয়ে তার নিজের অধিকারে উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে।

এই সময় কত জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী, সুরকার, গায়ক, কবি, লেখক, অভিনেতা, নৃত্যবিদ্, কত নামকরা বিখ্যাত লোক যে জোড়াসাঁকোয় এসেছেন গেছেন আর লাইব্রেরী ঘরে বসে আপ্যায়িত হয়েছেন তার আর ইয়ত্তা নেই।

আমরা ছোটরা একদিন লাইব্রেরী ঘরের উত্তর দিকের তক্তপোশটায় বসে আছি। কত্তাবাবার একখানা নতুন গান সুজন বসে বসে অভ্যেস করছে আর আমরা শুনছি, এমন সময়—

—এই চুপ্, চুপ্! কে আসছে!

সুজনের গান হঠাৎ থেমে গেল। আমরা দেখলুম কাঠের সিঁড়ি দিয়ে একজন সায়েব এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে আস্তে আস্তে উঠে আসছেন। লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে তিনি একটু ভয়ে ভয়ে বললে—এটাই কি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি? দরজার কাছে কাউকে দেখতে না পেয়ে এবং দরজা খোলা পেয়ে আমি নিজেই সাহস করে উঠে এসেছি।

জোড়াসাঁকোর দরজা বলা বাহুল্য চিরকালই অবারিত। আগে তবু কয়েকজন দারোয়ান থাকত বসে, পরে দারোয়ানের সংখ্যা এমন-ই নিম্ন হয়ে এসেছিল যে সব সময় দ্বার রক্ষা করা সম্ভব হত না।

সায়েব বিভ্রান্ত। আমরা দাদামশাকে খবর দিতে যাই, সায়েব বলে, রোসো এ কোথায় এলুম আগে একটু সমঝে নিই। বলে আস্তে আস্তে বেত-

মোড়া তক্তপোশের উপর এসে বসল। হাত দিয়ে দিয়ে অনুভব করল তার আসনকে, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হয়ে দেখতে লাগল দেয়ালের গায়ে ছবি, টেবিলের উপর মূর্তি, আলমারি, চেয়ার সব কিছু। তারপর বললে—বাড়ির বাইরে থেকে কিচ্ছু বোঝবার যো নেই। ঢুকেই দেখি এক মস্ত সিঁড়ি—প্রথমটা দু-ভাগ হয়ে উঠে শেষে এক হয়ে মিশে উপরে উঠেছে। সিঁড়ির মাথায় এক অপূর্ব মূর্তি। তারপর এই ঘর! কোথাও কোনো বৈচিত্র্য নেই, এত সহজে এমন আশ্চর্যভাবে সাজানো ঘর আমার দেশে বা এদেশে বা কোনো দেশে দেখিনি।

উত্তর আর দক্ষিণ দিকের বড় দরজা দুটোর মাথায় সরু সাদা টালি বসিয়ে পাড় দেওয়া ছিল। সেই টালিতে দাদামশায় উর্দু লেখার ধাঁচে উপনিষদের কিছু বাণী কাঁচের অক্ষরে লিখিয়ে দিয়েছিলেন।

তদ্ এতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ
সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদ্ অয়ম্ আত্মা।

এই ছিল এক দরজার পাড়ে লেখা। আর অন্য দরজার পাড়ে ছিল—

সত্যা ন্ন প্রমদিতব্যং, ধর্ম্ম ন্ন প্রমদিতব্যং কুশলা ন্ন প্রমদিতব্যং।

সায়েবের চোখে পড়তেই সে লাফিয়ে উঠেছে।

এমনি করে তোমরা দরজার পাড় সাজাও নাকি?

আমরা বুঝিয়ে বলতে সায়েবের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।

—অবনীন্দ্রনাথের হাতের লেখা এত সুন্দর? তিনি ছবির মত লেখেন।

ইতিমধ্যে দাদামশাকে খবর দেওয়া হয়েছিল। দাদামশায় এসে তাকে টেনে নিয়ে গেলেন দক্ষিণের বারান্দায়। বললেন—ছবি আঁকতে আঁকতে গল্প করা যাবে সায়েবের সঙ্গে। পরে শুনেছিলুম দাদামশায়ের সুইডিশ বন্ধু মূলার সাহেব তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দাদামশার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

এর পর আরো অনেক দিন গেছে। লাইব্রেরী ঘরে ধুলো জমে। চাকর সব সময় ঝাঁট দেয় না। ফাঁকি দেয়। দেখা শোনা তদ্বির করার লোক আগের মত আর নেই। আমাদের চোখে লাইব্রেরী ঘর পুরোনো হয়ে গেছে, কিন্তু

বাইরের লোক এখনও ঢুকে অবাক হয়ে দেখে। সেই সময় কয়েকজন জাপানী আর্টিস্ট দাদামশাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

দাদামশাদের যৌবনে তখনকার দিনের বিখ্যাত সব জাপানী আর্টিস্ট তাঁদের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে আসতেন। কত বন্ধুত্ব ছিল তাঁদের সঙ্গে দাদামশাদের। সুরেনদাদা কাউণ্ট ওকাকুরার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। দাদামশাদের সঙ্গে আলাপ হবার পর ওকাকুরা বলেন, তিনি দেশে ফিরে জাপানী শিল্পীদের পাঠিয়ে দেবেন ভারতবর্ষে। দেখে যাক আর আলাপ করে যাক তারা ভারতীয় শিল্পীদের সঙ্গে। সেই সূত্র ধরে এল টাইকান আর হরি। যে টাইকান আজ জাপানের দিগ্‌গজ শিল্পী। টাইকান এসে বহু রাসলীলার ছবি এঁকেছিলেন। হরি বেচারা জাপানে ফিরে গিয়ে কম বয়সেই মারা যায়। দাদামশায় বলতেন—বাঁচলে হরি টাইকানেরই মত বড় আর্টিস্ট হত। তারপর বড়দাদামশায় আনিয়েছিলেন নিজ খরচে কাট্‌সূটুটা নামে আর এক জাপানী শিল্পীকে। সেই একই সময় কত্তাবাবা আনালেন সানোসান নামে এক কুস্তিগীরকে। সানোসান চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে ছেলেমেয়েদের যুযুৎসু শেখাতে, আর কাট্‌সূটুটা রয়ে গেলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। সেইখানে থেকেই তিনি ছবি আঁকতেন। বড় বড় সিল্ক-এর উপর রামায়ণের অনেক দৃশ্য তিনি এঁকেছিলেন। কাট্‌সূটুটা যখন জাপানে ফিরে গেলেন জোড়াসাঁকোতেই বড়দাদামশার কাছে রয়ে গেল সে-সব ছবি। তারপর প্রশ্ন উঠল ছবিগুলিকে ভাল করে রক্ষা করার কথা। সে এক সমস্যা। এ দেশের পোকারা জাপানী রেশম পেলে আর কিছু চায় না। ফুটো করে শেষ করে দেয়। তাদের হাত থেকে ছবিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যে অবিচ্ছিন্ন সতর্কতা এবং আয়াস দরকার তা যোগাবে কে? শেষে জাপান থেকে বলে পাঠালো, তারাই নিয়ে যাবে ছবিগুলিকে। তাদের মিউজিয়ামে তদ্বিরের অভাব হবে না। আঠারো হাজার টাকা দাম দিয়ে কিনে নিয়ে গেল সেই সব ছবি। রাখলো সযত্নে। কিন্তু বেশীদিনের জন্যে নয়। টোকিও শহর যেবার আগুনে পুড়ে যায় সেবার ঐ সঙ্গে ছবিগুলিও গেল। পোকার হাত থেকে অগ্নিগর্ভে।

তখনকার দিনের এই সব জাপানী শিল্পীরা সেদিনকার জোড়াসাঁকো বাড়ির ঐশ্বর্যভরা ঝলমলে চেহারা দেখে গেছেন। জোড়াসাঁকোর বাগান দেখে গেছেন যখন ছিল সে বাগান সাজানো গোছানো ঝক্‌ঝকে! বাবুরা চড়তেন তখন জুড়িগাড়িতে। ল্যাণ্ডো, ব্রুহাম, ফিটন, গোলগাড়ি, পালকি-গাড়ি আর তাদের উপযুক্ত ঘোড়া, কোচম্যান সহিসে ভরা ছিল জোড়াসাঁকো। সেদিনকার সেই সব জাপানী আর্টিস্টের সূত্র ধরেই বোধ হয় এরাও আজ উপস্থিত। দাদামশাদের বয়েস বেড়েছে, মাথায় টাক পড়েছে। সেই সঙ্গে জোড়াসাঁকো বাড়িরও বয়েস বেড়েছে, তারও মাথায় পড়েছে টাক, গাল গেছে তুবড়ে। আগে প্রতি বছর বাড়ি রং হত, আজকাল অত বড় বাড়ির প্রত্যেক অংশ একসঙ্গে সারিয়ে সুরিয়ে রাখার কথা ভাবাই যায় না। এদিকের দেয়াল থাম কড়িকাঠ চুন বালি দিয়ে সারিয়ে দেওয়া হল তো ওদিকের পাঁজরা পড়ল বেরিয়ে। এইভাবেই ঠেকা দিয়ে চলত।

জাপানী আর্টিস্টরা লাইব্রেরী ঘরেই এসে বসল। গল্প করল অনেকক্ষণ। ছবি টবি দেখানো হল তাদের। তারপর তারা বললে—এইবার তারা দাদা-মশাদের ফটো তুলবে।

কোথায় তোলা যায় ছবি? ঠিক হল বাগানে গিয়ে তুলতে হবে। সেদিনের সাজানো বাগান তো আর নেই। সবই পড়ে আছে অযত্নে। কিন্তু যাই হোক বাগান তো! দাদামশারা চললেন নীচে নেমে।

জাপানীরা বললে—আপনাদের ছবি তুলবো বাড়িকে সুদ্ধু নিয়ে। বাড়িটাকে করব ব্যাক্‌ গ্রাউণ্ড। দাদামশারা বললেন—বেশ তো সায়েব, এ বাড়ি যদি তোমাদের পছন্দ হয়, তোলো তাহলে তাই।

জাপানীরা একটা মনোমত কোণ খুঁজতে শুরু করলে। আর পেয়েও গেল একটা। দোলনার বাগানের ঠিক সামনে ছিল একটা হাইড্র্যাণ্ট্‌। তার থেকে সব সময় ভলকে ভলকে গঙ্গাজল বেরিয়ে একটা নর্দমা বেয়ে বাগানটাকে ঘিরে দপ্তরখানার দিকে চলে যেত। সেই হাইড্র্যাণ্ট্‌-এর সামনে যে-কটা থাম আর দেয়াল, সে-কটার অবস্থা বড় শোচনীয়। নোনা লেগে এখানে ওখানে বালি ঝরে গেছে, তার উপর চড়াই পাখিতে ঠুকরে ঠুকরে

আরো জিরজিরে করে দিয়েছে। জায়গায় জায়গায় ইঁট বেরিয়ে হাঁ হাঁ করছে —বহুকাল সারানো হয়নি। দক্ষিণ-পূবের দেয়ালগুলোর মধ্যে সেইখানটাই বোধ হয় সকলের চেয়ে জীর্ণ এবং দুঃস্থ। জাপানীরা দেখে লাফিয়ে উঠল। বললে—চমৎকার ব্যাক গ্রাউণ্ড পাওয়া গেছে। দেখুন কেমন জলের স্রোত। কি সুন্দর দেয়ালের গায়ে আলো-ছায়ার খেলা। আর ঐ ফাটলের মধ্যে গাছের সবুজ চারাটি। আপনারা ঐখানটায় যদি দয়া করে দাঁড়ান। ক্যামেরা হাতে নিয়ে জাপানীরা খুশিতে উপচে পড়লো।

দাদামশায় খানিকটা অবাক হয়ে দেখে বললেন—ব্যাটাদের চোখ আছে তো! আচ্ছা জায়গা খুঁজে খুঁজে বার করেছে। বুদ্ধিস্ট কি না, তাই অশথ গাছের চারাটির উপর পছন্দ।

সেইখানে দাঁড় করিয়ে দাদামশাদের যে ছবি তুললো জাপানী আর্টিস্টরা, পরে আমরা সে ছবি দেখেছিলুম। তাঁরা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অপূর্ব সে ছবি। সেই থেকে জোড়াসাঁকো বাড়ি যতই ভেঙে পড়ুক আমাদের আর কোনো দুঃখ হত না। আর দেয়ালের ফাঁকে জাপানী শিল্পীদের প্রশংসিত সেই অশথগাছের চারাকে উপড়ে ফেলবার কথাও আমরা কোনোদিন ভাবতে পারতুম না।

॥ ২০ ॥

একদিকে আমাদের যেমন ছিল দু-আলমারি আর্টস-এর বই, তেমনি আর একদিকে ছিল দু-আলমারি সায়েন্সের বই। আর ছিল গদ্য এবং পদ্য-সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন এবং প্রবন্ধ এই সবের বই। সারি সারি সবসুদ্ধ কতকগুলি আলমারি যে ছিল কোনোদিন আমরা গোনবার চেষ্টা করিনি। দাদামশারা অনবরত বই কিনে যেতেন। তিন দাদামশায়-ই। যেমন বই জমা হত লাইব্রেরীতে তেমনি ঐ অগাধ বই-এ ধুলোও জমা হত। আর আমাদের উপর ভার পড়ত ধুলো ঝাড়বার। দাদামশারাই করে দিয়েছিলেন,

বন্দোবস্তটা। অঙ্কের মাস্টারমশার উপর আরোপ করেছিলেন দায়িত্ব। বলে দিয়েছিলেন, ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে কাজটা করিয়ে নিতে।

পুজোর ছুটির ক'দিন আগে আমাদের বাড়ির স্কুলের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যেত। দপ্তরখানা থেকে কয়েকটা ঝাড়ন আসত। প্রত্যেকে একটা করে নতুন ঝাড়ন হাতে নিয়ে আমরা লেগে যেতুম কাজে মাস্টারমশার সঙ্গে। বইগুলিকে আলমারির তাক থেকে নামিয়ে মেঝের উপর সারবন্দী করে সাজিয়ে হাওয়া লাগানো হত। তারপর মাস্টারমশার নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেকটি বই ঝেড়ে পুঁছে আবার ফিরিয়ে রাখা হত আলমারির তাকে। ছোট-বড় সব ছাত্রছাত্রীরা এতে হাত লাগাতুম। ছুটির আগে কী ভালই যে লাগত কাজটা। দাদামশায় এই সময় একখানা বেঁটে টুল নিয়ে আমাদের সামনে বসে এ বই ও-বই চেয়ে দেখতেন, আর আমাদের এটা পড়বি, ওটা পড়বি বলে উৎসাহ দিয়ে চলতেন। ছেলেবেলা থেকেই এই করে আমরা বই ঘাঁটতে শিখেছি। কোনো কোনো সময় দাদামশায় আর না পেরে একখানা বই তুলে নিয়ে বলতেন—এটা পড়ে আজ তোদের শোনাবো সন্ধেবেলা।

সায়েন্সের বই। আমাদের পড়ে শোনাবার পক্ষে সর্বোপযুক্ত বই। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের নানারকম উপাদেয় সুখপাঠ্য বই। ফরাসী প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ফাবার-এর বহু লেখা দাদামশায় আমাদের শুনিয়েছেন। আর শুনিয়েছেন মেটারলিঙ্ক-এর মৌমাছির জীবনী, জোনাকি পোকার জীবনী। সমুদ্রের তলাকার জলজ-জীবদের রোমাঞ্চকর বিবরণ—যার থেকে 'ভূতপত্রীর দেশ'-এর বিচিত্র চরিত্র কালা-কানা-আংলা-টানা, গামলা-চালা ফোঁপরা-জালা ঘণ্টাকর্ণ রক্তশোষা-মাথায়-ছাতা, শুঁড়-দুলদুল কাঁচু-মাচুর সৃষ্টি। ভূপৃষ্ঠের কাহিনী আর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গল্প।

একদিন শোনালেন এরোপ্লেন আবিষ্কারের প্রথম যুগের ইতিহাস। যখন বৈজ্ঞানিকেরা পাখির মত ডানায় ভর করে আকাশে ওড়বার চেষ্টা করছে, সেই সময়কার কথা। কত চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু পারেনি। এক সায়েব তো দু-কাঁধে ডানা বেঁধে পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে হাত-পা ভেঙেছিলেন। এইভাবে পাখির মত ওড়বার চেষ্টা বিফল হওয়ায় শেষে তৈরী হল এরোপ্লেন।

দাদামশায় বই মুড়ে রেখে বললেন—আবিষ্কারের দিক থেকে দেখতে গেলে এরোপ্লেন কিছুই নয়। কটা লোকের কাজে লাগে? আকাশে ওড়ার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকেরা এখনও পর্যন্ত কিছুই করতে পারেনি। জমিতে চলার কথা যদি বলিস্—এ যুগের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার বাইসিকেল।

আমরা বললুম—সেকি! রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, এসব কিছু নয়?

—ও ঐ এরোপ্লেনের মতো। কোনোটাই সহজ নয়, কোনোটাই সহজলভ্য নয়। অথচ বাইসিকেল ঘরে-ঘরে। মানুষটা প্রায় হেঁটেই যাচ্ছে জমির উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে আর পাঁচটা জন্তুর মত, কিন্তু চলেছে কত জোরে দেখ। তেল দিয়ে নয়, কয়লা দিয়ে নয়, পা দিয়েই ঠেলছে কলটাকে। সহজ, হাল্কা, সস্তা কেমন গড়গড়ানি কলখানি।

দাদামশার যুক্তি আমরা সবাই মেনে নিলুম। তখন বললেন—আমরা একটা ঐরকম সহজ কল আবিষ্কার করব, যা সক্কলের কাজে লাগে। বলা যায় না তো, লক্ষপতিও হয়ে যেতে পারি!

আমরা বললুম—কি কল?

—ধুতি কোঁচানোর কল।

—ধুতি কোঁচানোর?

—প্রত্যেকের কাজে লাগবে। কত সময় বাঁচবে, কত হাঙ্গামা বাঁচবে। হাতে করে ধুতি কোঁচানো কি সহজ? কলে করে ফেলতে পারলে চুকে গেল। নিয়ে আয় কতকগুলো ঝাঁটার কাঠি, একটা মডেল তৈরী করা যাক।

তখনকার দিনে প্রত্যেক সামাজিক অনুষ্ঠানে, নিমন্ত্রণে, পরিপাটি করে কোঁচানো চাদর, কোঁচানো ধুতি পরে যাওয়ার রীতি ছিল। পুজো-পার্বণের সময় বাড়ির প্রত্যেক বাবুর জন্যে একখানা দুখানা করে ধুতি-চাদর কোঁচাতে বসত চাকরেরা মাদুরের উপর গোড়ালির নীচে কাপড় চেপে ধরে। বহু সময় যেত তাতে। গলায় কোঁচানো চাদর না ঝুলিয়ে বা আটপৌরে প্রথায় ধুতি পরে কোনো অনুষ্ঠানে যাবার চেষ্টা করলে আমরা ভয়ানক বকুনি খেতুম, যেন মহা অসামাজিক পাপ-কর্ম করে ফেলছি। কাজেই কোঁচানো ধুতি সবারই চাই—কি ছেলে, কি বুড়ো!

আমরা ঝাঁটার কাঠি আনবার জন্যে দৌড়াচ্ছি, বললেন—রোস্। এক কাজ কর্। তোদের দিদিমার ঘরে আলমারির উপর একটা জাপানী হাতপাখা আছে, সেইটে নিয়ে আয়।

ছেঁড়া হাতপাখাটা নিয়ে আসতে, দাদামশাই তার উপর যতটুকু জাপানী কাগজ বাকি ছিল, সব ছিঁড়ে ফেললেন। পাখার বারোখানা শিক বেরিয়ে পড়ল। একটুকরো ছেঁড়া কাপড় নিয়ে সেই বারোখানা শিকের একটার উপর একটার নীচে দিয়ে টেনে ধরলেন। তারপর পাখাখানা মুড়ে ফেলতেই কুঁচিয়ে গেল কাপড়ের টুকরোখানা।

দাদামশায় বললেন—এই হচ্ছে ব্যাপার। মতলবখানা বুঝলি তো? হাতপাখার মডেলটা মাথায় রেখে একটা কল তৈরি করে ফেলতে হবে, যেটার একদিক দিয়ে ধুতি-চাদর ঢুকিয়ে দিয়ে কল ঘোরালেই অন্য দিক দিয়ে কোঁচানো হয়ে বেরিয়ে আসবে।

মনশ্চক্ষে পরিষ্কার দেখতে পেলুম আমরা কলটা। শুধু আবিষ্কার করে ফেললেই হয়। ঝাঁটার কাঠি আর লোহার তার হাতে নিয়ে জাপানী পাখার মডেলটা মাথায় রেখে লেগে গেলুম আমরা সকলে।

সেদিন অবিনাশবাবু আসতেই দাদামশায় জানিয়ে দিলেন, কি নিয়ে পড়েছি আমরা। —কি অবিনাশ, ধুতি কোঁচাবার কল তোমাদের বরানগরে বিক্রি হবে তো?

দাদামশার বন্ধু এই অবিনাশ চক্রবর্তীর গল্প 'পথে বিপথে' বইতে আছে। অবিনাশবাবুর সঙ্গে দাদামশায় স্টীমারে চড়ে বাবুঘাট থেকে এঁড়েদার শিবতলা পর্যন্ত গঙ্গার হাওয়া খেয়ে একসময় নিয়মিত বেড়াতেন। আমরাও কতবার গেছি দাদামশার সঙ্গে এই স্টীমার সফরে। অবিনাশবাবু এসে উঠতেন প্যান-দোক্তা নিয়ে। দাদামশায় একটা মোটা বর্মা চুরুট ধরিয়ে বসতেন স্টীমারের সামনের অংশে। গল্পে গুজবে আর হাসিতে জমিয়ে রাখতেন প্রৌঢ়ের দল সামনের সেই অংশ। পথে বিপথের বহু গল্পই এই স্টীমার অভিযানকে নিয়ে লেখা। অবিনাশবাবুর সঙ্গে আমাদের বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের প্রচুর সৌহার্দ্য ছিল। তিনি আমাদের নক্শা-করা রুমাল

উপহার দিতেন, রং-করা ছবি এঁকে দিতেন। অবিনাশবাবুর হাতে প্রায়ই দু-একখানা কালো চামড়ার বাঁধানো খাতা থাকতো। এই খাতার পাতায় তিনি সরু কলমের রেখা আর ক্রেয়নের রং দিয়ে ছবি এঁকে আনতেন। ছবিগুলির নীচে লেখা থাকত নানারকম উক্তি, এখান থেকে ওখান থেকে উদ্ধৃত করা। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে, উপনিষদ থেকে, মহাভারত থেকে, শেক্সপীয়র গ্যেটে কাণ্ট থেকে, হিন্দী দোহার থেকে অথবা নিজেরই মন থেকে। ভারি মজার সেই সব লেখা। দাদামশায়কে দেখতে দিতেন খাতাগুলো। দাদামশায় নিজের মন্তব্য লিখে দিতেন পাতার নীচে। একটা কালো ডালে হলদে বুক লাল ডানা এক পাখি ঠোঁট উঁচু করে বসে আছে। তার নীচে অবিনাশবাবু লিখছেন—

Sir John Forbes, M. D., F. R. S., physician to Her Majesty Queen Victoria says—Some patients get well with the aid of machine more without it, and still more in spite of it.

একটি ঘন নীল পাখি ঠোঁটে করে চেপে ধরেছে হলদে রং-এর একটি বীচি। তার নীচে লিখছেন—হরিনাম ঠকুঠকালে হবে কি? তোমার মনের ভিতর ময়লা পোরা, মুখে তোমার কচ্‌কচি। এমনি সব।

অবিনাশবাবু বললেন—বরানগরে এক-শ কল বিক্রি করে দেব আমি একা। লোক লুফে নেবে।

শুনে ভারি খুশী হয়ে উঠলুম আমরা। উৎসাহও পেয়ে গেলুম। এইবার কলটা আবিষ্কার করে ফেললেই হয়। কিন্তু কাজে নেমে দেখা গেল, ভারি শক্ত ব্যাপারটা। ঝাঁটার কাঠি নিয়ে নাড়াচাড়া হয়, কিন্তু কাজ এগোয় না। কল-জাতীয় কিছুই তৈরি হয় না কাঠিগুলি থেকে। ঝাঁটার কাঠি যেমন, তেমনিই পড়ে থাকে। না দাদামশার হাত থেকে বেরয় কিছু, না আমাদের মাথা থেকে।

আমাদের উৎসাহে যখন মন্দা এসে গেছে সেই সময় শুনলুম, সামনের বাড়িতে এক মস্ত ইঞ্জিনীয়ার এসেছেন রাধারমণ রায়। মস্ত বড় আবিষ্কর্তাও বটেন তিনি। এক ধরনের মল-শোধক তৈরি করেছেন, তাতে গন্ধ হয় না,

খারাপ হয় না, নল বন্ধ হয়ে যায় না, জলও বেশী লাগে না। খুব সহজে তৈরী করা যায়। সস্তা অতি। শান্তিনিকেতনের বাড়ি বাড়ি এই মল-শোধক লাগানো হচ্ছে। আরো কি সব তিনি নিজের মাথা থেকে বার করেছেন। আমরা শুনে লাফিয়ে উঠলুম। দাদামশার কানে তুলে দিলুম কথাটা। দাদামশায় আমাদের নিয়ে হাজির হলেন রাধারমণ রায়ের কাছে। আমরা এতদিন ধরে যে কল করবার জন্যে এত চেষ্টা করছি, তার কথা তিনি মন দিয়ে শুনলেন। শুনে বললেন—এ পারব না কেন? নিশ্চয়ই করে দিতে পারব ধুতি কোঁচানোর কল।

আমরা নিশ্চিন্ত হলুম। অত বড় ইঞ্জিনীয়ার যখন ভার নিলেন, তখন হয়ে যাবে একটা সুরাহা। কিন্তু আমাদের কপাল! শুনতে পেলুম রায় সাহেব কলটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, কিছু কিছু এগিয়েও যাচ্ছেন কিন্তু সমস্যার পুরো সমাধান হচ্ছে না। শেষে বহুদিন অপেক্ষা করে থাকবার পর হঠাৎ একদিন খবর এল, রায় সাহেব মারা গেছেন। আমাদের সমস্ত আশা নির্মূল হয়ে গেল।

আমাদের লাইব্রেরীর বহু পড়ুয়া ছিল। শুধু যে বাড়ির লোকেরাই বই পড়তেন তা নয়, লাইব্রেরী থেকে বই চেয়ে পড়তে নিয়ে যেতেন বন্ধুবান্ধবরাও অনেকে। সব সময় সব বই ফেরত আসত না। হারিয়ে যেত, ভুলেও যেতেন অনেকে। হয়ত ইচ্ছে করেই নিজের কাছে রেখে দিতেন কেউ কেউ। মাস্টারমশায়ের কাছে চাবি থাকত বলে তিনি অনেক সময় মনে করে বলে দিতে পারতেন কে নিয়ে গেছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা সম্ভব হত না। একসঙ্গে অনেকে নিয়ে গেলে মনে রাখা শক্ত হত। বেশীদিন ফাঁক পড়লেও আস্তে আস্তে ভুলে যেতেন। যাই হোক, এইভাবে খুব বেশী ক্ষতি কোনোদিনই আমাদের লাইব্রেরীর হয়নি। অতবড় লাইব্রেরীর পক্ষে এমনি মাঝে মাঝে দু-চারখানা বই খোয়া যাওয়ায় বিশেষ কিছু এসে যেত না। কিন্তু একবার হল কি, ইতিহাসের আলমারি থেকে কারলাইল-এর গোটা ফরাসী বিদ্রোহের ‘সেট্’টাই উধাও হয়ে গেল।

অত্যন্ত মূল্যবান সেট্, এক সঙ্গে অনেকগুলো বই, দাদামশাদের অতি

প্রিয় পুস্তক, সহজে পাওয়াও যায় না। সবাই ভারি বিচলিত হলেন। ইতিহাসের আলমারির চাবি অনেকদিন থেকে খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে আলমারিটা খোলাই পড়ে থাকত। খুব কমই ব্যবহার হত ওটা। দাদামশায় মাঝে মাঝে আইন-ই-আকবরী পড়তেন। বাইরের পড়ুয়ারা কোনোদিন ইতিহাসের বই চাইতেন না। সেই কারণে চাবিটাও সারানো হয়ে ওঠেনি।

মাস্টারমশায় একজন চাবিওয়ালা ডাকিয়ে একটা নতুন চাবি করিয়ে নিলেন। কিন্তু দাদামশায় বললেন—ওটা আমায় দিন। খোলাই পড়ে থাক তাকটা। বইগুলো যে-দিক দিয়ে গেছে সেইদিক দিয়েই আবার ফিরে আসবে।

বই চুরি চাকর-বাকরে করে না। ভদ্রলোকে করে। আমাদের সন্দেহ গিয়ে পড়েছিল একজন ভদ্রলোকের উপর, তিনি সে-সময় জোড়াসাঁকোয় যাওয়া-আসা করতেন। লাইব্রেরীর আলমারির কাছেও তাঁর আনাগোনা ছিল। দাদামশায় বললেন—উনি যেদিন আসবেন আমায় একটু খবর দিস্।

দু-একদিনের মধ্যেই এলেন ভদ্রলোক। নীচের ঘরে এসে তিনি বসেছেন, সেই সময় দাদামশার প্রবেশ। আমরা ততক্ষণে সবাই এসে জুটেছি। বেশ বড় রকম আড্ডা। দাদামশায় একটা চেয়ারে ধপ্ করে বসেই বললেন—আবার সেই ব্যাপার। '—' ঠাকুরের ছবি নড়ে গেছে। সূর্যগ্রহণের পরের বছর হয়েছিল। ফের হল। ছবি নড়া দেখেই আমি বুঝেছি কিছু একটা ঘটেছে। তারপর সমর-দার কাছে শুনলুম কারলাইল্ চুরি গেছে।

আমরা অবাক হয়ে দাদামশার মুখের দিকে তাকালুম।

দাদামশায় চুরুট ধরিয়ে বললেন—কারলাইল-এর সেট্ চুরি গেছে তোরা জানিস্ না ?

—জানি, কিন্তু ছবি নড়ে গেছে বলছ, সে আবার কি ?

—দেখে আয় গে। '—' ঠাকুরের অত বড় অয়েল পেন্টিং দেয়ালের গায়ে দু-ইঞ্চি হেলে গেছে। দাগ দেখলেই বুঝতে পারবি। সেবারও ঐ

কারলাইল নিয়ে কাণ্ড। সেবার তো চুরি যায়নি, হরিশ চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল পড়তে। তিন চার দিন রেখেছে নিজের ঘরে। এদিকে ছবি নড়ে গেছে কখন আর ওদিকে স্বপ্ন টপ্ন দেখে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে হরিশ যায় আর কি! তখন তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে গেল ঐ সেটশুদ্ধ বইগুলো। '—' ঠাকুরের কেনা ঐ সেট। সারারাত জেগে পড়তেন। পড়তে পড়তে অসুখে পড়েন। তারপর মারা যান। বই শেষ হয়নি, তাই ওঁর ছবি করিয়ে বাবামশায় ঐ হিস্ট্রির বই-এর আলমারির সামনে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। সমরদা-কে বললুম—বুড়ো এতদিন ধরে আলমারির সামনে বই আগলেছে, ও কি ছাড়বে? ঠিক আদায় করে আনবে নিজের বই। আলমারিটা আবার মাস্টারমশায় চাবি বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন। বললুম—না না খোলা রেখে দিন।

আমরা ছুটলুম উপরের ঘরে দেখে আসতে '—' ঠাকুরের ছবি কি রকম নড়ে গেছে। গিয়ে দেখি সত্যিই সরে গেছে ছবিটা। দেয়ালের গায়ে ঝুল-কালি পড়া কালো অংশটা বেরিয়ে পড়েছে। সেই ভদ্রলোকও শুনলেন গল্পটা। গল্পই বা কেন? চোখের সামনে ছবি সরে যাওয়ায় প্রমাণ রয়েছে। '—' ঠাকুরের ইতিহাস অনেকেরই জানা ছিল না। ছবি নড়ে যাওয়ার ফলে মুখে মুখে বেশ ছড়িয়ে পড়ল কাহিনীটা।

আমরা শুধু সন্দেহই করেছিলুম। কোনো প্রমাণ ছিল না যে, সেই ভদ্রলোকই সরিয়েছিলেন বইগুলো। আজ অবধি আমরা কেউ জানি না কার কাজ। কিন্তু যিনিই নিয়ে থাকুক '—' 'ঠাকুরের ছবি নড়ে যাওয়ার দু-দিন পরেই কারলাইল-এর ফরাসী বিদ্রোহের ইতিহাস—পুরো সেটখানা—যেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছিল ঠিক সেই তাকে ফিরে এল '—' ঠাকুরের ঝুলোনো ছবির ঠিক সামনেটিতে।

মাস্টারমশায় এসে ইতিহাসের আলমারিতে চাবি মেরে দিলেন। দাদামশায় একটু হেসে সটকার নলটা মুখে দিয়ে হুকুম দিলেন—ওরে ছবিখানাকে ঠেলে যেমন ছিল ঠিক করে দে।

'এস্‌পার ওস্‌পার' পালা হয়ে চুকলো কিন্তু তার ছাপ রেখে গেল জোড়াসাঁকো বাড়ির সর্বত্র। কর্তা গিন্নী থেকে আরম্ভ করে ঝি-চাকর পর্যন্ত সবাই দেখেছিল সে পালা। প্রাণ ভরে উপভোগ করেছিল সবাই। এর আগে যত-কিছু রঙ্গাভিনয় হয়েছে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, তার কোনোটারই মত নয় এটা। নাট্যশাস্ত্রের প্রচলিত কোনো আইন-কানুনই মেনে চলেনি অথচ কি-করে যে এমনভাবে মাতিয়ে রাখল আমাদের সবাইকে—দর্শক এবং অভিনেতাদের, সেটাই এক বিস্ময়।

দাদামশায় বল্লেন—নাট্যাভিনয়ের সারবস্তু আবিষ্কার করে ফেলেছি আমরা। এ ছাড়া নয়। দেখা যাক এই পথে চলে আর কিছু পাওয়া যায় কিনা। এই বলে দাদামশায় যাত্রা লেখায় মন দিলেন। ছবি আঁকা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। এ সময় বোধহয় আট দশ বছর ছবি আঁকেননি। তুলি কাগজ ছোঁননি একবারও।

বেন্‌থল সাহেব দাদামশাদের পুরোনো বন্ধু। আর্ট সোসাইটির পাণ্ডা একজন। একজিবিশন থেকে দাদামশায়দের এবং ছাত্রদের ছবি কিনেছেন কত। তিনি বুড়ো হয়ে রিটায়ার করে চলে গেছেন বিলেতে। তাঁর ছেলে এসেছেন ভারতবর্ষে। ছেলে বাপের কাছে কত শুনেছে ঠাকুরবাড়ির কথা। বাপের সংগ্রহে কত ছবি দেখেছে, কত তারিফ করেছে। তাই কলকাতায় এসে প্রথমেই ছুটে এসেছে দাদামশার কাছে। মনে মনে কল্পনা করে এসেছে দেখবে এক প্রাচীন শিল্পীকে তুলি আর রংএর রাজ্যে। চিত্ররসে ভরপুর। এসে দেখে কোথায় কি? রং-তুলির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। হাতে এক খেরো-বাঁধানো জাব্দা খাতা নিয়ে খুদে খুদে অক্ষরে কি সব লিখে চলেছেন। পাতার পর পাতা।

সায়েব জানতে চায়—মিস্টার টেগোর কি আজকাল ছবি আঁকেন না?

দাদামশায় সংক্ষেপে জবাব দেন—না।

সায়েব নানা রকম গল্প করে। আর্ট-এর গল্প। কি কি ছবি দেখেছে, কোথায় দেখেছে, বলে। দাদামশায়ও তাকে কত কি শোনান। হাসি ঠাট্টা চলে। তারপর সায়েব হঠাৎ বলে ওঠে—মিস্টার টেগোর! আপনার মন তো যুবকের মত সতেজ। আপনি বুড়ো হননি একটুও। তবে কেন ছবি আঁকা ছেড়ে দিলেন? আপনার অতবড় প্রতিভা কি··· ?

দাদামশায় বাধা দিয়ে বলেন—বুড়ো হইনি, কিন্তু বয়েস বেড়েছে আর সেই সঙ্গে অভিজ্ঞতা। দেখলুম ছবি-টবি কিছু নয়। ছেলেমানুষি। গভীরতর রসের সন্ধানে নেমেছি। নানারকম শব্দ বাজিয়ে বাজিয়ে দেখছি কি-রকম চিত্র ফুটে ওঠে মনের মধ্যে। বাংলা জানলে সায়েব তোমায় শুনিয়ে দিতুম আমার যাত্রার পালা একখানা।

সায়েব বললেন—আপনি যখন যাত্রার পালা করাবেন আমায় খবর দেবেন, আমি এসে শুনে যাবো। কথা না বুঝলেও শব্দ গান অভিনয় এসব বুঝবো।

সায়েব চলে যাবার পর দাদামশায় আমাদের ডেকে বল্লেন—ওরে, বেন্‌থল সায়েবের ছেলে তোদের যাত্রা শুনতে চেয়েছে। লাগিয়ে দে একটা পালা। এই দেখ্ সায়েবের জন্যে ব্যাঙবাঘি লিখে ফেলেছি। বলে শোনালেন—

দ্রুম দদ্দড় দ্রুম ধদ্ধড়
কিপ্‌পোলো কিপ্‌পোলো
যম জয়ন্তীর তোপ পোলো
যম দণ্ড ভঙ্গ হলো
কাল দণ্ড ফাল হলো
ফাল্লোলো
দ্রুম দদ্দড় দ্রুম ধদ্ধড়
কিপ্‌পোলো কিপ্‌পোলো।

এইভাবে চললো যাত্রা লেখা আর যাত্রার গান নিয়ে নানারকম পরীক্ষা। বললেন—কথামালা পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, ঈশপের গল্প এর প্রত্যেকটা বই

থেকেই ভাল যাত্রা লেখা চলবে। এদের গল্পগুলোকে পালায় বেঁধে ফেলা যাক। একটা অধিকারীর ভূমিকা লিখে ফেললেন—

পুরা যাত্রা পালাগান সোয়ান ফাউণ্টেনে
ব্রহ্মার হাঁস লিখে যান লক্ষ শেলাক টেনে।
তৎপরে ককুদ ঘাড় বিশালাক্ষ্য নামে ষাঁড়
শিংএর কলমে লেখে নাট্যাকারে এনে।
বাহুদন্তিল ইন্দ্রগজ বহুকষ্টে মেপে গজ
ছোট করি ছাঁটে তাহা নিজ কানে শুনে।
ছবির রাজা অবিন ঠাকুর ধরে ওটার মান
সাত নকলের আসল রসটা চাখিয়া দেখান
বস্তু এতে পাইবে অল্প কিন্তু আঁট সাঁট—
তৃণের রজ্জুর প্রায় শক্ত এর গাঁট।

প্রথমে ধরলেন কচ্ছপের আকাশে ওড়ার গল্পটাকে। হিতোপদেশের গল্প। পাখী-বন্ধুদের আকাশে উড়তে দেখে কূর্মের ইচ্ছে হল তিনিও উড়বেন। ওড়বার ডানা যে তাঁর নেই এ-কথা বলতে চটেই গেলেন এক-রকম। সংকট বিকট দুই পক্ষী-সুহৃদকে বললেন—জলে ভাসি, আকাশে উড়তে পারব না? লাঠির মাঝখানটা কামড়ে ধরব, তোমরা লাঠির দু-দিক ধরে উড়িয়ে দাও আমাকে আকাশে। একবার উপরে উঠে পড়লে তারপর লাঠির কামড় ছেড়ে দিয়ে সাঁতরে চলব শূন্যে ঠিক দেখে নিও। তারপর সেই উড়নচণ্ডীর কি পরিসমাপ্তি হয়েছিল তা সকলেরই জানা। দাদামশায় পালা লিখে চললেন। নাম দিলেন উড়নচণ্ডীর পালা।

কূর্মের গীত লিখলেন—

যদি পাখীর মত রইত পাখা পারতাম উড়তে
চলে যেতেম সোজাসুজি চাঁদে গর্ত খুঁড়তে।
পা নাই, পাখা নাই, আকাশের নাগাল না পাই
উড়তে গেলে ভুঁয়ে পড়ে থাকি হাত-পা ছুঁড়তে।

ব্যাঙ তার জবাব দিচ্ছে—
এক আঁটি গঞ্জিকা তাতে কিছু ভাঙ্
ছিটে গুলি আর কিছু, কষে মারো টান।
ধুঁয়া করে ছেড়ে দাও
তারপরে উড়ে যাও সটান,
গজিয়ে নিয়ে খেলার চালে
ধুমধামে পাখনা দুখান।
শিবলোক ব্রহ্মলোক—মন চায় যেখান।

শেষে কূর্ম আকাশে ওড়া প্র্যাক্‌টিস্ করছে—

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন
সম্পাতম্ বিপ্রপাতম্
মহাপাতম্ নিপাতম্
বক্রতির্যক তথাচোর্দ্ধং
অষ্টমম্ লঘু সঙ্গকম্।
হাই জাম্প লো জাম্প জগঝম্প
উড়ছি উড়ছি অল্প অল্প উৎপাতন
শেষটাতে চিৎপাতন।

আমরা ঠিক করলুম এই পালাটা আমরা করব। গানে সুর দেওয়া হতে থাকল, রিহার্সালও শুরু হল, কিন্তু তার পর হঠাৎ এক অসুখের হিড়িক এসে যাওয়ায় যাত্রার তোড়জোড় হয়ে গেল বন্ধ। অনেকেই আমরা জ্বরে পড়লুম। জমাট দল ভেঙে গেল। তারপর থেকে একটা না একটা বাধা এসে পড়ায় জোড়াসাঁকোয় আর যাত্রাভিনয় হয়ে ওঠেনি। কত্তাবাবা মাঝে মাঝে খোঁজ করতেন। বেন্‌থল সায়েবের ছেলে যাত্রাভিনয়ের নিমন্ত্রণ না পেয়েই দেশে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু দাদামশায় দক্ষিণের বারান্দায় বসে অবিচ্ছিন্নভাবে যাত্রা লিখে চলতেন, আর আমাদের পড়ে পড়ে শোনাতেন মাঝে মাঝে।

পরশুরামের গল্পগুলো তখন সবে বার হতে আরম্ভ হয়েছে। অমন সরস

গল্প কি হাত-ছাড়া করা যায়? লম্বকর্ণ গল্পটাকে পালায় বেঁধে ফেললেন লম্বকর্ণ পালা নাম দিয়ে। নটবরের গান লিখলেন—

বেলেঘাটা যাত্রাসদনের বংশীবদন অধিকারী
ব্যাণ্ডমাষ্টার লক্ষ্মী নটবর
লিউগী বিউগিল ফ্লুট আর ছাগ-লাগ নরহরি।

ঐ গানেরই শেষে পরশুরামের গড্ডলিকা গ্রন্থের স্বীকৃতি রইল—

লম্বকর্ণ পালা করিল সদরালা
বিনানুমতি রেজিষ্টারী
উইথ্ কম্প্লিমেণ্টস্ টু
গড্ডলিকা প্রিণ্টারী।

জাবালির গল্পটাকে যাত্রার ছাঁদে লিখে নাম দিলেন ঋষি যাত্রা। তুড়ি-জুড়ির গান বাঁধলেন—

দণ্ডকবন থানটি খাসা
সূর্পনাকি রাক্ষসীর বাসা
সেখানে বাবা সমঝে যেও
সাড়া দেবার নাই ডাকলে কেও।
বিরাট রাক্ষস বিরাট কায়
মানুষ ধরে কাঁচাই চিবায়।
শরবনে বসেন বুড়ো শরভঙ্গ
জটামাংসী গাছে জটাই বিহঙ্গ।
খর দূষণ ইল্বল বাতাপী
বহুরূপী তারা কাজ খুন খারাপি।
মারীচ মায়াবী ঘুরে বেড়ায়
রাবণ রাজার হুকুম ফেরায়।
পেলে খায় ঋষির রক্ত চাপ চাপ
বুঝে চল রে বাপ, ওরে আমার বাপ।

তারপর রামায়ণও বাদ পড়ল না। দাদামশার একটা পুরোনো কৃত্তিবাসী

রামায়ণ ছিল। মলাট পত্র ছিঁড়ে গিয়েছিল তার। ধুলো ঝেড়ে সেটাকে বার করলেন। রাধুকে দিয়ে বাঁধালেন সেটা। তারপর সেই রামায়ণের গল্পগুলো একটার পর একটা যাত্রার ঢঙে লিখে চললেন। লিখতেন কাটতেন আবার লিখতেন আর আমাদের পড়ে পড়ে শোনাতেন। আমাদের বেশ লাগত। কিন্তু দাদামশার পছন্দ হত না কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে লেখা এই যাত্রাগুলো। শেষে একদিন বললেন—ধরেছি কোথায় গলদ হচ্ছে। পয়ারে লেখা রামায়ণ থেকে সোজাসুজি যাত্রা হবে না। ওকে আগে পুঁথির মত করে রামায়ণ লিখতে শুরু করে দিলেন দাদামশায়। বহুদিন ধরে পুঁথি লেখা চললো। চাঁইবুড়োর পুঁথি, পোড়া লঙ্কার পুঁথি, হনুমানের পুঁথি, মারুতির পুঁথি, জয়রামের পুঁথি, খুদ্দুর রামায়ণ ইত্যাদি। তারপর এই সব পুঁথি সামনে রেখে রামায়ণ-যাত্রা লিখতে শুরু করলেন।

এমন মেতে উঠেছিলেন সে সময়, কেউ ছবি-আঁকার কথা বললে বিরক্ত হয়ে উঠতেন রীতিমত। বছরের পর বছর চলেছিল এই রকম। একদিন সকাল থেকে লিখে চলেছেন না-থেমে। বেলা হয়েছে। রাধু এসে একবার মনে করিয়ে দিয়ে গেছে, স্নানের সময় হল। তবু থামেননি। সেই সময় দোতলার বারান্দায় সোজা উঠে এল একটি ছেলে। এসেই প্রণাম করল দাদামশায়কে। প্রণাম করেই একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। দাদামশায় চিনলেন। তাঁরই ছাত্রের এক ছাত্র।

লেখা বন্ধ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—কি মনে করে হে?

তরুণ শিল্পী বললেন—আজ্ঞে, আপনার ছবি দেখতে এলুম। বিরক্ত করতে চাইনি। মনে করেছিলুম এসে দেখবো ছবি আঁকছেন। তা দেখছি তো লিখছেন।

হ্যাঁ লিখছি আজকাল। যাত্রার পালা লিখছি।

—তবে আর এক সময় এসে না-হয় দেখে যাবো আপনার ছবিগুলি। বহুদিন আপনার ছবি দেখতে আসিনি।

—ছবি আঁকছি না আজকাল। ছবি কিছু হয়নি।

তখন ছেলেটি আসল কথা পাড়ল।

—আজ্ঞে, আপনার কাছে এসেছিলুম।

—তা তো দেখছি।

—বিলেতে গিয়ে ছবি আঁকার কথা ভাবছি। একটা স্কলারশিপের চেষ্টায় আছি।

দাদামশায় বুঝলেন তার আসল উদ্দেশ্য। বললেন—তা যাও না। আমার কাছে কেন?

ছেলেটি বললে—আজ্ঞে, আপনার একটা সার্টিফিকেট চাই।

দাদামশায় বলে উঠলেন—হবে না হবে না।

ছেলেটি থম্‌কে গিয়ে বলল—আমি ছবি এনেছি। ছবি দেখে তারপর না হয় সার্টিফিকেট দেবেন। আমি তো অমনি চাইছি না।

এই বলে সে ছবির মোড়ক খুলতে যায়, দাদামশায় বললেন—কিচ্ছু দরকার নেই। নিয়ে যাও তোমার ছবি। দেখাতে হবে না। বিরক্ত করো না আর আমাকে।

ছেলেটি চটে গেল। বললে—আমি আপনার ছাত্রের প্রিয় ছাত্র। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন না?

—রেখে দাও তোমার প্রিয় ছাত্র। আমার যাত্রা লেখার ব্যাঘাত কোরো না। রাধু এসে আবার চানের তাগিদ দিয়ে গেছে।

ছেলেটি কি করবে ভেবে পেল না। বললে—আপনি তা হলে চান না দেশের ছেলেরা বিলেতে গিয়ে উন্নতি করুক।

দাদামশায় বললেন—ধেৎ তোর বিলেত। বিলেত যাবি, বল ফুর্তি করতে যাচ্ছি, টাকা ওড়াতে যাচ্ছি। আর্ট শিখতে যাচ্ছি বলিস কেন? আর্ট শিখতে হয়, এখানেই পড়ে থাক।

ছেলেটি মহা খাপ্পা হয়ে গেল। বললে—বেশ তাহলে বুঝলুম আমাদের মত যারা স্ট্রাগল করে আর্ট শিখতে চায় তাদের আপনি কোনই উপকার করবেন না।

—দেখ হে, তুমি বেজায় বেয়াদব। কোনোরকম ভব্যতা জানো না।

বুড়ো মানুষ বসে কাজ করছে, তাকে বিরক্ত করছ। বিনা হুকুমে চেয়ার টেনে বসেছ। এখন যাও আর চটিও না।

ছেলেটি তড়াং করে লাফিয়ে উঠল চেয়ার থেকে। ছিটকে বেরিয়ে গেল আমাদের দোতলার বারান্দা থেকে গজ্ গজ্ করে কি সব বলতে বলতে।

দাদামশায় আমাদের হাঁক দিয়ে বললেন—ওরে দেখ্ কোথায় গেল আবার। মারবে বলে লোক ডেকে আনতে গেল না তো?

আমরা উঁকি ঝুঁকি মেরে ছেলেটিকে আর দেখতে পেলুম না। সেই থেকে বহুদিন তিনি আর জোড়াসাঁকো-বাড়িতে আসেননি।

এই সময় দাদামশার বন্ধু, ছাত্র এবং অন্যান্য অনেকে দাদামশাকে মাঝে মাঝে ছবি আঁকার কথা বলতেন; কিন্তু তিনি যাত্রার খাতা থেকে মুখই তুলতেন না। বেশী বললে বিরক্ত হয়ে যেতেন। দাদামশার রং-তুলি থাকত যে ডেস্কে তার পাশে যে চওড়া কাঠের চেয়ার তাতে তিনি বসা-ই ছেড়ে দিলেন। জার্মান সিলভারের যে গোল গামলাটায় দাদামশার ছবির জন্যে জল ভরা হত সেটা শুকনোই পড়ে থাকত। শেষে রাধু একদিন সেটা উল্টে দিয়ে চলে গেল। এইভাবে কেটে গেল প্রায় বছর আষ্টেক।

শেষে একদিন সকালবেলা দাদামশায় যখন কালো কাঠের বর্মী নকশা-করা চেয়ারটায় হেলান দিয়ে রোজকার নিয়ম মত যাত্রা লিখে চলেছেন, সেই সময় মুকুলবাবু এসে হাজির হলেন জোড়াসাঁকোর বারান্দায়। মুকুলবাবু সে সময় কলকাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল।

মুকুলবাবু এসেই প্রকাণ্ড একটা আধ-আঁকা ছবি বিছিয়ে ফেললেন আমাদের বারান্দার লাল মাটিতে।

দাদামশায় চশমার ফাঁক দিয়ে দেখে নিয়ে বললেন—তোমার মতলবখানা কি হে মুকুল?

মুকুলবাবু বললেন—আজ্ঞে, আপনি আপনার যাত্রা লিখুন, আমি এইখানে বসে ছবি আঁকব। বলে ধপ্ করে বসে পড়লেন মেঝেতে।

মুকুলবাবুকে ছেলেবেলা থেকে চেনেন দাদামশায়। চিরকেলে একগুঁয়ে

মানুষ। •যাতে একবার গোঁ ধরেন ছাড়েন না। বকে ঝকেও কেউ কোনদিন ফল পায়নি। কাজেই মুকুলবাবুকে দাদামশায় ঘাঁটালেন না। যাত্রার পালায় মন দিলেন। শুধু মুকুলবাবুর রং তুলি আর কাগজের এলাহি কাণ্ড লক্ষ্য করে একবার জিজ্ঞেস করলেন—খেয়ে যাবে নাকি মুকুল ?

মুকুলবাবু বললেন—শুধু একটু মাছের ঝোল আর ভাত আর কিছু না।

দাদামশায় রাধুকে ডেকে বলে দিলেন—যা বলে দিয়ে আয় মুকুল খেয়ে যাবে। রাধু জানতো মুকুলবাবু খাইয়ে লোক। সে ষোড়শোপচারের ব্যবস্থা করতে চলে গেল।

তারপর থেকে মুকুলবাবু এমনি প্রায়ই আসতে আরম্ভ করলেন। বড় বড় ছবি বিছিয়ে দাদামশার পায়ের কাছে বসে আঁকতেন সারা সকাল। মুকুলবাবুর সেই ছবি—মস্ত এক পুরোনো মন্দির, তার থেকে ঝুলছে একটা ঘণ্টা। একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। পুজোয় এসেছে। যাত্রা লিখতে লিখতে দাদামশার চোখ পড়েছে ঠিক। প্রকাণ্ড ছবি—চোখ না পড়ে উপায় কি ? মুকুলবাবুর ছবিগুলোই ছিল এইরকম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। যে মেয়েটি মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে, তার গায়ে একটা দামী ঝলমলে কাপড়। দাদামশায় বললেন—গোলো দিকি খানিকটা রং। দাও জল আর ফ্ল্যাট ব্রাশ। এই বলে উঠে পড়লেন লেখা ছেড়ে। তারপর রংএ আর জলে সেই বহুমূল্য কাপড়খানাকে করে দিলেন বহুদিনের পুরোনো! বললেন—দোকান থেকে সবে কেনা হলে তো চলবে না—দামী অথচ পুরোনো হওয়া চাই। তুমি শুধু জল আর ফ্ল্যাট ব্রাশ দিয়ে কিছুকাল ছবি ধোওয়া অভ্যেস কর।

এইভাবে মুকুলবাবুর 'মহাকালের মন্দিরে' ছবিটি তৈরি হল।

তারপর মুকুলবাবু আরো সব বড় বড় ছবি আমাদের বারান্দায় এনে ফেলতে থাকলেন। গণেশের একটা ছবি হল। তারপর বসুদেবের কোলে শ্রীকৃষ্ণ। নীল যমুনার কোলে বসে বসুদেব। যমুনার রং ফোটাতে পারছেন না মুকুলবাবু। দাদামশায় তুলি কেড়ে নিয়ে নীলের সঙ্গে চায়ের জল আর অ্যালুমিনিয়ামের গুঁড়ো মিশিয়ে দু-চার টানে এমন যমুনার জল আঁকলেন

যে আজও যারা সে ছবি দেখে তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সেই যমুনা-তরঙ্গের রূপের দিকে।

এইভাবেই চলেছিল। তারপর হঠাৎ একদিন ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। মুকুলবাবু তাঁর রং তুলি কাগজ জোড়াসাঁকোয় রেখেই বাড়ি চলে যেতেন। সেদিন এসেছেন ছবি আঁকতে। খুব সকালেই এসেছেন। এসে দেখেন দাদামশার কোলে যাত্রার জাব্দা খাতার বদলে কাগজ, তুলি, রং। মুকুলবাবুরই কাগজ—বড় বড় কাগজের পাশগুলি তিনি ছেঁটে ফেলতেন—তারই একটা অংশ। মুকুলবাবুরই রং তুলি। ভোর থেকে আঁকছেন। ছবি প্রায় তৈরী। এই হল কবিকঙ্কণ সিরিজের প্রথম ছবি।

বাস্ এই হয়ে গেল শুরু। মুকুলবাবুই ধরালেন আবার ছবি আঁকা। কথামালার হট্টমালার দেশ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন ছবির দেশে। তারপর থেকে রোজ একটা করে ছবি শেষ করতে লাগলেন দাদামশায়। সকালবেলা এঁকে ফেলতেন, বিকেলে এসে সকলে দেখে যেত। প্রতিদিন নতুন একখানা করে ছবি। মুকুলবাবু এসেছিলেন নিজের চিত্র-সাধনা করতে গুরুর পদতলে বসে নীরবে নিঃশব্দে চোখের অন্তরালে। তিনি সাধনায় কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন জানিনা, কিন্তু দাদামশার চিত্রের ফল্গুস্রোত প্রায় আট-দশ বছর পরে এইভাবে উদ্ধার করে দেওয়ায় সেবার কবিকঙ্কন চণ্ডী, কৃষ্ণ-মঙ্গল, পারাবত চিত্রাবলী প্রভৃতি প্রায় এক-শ ছবি হুহু করে বেরিয়ে পড়েছিল।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ছিল দুটো আপিস ঘর—দপ্তরখানা আর কাছারিখানা। দপ্তরখানায় ফরাশ-পাতা তক্তপোশের উপর পা গুটিয়ে বসতেন ফণিবাবু তাঁর মোটা-মোটা হিসেবের খাতা নিয়ে। সরকারদের মধ্যে তিনি ছিলেন বড়বাবু। খাতার চোস্ত সাদা পাতাগুলি লম্বা-লম্বি চার ভাগে ভাঁজ করে নিয়ে সেই ভাঁজ-বরাবর দৈনিক খরচের হিসেব লিখতেন ফণিবাবু দেশীয় প্রথায়। আর বসতেন হরিনাথবাবু আর গুপীবাবু। হরিনাথবাবুর প্রধান কাজ ছিল ইংরেজীতে যাকে বলে রিপেয়ার্স অ্যাণ্ড মেনটেনেন্স। বাড়ির দেয়াল ছাদ জানলা দরজা গরাদ থেকে আরম্ভ করে টেবিল চেয়ার বাক্স তোরঙ্গ, এমন কি খেলনার গাড়ি ঘোড়া পর্যন্ত সারিয়ে সুরিয়ে রাখা, চুনকাম, রং, পালিশ লাগানো এই নিয়ে পড়ে থাকতেন। গুপীবাবু ছিলেন বাজার সরকার। আর একজন ছিলেন পচাবাবু। তিনি থাকতেন ঐ দলেরই মধ্যে, কিন্তু নিয়মিত সরকারী কাজ করেননি কখনও। তবে সকলকে প্রচুর আমোদের খোরাক যোগাতেন। যশোরের লোক—দূরসম্পর্কের জ্ঞাতিও ছিলেন বোধহয় দাদামশায়দের। তাই তাঁকে ঠাট্টার পাত্র মনে করতে কারো বাধত না। তাঁকে নানারকমভাবে ঠকানো হত। মাটির ফল, পাতার মিষ্টি খাইয়ে অথবা সত্যিকারের মিষ্টির মধ্যে পাঁক ভরে দিয়ে। আচমকা ভয় দেখানো হত রবারের সাপ মাটিতে ফেলে রেখে। বয়েস হয়েছিল, তবু বিয়ে হয়নি পচাবাবুর। তাই ছোকরা চাকর বাকর যাকে হাতের কাছে পাওয়া যেত, কনে সাজিয়ে দেখানো হত পচাবাবুকে। যাকেই দেখতেন, পচাবাবুর তাকেই পছন্দ হয়ে যেত। ক্ষিতীশ একবার গোঁফ-টোফ কামিয়ে মাথায় একমাথা ঘোমটা দিয়ে কনে সেজে এসেছিল পচাবাবুর সামনে। রং কালো হলে কি হয়, পচাবাবুর ভারি পছন্দ হয়ে গেল ক্ষিতীশকে। বলা হয়েছিল, যশোর থেকে এসেছে মেয়েটি আমাদের বাড়িতে। কেবলই খোঁজা-খুঁজি করেন পচাবাবু, মেয়েটি গেল কোথায়? অন্দরের আনাচে কানাচে

উঁকি দেন, কোথাও আর খুঁজে পান না। বড় মন-মরা হয়ে গিয়েছিলেন সেবার।

দপ্তরখানা ছিল খরচের দপ্তর আর আদায়ের দপ্তর ছিল কাছারিখানা। বাগানের ধারে পাশাপাশি দুই দপ্তর। দুইএর মাঝখানে এক কলতলা। প্রায় সারাদিনই সেখানে চারখানা কলের মুখ দিয়ে ছড়্‌ছড়্ করে জল পড়ত আর এঁটো-ধোওয়া, বাসন-মাজা, স্নান করা চলত। জল পড়ার শব্দে, বাসন মাজার ঘ্যাঁষ-ঘ্যাঁষানিতে আর ঝি-চাকরদের বচসা আর চিৎকারে এই দুই আপিসের কাজের একটুও ব্যাঘাত হত না। ওদিকে যেমন ফণিবাবু ফরাশের উপর বসে মুখ গুঁজে হিসেব লিখে যেতেন, এদিকেও তেমনি কিশোরীবাবু টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে একমনে কাজ করে যেতেন। কিশোরীবাবু ছিলেন কাছারিখানার বড়বাবু। তাঁর সাকরেদ ছিলেন মনোরঞ্জনবাবু এবং আরো দু-একজন। জমিদারী সংক্রান্ত যাকিছু কাজ—আদায়-উসুল, মোকদ্দমা, আপীল সবই এই কাছারিখানা থেকে হত।

এই দুই জায়গার আনাচে কানাচে আমরা ঘোরাঘুরি করতুম। ভিতরে ঢুকতে সাহস হত না সব সময়, কিন্তু মাঝে মাঝে সেই কাগজ-ভরা অন্ধকার, অন্ধকার ঘরগুলোর আকর্ষণ রোধ করতে না পেরে ঢুকে পড়তুম দপ্তরখানায় কাছারিখানায় হঠাৎ। বাড়ির অন্য কোন ঘরের সঙ্গে এ-ঘর দুটোর মিল ছিল না। খুব বেশীক্ষণ থাকতে পেতুম না কোনদিনই। হয়তো কোন কাজের অছিলায় ঢুকলুম; নতুন একজোড়া তালতলার চটি দরকার—গুপীবাবুকে পায়ের মাপ দিতে গেলুম; কিংবা খাতা বেঁধে নেবার জন্যে কিছু শ্রীরামপুরী কাগজের প্রয়োজন—হরিনাথবাবুর কাছে তা পাওয়া যাবে। কিন্তু কাজ শেষ হয়ে গেলে সরকারবাবুদের ফরাশ-পাতা তক্তপোশের উপর বসে যে একটু সময় কাটিয়ে যাবো, তার যো ছিল না। খাতার উপর থেকে মুখ তুলে চশমার ফাঁক দিয়ে ফণিবাবু কটমট করে তাকাতে আরম্ভ করলেই সরে পড়তুম আমরা দপ্তরখানা থেকে।

একটু বড় হয়েছি যখন, কাছারিখানায় ঢোকবার সাহস যখন একটু বেড়েছে, সেই সময় একদিন দুপুর বেলা কাছারিখানার যেখানটা সবচেয়ে

অন্ধকার, সেখান থেকে একখানা দেয়ালে-টাঙানো ছবি আবিষ্কার করে ফেললুম। বহুদিনের পুরোনো, বিস্মৃত, অবহেলিত ছবি। ধুলো আর মাকড়সার জালে ঝুলে মুখ ঢেকে বসেছিল কতদিন কে জানে! জানলার একটা ফাটল দিয়ে সেই অন্ধকার কোণটায় সরু ফিতের মতো গ্রীষ্মের দুপুরের এক-ঝিলিক আলো এসে পড়েছে। তাইতেই ছবির একটা অংশ অল্প-আলোকিত। সেই একটুকু আলোয় মনে হল এক অপূর্ব চিত্র চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

ছবিটাকে টেনে তুলে নিলুম। ধুলোটুলো ঝেড়ে দেখলুম কাঁচে বাঁধানো একখানা বিলিতী ছবির নকল। ছবিখানা সেই অন্ধকার গুহা থেকে উদ্ধার করে কিশোরীবাবুর সামনে নিয়ে গিয়ে বললুম—দেখুন, আপনার কাছারি-খানার ধুলোর মধ্যে কি পড়ে ছিল!

কিশোরীবাবু একটুও অবাক হলেন না। বললেন—ওদিকে তো কেউ কোনোদিন যায় না। কোথায় কি ভেঙে-চুরে পড়ে আছে জানিও না আমরা।

আমরা বললুম—এটা নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু। কিশোরীবাবুর কাছে দলিল নথীপত্রের মূল্যই ছিল বেশী। কাছারিখানা থেকে দু-দশখানা ছবি খোওয়া গেলে তাঁর কাছে কাছারিখানার মূল্য একটুও কমত না। তা ছাড়া তিনি তো বললেন যে ছবিটার অস্তিত্বই তিনি জানতেন না। তিনি ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। আমরা ছবিটাকে ঘষে মেজে পরিষ্কার করে নীচের একটা ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে দিলুম। দেয়ালটার অনেকখানি চটা-পড়া অংশ ছবিতে ঢাকা পড়ে গেল। তার জায়গায় ফুটে উঠল এক জলাশয়। জলাশয়ের দিকে এক সারি মর্মর সোপান ধাপে ধাপে নেমে গেছে। অনেক নীচে জল। সেই সোপানের উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে নেমে আসছে কয়েকটি তরুণী স্নানার্থিনী। ইরাণী, তুরানী, কিংবা আর কিছু। ঐ ধরনের চেহারা।

ছবিখানাকে টাঙিয়ে দেবার পর আর আমাদের ওটার প্রতি এমন কিছু আগ্রহ ছিল না। ভুলতেই বসেছিলুম ছবিটার কথা। সেই সময় হঠাৎ একদিন দাদামশার চোখে পড়েছে।

—কোত্থেকে পেলি রে এটা? কোথায় ছিল বল তো? খুঁজেছিলুম কিছুদিন আগে শাহাজাদপুরে সব পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলছিল—কোত্থেকে বেরল? জানিস্ এটা কি? রবি-কার ক্ষুধিত পাষাণের ছবি!

আমরা বললুম—কি রকম?

দাদামশায় বললেন—হ্যাঁ। লাইব্রেরী ঘরে টাঙানো থাকত ছবিখানা। আরো এইরকম অনেক ছবি ছিল বাবামশার আমল থেকে। সে লাইব্রেরী ঘর তো আর তোরা দেখিসনি। বিলিতী কায়দায় সাজানো। সেই সময় রবি-কা এসে যখন বসতেন, ঐ ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখতেন। তখন খামখেয়ালী সভা বসেছে। একদিন বললেন—এই ছবিটা দেখে একটা গল্প মনে আসছে, লিখব। কিছুদিন পরে লিখে এনে গল্পটা খামখেয়ালী সভায় পড়ে শোনালেন সবাইকে। সেই হল ক্ষুধিত পাষাণের গল্প। মেজজ্যাঠার কাছে আমেদাবাদে শাহিবাগে যখন থাকতেন তখনই নদীর ধারে শাহিবাগের পাষাণপুরী দেখেছিলেন। তার এখানে দেখতেন ঐ ছবি। এই দুই-এ মিলে ক্ষুধিত পাষাণ। ওঃ সে সময় ঐ গল্প শুনে আমাদের হাত-পা হিম হয়ে গিয়েছিল। নিয়ে আয় দিকি গল্পগুচ্ছ বইখানা। পড়ে শোনা তো একবার।

আমরা ক্ষুধিত পাষাণের সেই জায়গাটা বার করলুম যেখানে কত্তাবাবা লিখছেন—

প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় শা মামুদ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জন স্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন। তখন হইতে স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপ-গন্ধী জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত এবং সেই শীকর-শীতল নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্মর খচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া কোমল নগ্ন পদপল্লব জলাশয়ের নির্মল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্বে কেশ-মুক্ত করিয়া দিয়া সেতার কোলে দ্রাক্ষা-বনের গজল গান করিত।

দাদামশায় বললেন—দেখছিস্ কেমন শিলাসন এঁকেচে? পা খালি করে হাতে হার্প নিয়ে কেমন নেমে আসছে সব জলের মধ্যে? ছবিখানা ভাল ছিল

রে। সে সময় লাইব্রেরী ঘর থেকে যত কিছু বিলিতী বর্জন করেছিলুম, তাতেই এই সব ছবিগুলো বিদায় নিয়েছে।

আন্দাজ আঠার শ পঁচানব্বই খৃষ্টাব্দে খামখেয়ালী সভায় ক্ষুধিত পাষাণ পড়া হয়। জোড়াসাঁকো-বাড়ির একতলার বিলিয়ার্ড ঘরে আরাম-কেদারায় বসে কত্তাবাবা ক্ষুধিত পাষাণ লিখছেন, এই ছবি সে সময় দাদামশায় এঁকেছিলেন। কালো কালি আর সরু কলমে আঁকা ছবি। তার পরেই স্বদেশী যুগের হওয়া এল। জোড়াসাঁকোর বাড়ির গায়ে সে হাওয়া যেদিন এসে লাগল সেদিন দাদামশায়রা প্রথমেই গেলেন লাইব্রেরী ঘরে। ঝালর দেওয়া ভারী ভারী পর্দা, দেয়ালে টাঙানো বিলিতী ছবি আর বিদেশী ঢং-এর আসবাবপত্র সরিয়ে দিলেন। লাইব্রেরী ঘর থেকে বিলিতী ছোঁয়াচ সম্পূর্ণ দূর করে দিলেন দাদামশায়রা। ঘর খালি করে তারপর তাকে সাজালেন নিজেদের মনের মত করে। দেশী প্রথায় ঘর সাজানো বলে কোনো জিনিসই তখন দেশে ছিল না। তাই দাদামশায়রা নিজেদের মাথা থেকে বার করলেন নানারকম ডিজাইন, নানারকম ঘর সাজাবার কায়দা। বিলিতী ভারী ভারী ছবিগুলোকে নামিয়ে ফেলে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন জমিদারিতে— শাহাজাদপুরে। লোকচক্ষুর অন্তরালে। এই সব ছবি সাহাজাদপুরে কুঠিবাড়িতে যাবার সময় হয়তো দু-চারখানা থেকেই গিয়েছিল কাছারিখানার কাগজপত্রের স্তূপের মধ্যে অন্ধকার দেয়ালের কোণে। তারপর লোকে ভুলে গিয়েছিল সে কথা। সেখানকার কালো কালো ঝুলে-ভরা তাক-এর আড়ালে চাপা পড়ে সেগুলো তাই লুকিয়ে ছিল এতদিন।

কাছারিখানা থেকে আরও একখানা ছবি বেরল। সেটি দাদামশার আঁকা একখানা অয়েল পেন্টিং। যখন প্রথম ছবি-আঁকা শিখছেন, বিলিতী প্রথায় ইজ্‌ল্‌-এর উপর ক্যাম্বিস রেখে তেলের রং দিয়ে, সেই সময়কার আঁকা একখানা কাকাতুয়া। যেমন সুন্দর তার ভঙ্গী তেমনি চমৎকার রং-এর বাহার।

আমরা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। বললুম—এমন ছবি তুমি ফেলে দিয়েছিলে?

দাদামশায় বললেন—স্বদেশী যুগ। নতুন স্টাইলে নিজেদের বিয়ের ছবি আঁকা শুরু করেছি। তাই ইটালিয়ান গুরুর কাছে শেখা জিনিসগুলোও সরিয়ে দিয়েছিলুম চোখের সামনে থেকে। দেখছি মন্দ আঁকিনি।

সে সময়ে দাদামশায় তাঁর যত-কিছু অয়েলপেন্টিং সব এক জায়গায় জড় করে বৌবাজারের পুরোনো জিনিসের দোকানদারদের ডেকে বেচে দিয়েছিলেন। শুধু বেচেন নি তেলের রং-করা দ্বারকানাথের একখানা উপবিষ্ট মূর্তি, আর অজান্তে কেমন করে আড়ালে পড়ে এই কাকাতুয়ার ছবিখানা টিকে গিয়েছিল।

এই ছবিখানাকে দেউড়ির কাছে যেখানে মস্ত ঘড়িটা থাকত তারই পাশে রেখে দেওয়া হল। অনেকদিন ছিল ছবিটা সেখানে। তারপর যে কোথায় গেল কেউ জানে না। বিয়ে-থাওয়ার সময় জিনিসপত্র এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করা হত, তাতেই হয়তো কোথাও সরে গেছে, কে জানে?

দাদামশার এই কাকাতুয়ার ছবিখানা আমাদের ভারি ভালো লাগত। সত্যি কথা বলতে কি, দাদামশার জলের রং-এ আঁকা ছবির চেয়ে এই চকচকে রঙিন কাকাতুয়াটা আমাদের পছন্দ হত অনেক বেশী। এই ছবি আবিষ্কারের ফলেই হোক বা যে-কোন কারণেই হোক সেই সময় আমরা ছবি আঁকা ধরেছিলুম অনেক। রং তুলি ছিল না আমাদের। দপ্তরখানায় গিয়ে গুপীবাবুকে ধরতেই সে সমস্যা মিটে গিয়েছিল। আমরা নিজেদের মনে ছবি আঁকতুম। দাদামশায় বা বড়দাদামশায়ের কাছে কোনোদিন ছবি আঁকা শিখতে যাইনি। ও রেয়াজই ছিলনা জোড়াসাঁকো বাড়িতে। ছবি ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে এ নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। আমাদের ছবিগুলো যদিও কিছুই হত না কিন্তু তবু আমরা মনের আনন্দে ছবি আঁকতুম। মাঝে মাঝে শুধু মনে হত ছবিগুলো দাদামশায়দের কারুর একবার চোখে পড়লে মন্দ হয় না। কিন্তু দাদামশায়রা ফিরেও তাকাতেন না।

কিন্তু একবার তাকিয়েছিলেন। ছবিখানা ছিল সুজনের আঁকা। সে এক কাণ্ড। সুজনের চেয়ে আমরা যারা বয়সে একটু বড় ছিলুম তারা দাদামশার মতো কাকাতুয়া না-হক খাঁদা বোঁচা পাখী পাখালী নিদেন পক্ষে লেজওয়ালা

ইঁদুর কিংবা কোনোরকমের একটা আকৃতি এঁকে ফেলতুম। সুজন বেচারা কিছুই পারত না। কোনো আকৃতি, কোনো রেখা-বন্ধ গঠনই তার হাত দিয়ে বেরত না। অনেক খেটে সুজন একখানা ছবি আঁকল, তার বিষয়-বস্তুটা হল মাটি আর আকাশ। ছবির কাগজের নীচের অর্ধেকটা রুক্ষ হলদে মাটি, সবুজের চিহ্ন নেই, শুধু একটু হলুদ গোলা। আর উপরের অংশটুকুতে একটু ফিকে নীল রং—অর্থাৎ আকাশ!

সুজনের নিশ্চয়ই খুব পছন্দ হয়েছিল ছবিটা। নইলে সে চুপি-চুপি কোকোমামার পড়বার ঘরে ঢুকে দেওয়ালের একখানা শূন্য তাকে তার ছবি-খানাকে পরম যত্নে সাজিয়ে রাখবে কেন? তাকখানা মায় দেয়ালটা শূন্যই পড়ে ছিল এতদিন। ছবিটা রাখায় তবু একটা কিছু চোখে পড়বার মত এল। সেদিক দিয়ে সুজনের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। কিন্তু তা হলে হবে কি? কোকোমামা ঘরে ঢুকেই তাকের উপর ঐ ছবি দেখে চটে গেল। ঘরের বাইরে নির্মমভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিল ছবিটা। কার ছবি, কে রেখেছে একবার খোঁজও করল না। যেন জঞ্জাল একটুকরো। সুজন যখন দেখল তার ছবি ধুলোয় লুটোচ্ছে, সে সযত্নে তাকে তুলে নিয়ে চুপিচুপি আবার কোকোমামার ঘরে ঢুকে সেই তাকেই তার ছবিখানাকে পুনরপি সাজিয়ে রাখলে।

ঐ তাকটা সুজনের পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। তার চিত্রবিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনকে ঐ তাকের চেয়ে ন্যূনতর কোনো স্থান দিতে নিশ্চয়ই সুজন খুব নারাজ ছিল, কিন্তু কোকোমামার তাতে কি এসে যায়? কোকোমামা সেই ছবিটাকে ওখানে আবার দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। এবারে ছবিখানাকে তুলে নিয়ে দুমড়ে মুচড়ে একেবারে বাগানে ঘাসের উপর যত জোরে পারে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। খানিক পরে সুজন এসে উঁকি মেরে দেখে তাকের উপর ছবি নেই। খুঁজতেই ঘাসের উপর চোখে পড়ল তার দলিত মথিত ছবিটি। সেটি কুড়িয়ে নিয়ে তার অবস্থা দেখে সুজনের চোখে তো জল। শিশু-পুত্রের মত বেচারা ছবিখানাকে বুকে তুল নিয়েছে, সেই সময় দাদামশায় এসে হাজির।

—দেখি, দেখি কি কুড়োলি?

সুজন তার সেই অপূর্ব চিত্র আর তার নিষ্পেষিত বিদলিত অবস্থা দেখাল।

—কোকোকাকা মুচড়ে ফেলে দিয়েছে।

—নিয়ে আয় উপরে আমার কাছে। বলে সুজন আর সুজনের ছবি নিয়ে দাদামশায় উপরে দক্ষিণের বারান্দায় উঠলেন। তারপর সেই কাগজের টুকরোটাকে জলে ভিজিয়ে বোর্ড-এর উপর বিছিয়ে ধরলেন।

—এই দেখ, মোচড়ানোর দাগ সব মিলিয়ে গেল। শুধু এইখানটা একটু ছিঁড়েছে দেখছি, দোমড়ানোর দাগটাও ওখান থেকে উঠবে না। ভালই হল।

বলে সেই ছেঁড়া আর দোমড়ানো দাগের উপর একটি খয়েরি আর সবুজ আঁচড় টেনে দিলেন। তার উপর সামান্য একটু সবুজের ছোপ। আর কিছু করবার দরকার হল না। দাগ ঢাকা পড়ল। ছবিও হল সম্পূর্ণ। খাসা একখানা ছবি। রোদে পোড়া রুক্ষ মাঠের বিস্তৃতি। তারই এক কোণে সবুজ গাছের একটুখানি শ্যামল ছায়া।

—মোহনলালকে বল্ একটা কার্ডবোর্ড-এ মাউণ্ট করে দিক।

একটুকরো সাদা কার্ডবোর্ড-এ সুজনের ছবিটা আমি আঠা দিয়ে জুড়ে দিলুম।

সুজন এবার সগর্বে সেটা নিয়ে কোকোমামার ঘরে ঢুকল বুক ফুলিয়ে। কোকোমামা ছবি দেখে অবাক!

সেদিন থেকে আমরা যতদিন দেখেছি কোকোমামার পড়বার ঘরের সেই ছবি—সেই তুচ্ছ ছবি, যা দাদামশার তুলির এক আঁচড়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল—তাকের উপর থেকে আর নড়েনি। সেইখানে থেকেই ঘরের শ্রীবৃদ্ধি করত।

॥ ২৩ ॥

কত্তাবাবার পঁয়ষট্টি বছর কিংবা ঐরকম বয়েস হলে জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে বই দিয়ে ওজন করা হয়েছিল। সন্ধ্যায় বিচিত্রা হল-এ আলো জ্বলে উঠতে কত্তাবাবা এসে ঢুকলেন। পরনে নতুন পাট-করা ধুতি, গলায় ধবধবে চাদর। লোহার চেন দিয়ে ঝোলানো একখানা প্রকাণ্ড পাল্লা বিচিত্রা হল-এ টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল। কত্তাবাবা বসলেন তারই একদিকের চৌকো কাঠের তক্তায়, আর অন্য তক্তায় তখনকারদিনের বিশ্বভারতীর ছাপা কেতা-কেতা বই জমা করা হতে থাকল। পাল্লা কি সহজে কাত হতে চায়? কত যে বই লেগেছিল দেখে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। বড় বড় রাজা-রাজড়ারা সোনায় রুপোয় ওজন হতেন, আর সেই সোনা রুপো গরীব লোকের মধ্যে বিতরণ করতেন। কত্তাবাবা কবি মানুষ, রাজা তো নন, তাই ওজন হলেন বই-এ। সেই বই-এর ভার নানা জায়গায় বিলিয়ে দেওয়া হল। লক্ষ্মীর প্রসাদের বদলে সরস্বতীর প্রসাদ।

তারপর হল কত্তাবাবার জয়ন্তী, সত্তর বছর বয়সে। জয়ন্তী শব্দটা সেই প্রথম চালু হল। দেশব্যাপী উৎসব। এর আগে যেমন বিচিত্রা হল-এ নিজের লোকদের মধ্যে, নিকট বন্ধুদের নিয়ে ঘরোয়াভাবে হয়েছিল, জয়ন্তী উৎসবে তার কিছুই ছিল না। সভা-সমিতি, সম্ভাষণ-প্রতি-সম্ভাষণ, মানপত্র, মাল্যদান, প্রস্তাব গ্রহণ ইত্যাদি এলাহি বাহ্যানুষ্ঠানিক কাণ্ডকারখানা। দেশ-সুদ্ধ মেতে উঠেছিল এই রবীন্দ্র-জয়ন্তী নিয়ে এবং তারই ফলে বোধহয় জয়ন্তী-উৎসবটা ছড়িয়ে পড়ল দেশে।

দাদামশায়কে নিয়ে একটা জয়ন্তী করার প্রস্তাব এই সময়েই উঠল। দাদামশায় শুনেই উড়িয়ে দিলেন কথাটা।

—রবি-কা পারবেন না কেন? কত দেশ ঘুরে এয়েচেন, কত বড় বড় ব্যাপারের মধ্যে গিয়েছেন। আমার কি ও-সব পোষায়?

এর পরেও যাঁরা বলতে এসেছিলেন, তাঁরা রীতিমত ধমক খেয়ে ফিরে গেলেন।

—যাও বিরক্ত কোরো না। আমার দ্বারা ও-সব হবে না।

আর কেহ সাহস করে এগল না। কথাটা চাপা পড়ে গেল। ষাট পেরিয়ে দাদামশায় পঁয়ষট্টিতে পড়লেন। তারপর ক্রমে এলেন সত্তরের কাছাকাছি। এই সময় কত্তাবাবার কানে উঠল কথাটা। শুন্‌লেন দাদামশায়ই বকুনি দিয়ে জয়ন্তী-উৎসবের প্রস্তাবটাকে ঠেকিয়ে রেখেছেন। তখন কত্তাবাবাই দিলেন একদিন ধমক।

—আচ্ছা অবন, দেশের লোক যদি তোমার জয়ন্তী করতে চায়, তোমায় মানপত্র দিতে চায়, তাতে তোমার বলবার কি আছে? যাও তৈরী হওগে।

রবি-কার হুকুম। দেশবাসীর নাম করে বললেন কথাটা। এর উপর আর কোনো কথা চল্ল না। দাদামশায় বুঝলেন, এবার জয়ন্তী-উৎসবে মাথা পাততেই হবে ভালো মানুষটির মত।

একদিন বললেন—জয়ন্তী জয়ন্তী করে লোকে, রবি-কার প্রথম জয়ন্তী আমরা করেছিলুম এই দক্ষিণের বারান্দা থেকে, তা জানিস্? সে আজ কত কালের কথা! ও-সব ভাষণ-ফাষণ নয়। দাদা সাজিয়েছিলেন ফুঁকো শিশির মধ্যে পদ্মের কুঁড়ি। তোরাই তো নিয়ে গিয়েছিলি! মনে নেই হয়ত তোদের।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার। বললুম—হ্যাঁ, মনে আছে বইকি। অনেক কাল আগের ঘটনা। কিন্তু বেশ মনে ছিল। সে সময়কার ঐ একটা ঘটনাই মনে আছে।

তখন আমরা খুব ছোট। একদিন সকাল বেলা উঠে দক্ষিণের বারান্দায় গেছি, দেখি মার্বেলের টেবিলটার উপর কি সব সাজানো হচ্ছে। কতকগুলো গোল গোল অস্বচ্ছ কাঁচের শিশিতে পদ্মের কুঁড়ি বসানো। সময়টা বোধহয় বর্ষার শেষ। মুখর বর্ষণের পর সকালের প্রথম আলোর স্নিগ্ধতায় বারান্দার কোণে সারিবন্দি করে রাখা পদ্মের কুঁড়িগুলি জ্বলজ্বল করছিল। দাদামশায়রা বসেছিলেন তার সামনে। শুনলুম, ছোটদের সকলকে ডাকতে পাঠানো হয়েছে। পিছনের রাস্তার দু বাড়িতে যে-সব মাসতুতো ভাই-বোনেরা থাকে, তারাও নাকি আসছে। যতগুলি শিশি, ততগুলি ছেলে-মেয়ে প্রয়োজন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারে ছোট ছেলে-মেয়ের অভাব ছিল না, অন্তত আমরা যখন জন্মেছি সে সময়। দেখতে দেখতে বারান্দার এক অংশ ভরে গেল বাচ্ছাদের ভিড়ে।

মুখ হাত ধুয়ে, পরিষ্কার কাপড় পরে সকলে এসেছে, কারণ ফুল-ভরা শিশি হাতে নিয়ে সারি বেঁধে যেতে হবে ও-বাড়ির তেতলায় কত্তাবাবার কাছে। কত্তাবাবা বিদেশ ঘুরে সবে জোড়াসাঁকোয় এসে পৌঁচেছেন। সকাল বেলায় তাঁর অভিনন্দনের তাই এই আয়োজন। এ হচ্ছে দাদামশায়দের অভিনন্দন। দাদামশায়দের নিজস্ব ব্যাপার। এর ব্যবস্থাও তাই মৌলিক। ঠিক মনে নেই, ঘটনাটা নোবেল প্রাইজের পর, না কি জাপান ঘুরে আসবার পর। কিন্তু যেটাই হোক, এটা শুনেছিলুম যে, কত্তাবাবার মেজাজ ভাল ছিল না। দেশের লোকের কাছ থেকে যে-রকম সম্বর্ধনা পাচ্ছিলেন, তার রং ঢং আর কৃত্রিমতা দেখে চটেই যাচ্ছিলেন। গাঁদাফুলের মালা, গোলাপের তোড়া, আবাহন সংগীত আর পাণ্ডিত্য-ভরা গম্ভীর গম্ভীর বক্তৃতা দিয়ে তখনকার দিনে বড় বড় মানুষদের সম্মানিত অভিনন্দিত করা হত। এতে কত্তাবাবার মত মানুষের ক্ষুব্ধ এবং তিক্ত হয়ে যাবারই কথা।

দাদামশায়দের এই ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে নতুন রকমের। বড়বাজারের কাঁচের দোকানে লোহার নলের গায়ে গলন্ত কাঁচ দুলিয়ে তার মধ্যে ফুঁ দিয়ে গোল গোল ফুঁকো শিশি তৈরী করত। তাই কিনে আনালেন এক-এক পয়সায় এক-একটা। একটি করে পদ্মের কুঁড়ি বসিয়ে দিতে ফুঁকো শিশির রং আর তার আকৃতির সঙ্গে এমন খাসা মানালো যে, স্ফটিকের ফুলদানিতে অমনটি হত কিনা সন্দেহ। একদল ছেলে-মেয়ে সারি বেঁধে বেরল এই নিয়ে প্রভাত-সূর্যের আলোয় পাঁচ নম্বর বাড়ি থেকে ছ-নম্বর বাড়ির দিকে। যাঁরা পাঠালেন এই অর্ঘ্য, তাঁরা রইলেন পিছনে। এগিয়ে গেল দেবদূতের দল। সিঁড়ি বেয়ে ঘুরে ঘুরে উঠল তারা তিনতলায়। পশ্চিমের ঘরে যেখানে তাঁর রচনা কোলে নিয়ে বসেছিলেন কবি, অর্ঘ্যগুলি সেইখানে নামিয়ে দিয়ে দেবদূতেরা কবিকে প্রণাম করে নিঃশব্দে ফিরে গেল। আবাহন সংগীতও হল না, বক্তৃতা তা নয়ই। শুনেছিলুম, কত্তাবাবা এটা নাকি ভারি পছন্দ করেছিলেন।

ঘরের মানুষ রবি-কা যখন বিশ্বের দরবারে নাম প্রতিপত্তি কুড়িয়ে ফিরে এসেছিলেন, তখন এই একবারই তাঁর ঘরের ভাইপোরা এই স্বকীয় হৃদয়গ্রাহী উপায়ে তাঁদের প্রণাম জানিয়েছিলেন। কোনো ছাপা প্রশস্তিপত্রে এর নথি নেই।

এই হল দাদামশায়দের করা জয়ন্তী। কিন্তু আজকের দিনে কে আর করবে সেই রকম ?' বেশ করে ঢাক-ঢোল না পিটোলে কোনো রকম উৎসবই হয় না তো জয়ন্তী !

দাদামশায় লিখেছেন এক জায়গায়—

"ইদানিং দেখছি সব তফাৎ হয়ে গেছে। ছোটখাট স্মৃতি-সভা, টাউন হলের সভা, গান-বাজনার আসর, সবই যেন একরকম। বিয়ের বাসর আর মৃত্যুর বাসর সবই এক। এগুলো আমাদের বড় চোখে লাগে। রবি-কাকে একবার বলেছিলুম, রবি-কা একটা ব্যবস্থা কর দেখি, এরকম তো আর দেখতে পারিনে। সব অনুষ্ঠানগুলো তালগোল পাকিয়ে এক হয়ে গেল। তিনি জবাব দিলেন না। চোখ বুজে রইলেন।"

কাজেই তখনকার দিনের যেমন প্রথা, যেমন ধারা প্রচলিত ছিল, তেমনি ভাবেই হল দাদামশায়ের সত্তর বছরের জন্মজয়ন্তী।

কত্তাবাবা কিন্তু সে উৎসবে থাকতে পারলেন না। সেই বছরেই তিনি গত হয়েছেন। অসুস্থ যখন, তখনও নির্দেশ দিয়ে গেছেন দাদামশার জয়ন্তী-উৎসব করার। রোগশয্যায় শুয়ে দাদামশার জন্যে প্রশস্তি লিখে দিয়েছিলেন। সেটা 'ঘরোয়া' বই-এর মুখপত্ররূপে ছাপা হয়েছিল। সে বছর কবির তিরোধানে দেশ শোকাচ্ছন্ন, কিন্তু আদেশ দিয়ে গেছেন তিনি অবনীন্দ্রের জয়ন্তীর। দাদামশায় মাথা পেতে নিয়েছিলেন সে হুকুম। ধূপ-ধুনো, সভা, সম্ভাষণ, মাল্য-চন্দন কিছুতেই আপত্তি করেন নি।

দাদামশায়কে মাঝে মাঝে সভা-সমিতি করতে হত। জিনিসটা পছন্দ না হলেও না করে উপায় ছিল না। দেশের আচার-প্রথা বদলে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে। তাকে এড়াবেন কেমন করে ? এই সভা-সমিতির বিষয়ে দাদামশায় যা লিখেছিলেন, মুখেও বলতেন সেই খাঁটি কথাটি। বলতেন—

সভা কর্ছিস্ কর্। নতুন জিনিস শিখেছিস্ সায়েবদের কাছ থেকে, বেশ। কিন্তু আনন্দসভার সঙ্গে শোক-সভার কোনো তফাত থাকবে না কেন? সে তফাতটা করতে পারিস তবে তো বুঝি! এতে-ও সভাপতি, ওতে-ও সভাপতি। এতেও টেবিল-চেয়ার, ওতেও টেবিল-চেয়ার। এতেও সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ আর বক্তৃতা, ওতেও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী আর বক্তৃতা? কেন রে বাপ্‌?

একবার এক কলেজের ছেলেরা এসে ধরেছে দাদামশায়কে সভাপতি হবার জন্যে। তাদের প্রধান শিক্ষক মারা গেছেন, তাঁরই শোক-সভা।

দাদামশায় বললেন—সে কি হে? তোমরাই না গেল-বছর ধরে নিয়ে গিয়েছিলে? তোমাদের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে আলাপ হল—চমৎকার মানুষটি। তিনি গেলেন?

ছেলেরা বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। গত বছর আমাদের বাৎসরিক উৎসবে আপনিই সভাপতিত্ব করেছিলেন। আমাদের প্রিন্সিপ্যাল খুবই গর্ব প্রকাশ করতেন সেকথা উল্লেখ করে। সেইজন্যেই তো আপনাকে এই শোক-সভার সভাপতি করতে চেয়েছে সবাই।

—বেশ বুদ্ধি! উৎসব দেখাতে নিয়ে গেলে সেবার উৎসবের বদলে দিলুম বক্তৃতা, শোনালে বক্তৃতা। এবারেও আবার শোকসভায় চোখের জলের বদলে বক্তৃতা ছোটাবার বন্দোবস্ত করেছ, এই তো?

—আজ্ঞে, কনডোলেন্স মিটিং তো একটা দরকার, নইলে শোক প্রকাশ হবে কি করে?

—তা বটে। বেশ, এখন যাও তোমরা। সেদিন একজন এসে নিয়ে যেও।

ছেলেরা চলে যেতে দাদামশায় ক্ষিতীশকে ডেকে বললেন—মিশিরকে খবর দিয়ে রাখো, অমুক দিন বিকেলে বেরতে হবে। ছেলেরা আসছে নিতে। আর চট্ করে তোমার খানকতক খবরের কাগজ নিয়ে এস দিকি।

ক্ষিতীশ মাথা চুলকে বললে—আজ্ঞে, খবরের কাগজ কি করবেন?

—নিয়ে এসো না যা বলি। যে কটা পাও। যত পুরোনো হোক, ক্ষতি নেই।

ক্ষিতীশ খবরের কাগজ নিয়ে বারান্দায় ঢুকতে বললেন—বোস। বের কর দিকি কে কোথায় বক্তৃতা দিয়েছে। পড় এক-এক করে।

বাংলা দৈনিক পত্রিকায় খবরের সঙ্গে কে কি বললেন, সেই সব উক্তি প্রায়ই থাকত। ক্ষিতীশ বেছে-বেছে কিছু শোনাল। দাদামশায় সটকার নল মুখে দিয়ে ছবি আঁকতে আঁকতে শুনলেন। তারপর সেদিন দুপুরে ভাত খেয়ে এক-ঘুমের পর বারান্দায় বসে একখানা বক্তৃতা যা লিখে ফেললেন, শোনবার মত। নির্ভুল বক্তৃতা একখানা। খবরের কাগজের মানদণ্ডে ত্রুটিবিহীন। সব কিছুতে চলে। সব কিছুই বলা হচ্ছে, অথচ কিছুই বলা হচ্ছে না।

দাদামশায় পড়ে শোনালেন আমাদের। বললেন—দেখিস্ এবার যে-সভাই হোক না তাতেই এটা পড়ে দেব। কেউ ধরতে পারবে না। রেখে দে এটা।

আমি রেখে দিলুম। তারপর যেদিন ছেলেরা নিতে এল, আমি লেখাটা বার করে দাদামশার হাতে দিলুম। দাদামশায় নিয়ে তারপর কি একটু ভেবে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—থাক্, শোক-সভায় না-ই বললুম। বলে এমনি চলে গেলেন। সেবারে শোকসভায় বক্তৃতা পড়া হল না। মনে যা এল, মুখে মুখে বলে গেলেন, শুনলে সবাই।

দাদামশায় ফিরে এলে আমরা বললুম—পড়ে দিলে পারতে। কারুর সাধ্য ছিল না ওটাকে ঠাট্টা বলে ধরবার।

দাদামশায় বললেন—শোক-সভায় নয়; দিস্ একটা কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে, পড়ে দেব।

তারপর কোন এক উদ্বোধনের সভায় দাদামশার হাতে সেটা গুঁজে দিতে গেলুম, আবার কি ভেবে ফিরিয়ে দিলেন। শেষ অবধি অমন চমৎকার বক্তৃতাটা কোথাও-ই আর পড়া হল না।

দুঃখের বিষয় এই লেখাটি হারিয়ে গেছে। অনেকদিন পরে সেটাকে যখন ছাপিয়ে দেবার কথা উঠেছিল তার সত্যিকার রহস্য প্রকাশ করে দিয়ে, তখন আর সেটা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

॥ ২৪ ॥

বহুদিন বিদেশে কাটিয়ে বিদেশী লেখাপড়া সাঙ্গ করে ফিরে এলুম আমি জোড়াসাঁকোর মাটিতে। এসে দেখি বড়দাদামশায় গত হয়েছেন। মেজ-দিদিমা গত হয়েছেন। মেজদাদামশায়, দাদামশায়, এঁরা আর নিয়মিত দক্ষিণের বারান্দায় বসছেন না। গড়গড়া অদৃশ্য হয়েছে। দাদামশায় চুরুট ছাড়া আর কিছু খান না। মেজদাদামশায় কালে ভদ্রে সিগারেট। ক্ষিতীশ মারা গেছে ইঁদুরের কামড়ে ধনুষ্টঙ্কার হয়ে। ক্যাশঘরে যে-সব ধেড়ে ইঁদুর দাপাদাপি করে ক্ষিতীশকে ভয় দেখাত, তাদেরই একটা কি না কে জানে? জোড়াসাঁকো বাড়ির সিঁড়িতে ঝাঁট পড়ে না। বড় বড় অন্ধকার ঘরের কোণে কোণে জানলা দরজার ফাঁকে ফাঁকে ধুলো জমেছে। দেয়ালে চুনকাম নেই। জোড়াসাঁকো বাড়ির চেহারাই বদলে গেছে। কিন্তু বাড়ি পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে দেউড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই দাদামশায় যখন আমার সবে-কামানো চোস্ত গালে তাঁর দু-দিনের না-কামানো খস্‌খসে গাল ঘষে দিলেন, তখন মনে হল সেই পুরোনো জোড়াসাঁকোতেই ফিরে এসেছি। তার কোনো বদল হয়নি।

দাদামশায়দের তিন ভাই নিয়ে শুরু হয়েছিল এই জোড়াসাঁকো। তিন দাদামশায় আর তিন দিদিমা। তখন কেউ দাদামশায় দিদিমা হননি। সবে বাপ-মা হতে শুরু করেছেন হয় তো। ছ-জনের সংসার আর প্রকাণ্ড জমিদারি। মাথার উপরে মা। বিলাসী ছিলেন না কেউ। অমিতব্যয় করতে তিন ভাইএর এক ভাইও জানতেন না। বড়দাদামশায়ের শখের মধ্যে ছিল নতুন নতুন খেলনা কেনা। মেজদাদামশায় কিনতেন নতুন বই। আর দাদামশায় সাজানো দোকানের সামনে দিয়ে ঘুরে ঘুরে শুধু দেখে বেড়াতেন। কখনো কিছু কিনতেন না। দান-ধ্যান ছিল। আশ্রিত ছিল অনেক। পড়ার খরচ জুগিয়েছেন, কেউ এসে ধরে পড়লে বড় বড় চিকিৎসার খরচ বহন করেছেন। ঘরে রেখে খাইয়েছেন, বাড়ি করে বসিয়ে দিয়েছেন

এমন উদাহরণও যথেষ্ট আছে। ঝর্ণার ধারার মতো জমিদারি থেকে যে টাকা এসে পৌঁছত তাই দিয়েই খরচ মিটে যেত সমস্ত সংসারের এবং সমস্ত কর্মের। তারপর সেই সংসার বেড়ে হল পঁয়তাল্লিশ জনের। জমিদারির আয়ের উপর নানা-রকম কর চাপানো হল ইতিমধ্যে।

আয় হ্রাস আর ব্যয় বৃদ্ধির তারতম্যে পড়ে এর আগেও বাড়ি বিক্রির কথা একাধিকবার উঠেছিল। এবার বিদেশ থেকে ফিরে এসে আবার শুনলুম চলেছে সেই মন্ত্রণা।

জমিদারির আয়ের অস্থিরতার জন্যে দাদামশায়েরা আগেও বহুবার বিব্রত হয়েছেন। নতুন নয়। পুরীর বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তারপর কতবার টাকার দরকার পড়েছে আর শোনা গেছে—বেচে দাও বাড়ি! যেন বাড়ি বেচে দিলেই সব সমস্যার সমাধান। প্রথম বারের যুদ্ধের সময় যখন কলকতায় হু হু করে জমির দাম বাড়তে আরম্ভ করল তখন উকিল আর দালালরা ধরেই নিয়েছিলেন যে জোড়াসাঁকোর বাড়ি দাঁওয়ায় বিক্রি করিয়ে তবে ছাড়বেন। দাদামশায়রাও জানতেন উকিল-দালালরাই সব। বড়দাদা-মশায় বড় বড় কাগজ, কাঁটাকম্পাস, কলম কালি আর রুমাল নিয়ে বসে গেলেন তিন ভাইএর জন্যে তিনখানা নতুন বাড়ির নকৃশা আঁকতে। উড়ো খবর এসে যেত, জমির দর এত হল। মুখে-মুখে হিসেব করে ফেলত কেউ—তাহলে জোড়াসাঁকো বাড়ির দাম এত লাখ টাকা হবে। বড়দাদামশায় সঙ্গে সঙ্গে আরো তিনখানা নতুন নকৃশা এঁকে তার ব্লু প্রিণ্ট করিয়ে ফেলতেন। গ্রীষ্মের দুপুরে লাইব্রেরী ঘরের জানলা বন্ধ করে ঘর ঠাণ্ডা করে সকলে মিলে সেই সব নকৃশা দেখা হত। কার বাড়ি কোথায় বসবে, কার বাড়ির আর কি-কি দরকার, কোন ঘরটা বড় হবে, কোনটা ছোট হবে সব জানানো হত। বড়দাদামশায় শুনে আবার নতুন করে আঁকতেন। কত নকৃশা যে সেবার টেনেছিলেন তার ঠিক নেই। বলতেন—ফার্নিচার করে দেখিয়ে দিয়েছি একবার, এইবার বাড়ি করে দেখিয়ে দেব। নতুন বাড়ি মনের মত বাড়ি, পছন্দ-মত ঘর-দোর, জানলা-কপাট, বারান্দা-উঠোন, অলি-গলি তার উপর বড়দাদার মত শিল্পীর পরিকল্পনা—এ ভেবে সবাই সুখ পেতেন। আবার

পুরোনো বাড়ির উপরেও মায়া পড়ে থাকত। দাদামশায়-ই একদিন বলে ফেললেন কথাটা।

—নতুন বাড়ি হচ্ছে হোক। কিন্তু এটাও রেখে দিলে হয়—মাঝে মাঝে আসা যাবে।

এইটিই আসলে সকলের মনের কথা।

বাড়ির তুলনায় মানুষ বেড়ে গেছে। গুছিয়ে বসা যাচ্ছে না। অসুবিধা হচ্ছে প্রচুর। তিনখানা গোছানো বাড়ি হলে সকলেরই সুবিধে হয়। তার উপর যদি দাঁও মারা যায় তা হলে তো কথাই নেই। সব কিছুই মেনে নিলুম। সব কিছু মেনে নিলেও বসত-বাড়ি কি এক কথায় ছাড়া যায়? জোড়াসাঁকোর বাড়ি বিক্রি হল না। আশে পাশে অনেকে বেচে দিলেন তাঁদের বসত বাড়ি প্রচুর লাভে। অন্যত্র গিয়ে তাঁরা বাসা বাঁধলেন। কিন্তু দাদামশায়রা অত বড় যৌথ পরিবারের অসুবিধা সত্ত্বেও জোড়াসাঁকোর মায়ার বন্ধন কেটে বেরতে পারলেন না।

এবার তাই আবার যখন বাড়ি বেচার কথা উঠল, আমরা অনেকেই ধরে নিয়েছিলুম, এ-ও একটা হাওয়া—যেমন উঠেছে, তেমনি আবার মিলিয়ে যাবে। লাইব্রেরী ঘরের বেত-বাঁধানো শক্ত তক্তপোশের উপর অগেরই মত আমরা গিয়ে বসতুম, হাসি ঠাট্টা করতুম, গাল-গল্প করতুম। মনে বিশ্বাসই হত না এই চিরদিনের লাইব্রেরী ঘর ছেড়ে আমাদের কোনোদিন চলে যেতে হবে।

একদিন তখন সবে সন্ধে হচ্ছে। শীত চলে গেছে। সন্ধ্যার সময় অল্প অল্প ঠাণ্ডা দক্ষিণ বাতাস ওঠে। ফ্যাকাসে আকাশের নীচের যেখানটা আমাদের বাগানের গাছগুলোর মাথা ছুঁয়েছে, সূর্যাস্তের পর রক্তরাগে রঙিন। দাদামশায় চুপটি করে দক্ষিণের বারান্দায় সেই দিকে চেয়ে বসে আছেন। আমি যাচ্ছিলুম, ডাকলেন। বললেন—বোস।

বসতে বললেন—এবার বোধহয় আর বাড়িটা রক্ষা করা গেল না।

সেদিন দুপুরে জমিদারি-কাছারির কর্মচারী আর উকিলরা সব এসেছিলেন জানতুম। আমি বললুম—এ তো নতুন কথা নয়। দেনা তোমাদের

চিরকালের। বাড়ি বেচে দেনা শোধ করার কথা অনেকবার শুনেছি। দেনা কমেছে বেড়েছে সব সময়। চলুক না এইরকম। তার জন্যে বাড়ি বেচার দরকার কি?

দাদামশায় বললেন—তা নয় রে! আগেকার দিন তো আর নেই। এখন আর পুরোনো বাড়িতে মন নেই কারো। দাদা গেছেন। বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। জোড়াসাঁকোর মনে ভাঙন ধরেছে। তার উপর যুদ্ধ বাধলো। বলে কিনা, বাড়ি বেচবার এই সুযোগ। আর তর সইছে না কারো।

জোড়াসাঁকোর মনে ভাঙন ধরেছে। দাদামশায় ঠিক ধরে ফেলেছেন। মনে মনে উপলব্ধি করেছেন বাড়িটা এবার আর রক্ষা করা গেল না। দাদা নেই। কে-ই বা এখন নতুন নতুন নক্‌শা কেটে নতুন বাড়ির স্বপ্ন দেখবে! কে-ই বা বলবে—পুরোনো বাড়িটাও থাকুক।

হঠাৎ হেসে দাদামশায় বললেন—কঃ গতা মথুরাপুরী যদুপতেঃ! রঘুপতেঃ কঃ গতোত্তরকোশলা! ফাল্গুনের আকাশের তলায় খুব লঘুভাবে বললেন কথাটা। বহুযুগের পুরোনো চিরযুগের সেই চিরসত্য বাণী! হালকাভাবে বললেও জোড়াসাঁকোর ঘনায়মান সন্ধ্যার রঙিন আকাশতলে মনে হল যেন একটা গুরুভার নেমে আসছে।

এর পর এক বছর কেটে গেছে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি আরো খানিকটা পুরোনো হয়েছে, আরো খানিকটা জীর্ণ। জাপানী আর্টিস্টরা দোলনার বাগানের ধারে যে ভাঙা দেয়াল আর থামগুলির ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছিল সেগুলি ঠিক তেমনই আছে, কেউ সারায় নি। দেয়ালের ফাটলের মধ্যেকার অশ্বত্থ গাছটাকে কেউ উপড়ে ফেলে দেয়নি। জাপানী শিল্পীরা যেমন দেখে গিয়েছিল তার থেকে শুধু একটু বড় হয়েছে, একটু পুরুষ্টু হয়েছে। দেয়ালের মধ্যে কিসের রস পেয়ে পুরুষ্টু হল কে জানে! বাগানের দোপাটি গাছগুলো যেখানে বিচি পড়ে সেখানেই আপনি হয়। যে মালীটা আছে সে জানে জোড়াসাঁকো বাগানের সে-ই শেষ মালী। বাগান সাজাবার দিকে তার মন নেই। উপদেশ নিতে সে মেজদাদামশায়ের কাছে আসে না, মেজদাদাও

আর তাকে ডেকে পাঠান না। কিন্তু সম্প্রতি একটা আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে বাহির বাড়ির ঘর আর পুরোনো আসবাব-পত্রগুলোর। বহু বছর ধরেই বার-বাড়ির চাকর-বেহারার খরচ কমিয়ে ফেলা হচ্ছিল। এর ফলে ওদিকে যারা বাহাল হত তাদের মেজাজ ভালো থাকত না। না থাকবারই কথা। বার-বাড়িতে চাকরেরা হেসে খেলে কাজ করে এসেছে চিরকাল। খাটেনি। একটা চাকর হলে যেখানে অনেক হয় সেখানে চারটে চাকর নিযুক্ত হয়ে এসেছে এতদিন। মেজাজ ভাল না থাকার জন্যে কাজ-ও তারা করত না। লাইব্রেরী ঘর, হল্ ঘর, ইস্কুল ঘর প্রভৃতি বার-বাড়ির নানা ঘর ধুলো ভরা পড়ে থাকত। জমিদার বাড়ির চাকরদের চাল-চোল আর মধ্যবিত্ত ঘরের চাকরদের চাল-চোল তো এক নয়। কে বলবে তাদের ন্যাতা-ঝাড়ন দিয়ে ধুলো মুছতে? আর বললেই বা শুনছে কে? আমরা ধুলো-ভরা চেয়ারে টেবিলে বসতে বহুদিন ধরেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর পুরোনো চাকরটার বদলে একজন নতুন লোক এল। বাবুদের অবস্থা-পরিবর্তন আঁচ করেই বোধ হয় পুরোনো লোকটা সরে পড়েছিল।

দাদামশায় একদিন দেখালেন—দেখ কি কাণ্ড!

দেখিন নতুন বেহারাটা লাইব্রেরী ঘরের আসবাবগুলো এমন ঘসে মেজে পরিষ্কার করছে যে, বহুকাল এমন সাফ স্থৎরো দেখিনি। দাদামশায় বললেন—এ বেটা একেলে চাকর। বাবুয়ানা জানে না। খাটতে জানে। কাল পরিবর্তন হল রে। আমরা সব পুরোনো হয়ে গেলুম।

বলে বললেন—মহাবীর ছিল। সে কি এর মতো ভাবছিস্? সে ছিল আমার শখের চাকর। কোনো কাজ ছিল না তার। শুধু যখন ধুতি পরতুম ধুতির কোঁচা ধরে মহাবীর দাঁড়িয়ে থাকত।

দাদামশায় কালে ভদ্রে কোথাও বেরতে হলে ধুতি পরতেন। ধুতি কোঁচানোর কল আবিষ্কার নিয়ে এক সময় অত মেতে উঠলেও আমরা খুব কমই ধুতি পরতে দেখেছি তাঁকে। মহাবীর কত কাজ করত এই থেকে বোঝা যায়।

তারপর বললেন—আমার কাপড়ের আলমারির চাবি থাকত তার কাছে।

আমার জামা পরে বেটা থিয়েটারে যেত। একদিন একটা জামা গাঁয়ে দিয়ে বেরব বলে জামাটা আনতে বলেছি, মহাবীরটা কেবলই বলে—এই জামাটা পরুন। আমি যত বলি, আর এটা নয়, সেইটে নিয়ে আয়, সেইটে পরে যাবো, বেটা কিছুতেই আর আনতে চায় না। শেষে বলে, ওটা তো ময়লা কাপড়ের বাক্সে আছে, ধোপার বাড়ি যাবে। আমি বলি, কি রকম? ওটা আমি পরিনি, তবে ময়লার বাক্সে গেল কি করে? বেটা তবু বলে, হ্যাঁ আপনি পরেছেন, আপনার কি আর মনে আছে? আমি বলি, বটে? আমার মনে নেই কি পরেছি, না-পরেছি? কোনোদিন গায়ে দিইনি জামাটা। রেখেছিলুম পরবো বলে—তুই-ই বেটা পরেছিস্ তাহলে। শিগ্‌গীর বল কোথায় গিয়েছিলি গায়ে দিয়ে? তখন বেরল, থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল সেজে। শখ বেটার। দিয়ে দিলুম জামাটা মহাবীরকে। বললুম—যা বেটা শখ মেটা গে।

এই হল তখনকার আমলের চাকর। জন্তু জানোয়ারের মতো মুখ গুঁজে খাটবে, ধুলো কাদা ঘাঁটবে সে মানুষই নয়। মহাবীর কতরকম ফন্দি করে দাদামশার কাছ থেকে বক্‌শিস আদায় করত। ইচ্ছে করে দুষ্টুমি করে দাদামশায়কে রাগিয়ে তারপর শাস্তি নিয়ে, শেষটা যখন দাদামশায় বুঝতেন গরীব লোকটার উপর অন্যায় করা হয়ে গেছে তখন টাকা দিয়ে খুশী করে দিতেন। একবার দাদামশার ছবি আঁকতে আঁকতে তামাক পুড়ে গেছে, মহাবীরকে বলেছেন আর এক ছিলিম তামাক এনে দিতে। মহাবীর শুনেই নিজের ঘরে গিয়ে লুকিয়েছে। আগে থেকে ভেঁজে নিয়েছিল মতলবটা। দাদামশায় ডেকে ডেকেও মহাবীরকে পান না। কলকে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। শেষে অছিলাল দরোয়ানকে ডেকে বললেন—নিয়ে আয় বেটার কান ধরে। দরোয়ান তাকে ধরে নিয়ে আসতে মহাবীর এমন-ই করে দাঁড়ালো যে, দাদামশায় আরো চটে গিয়ে তামাকের নল দিয়ে তাকে পিটলেন কয়েক ঘা। মহাবীর এইটেই চাইছিল। যত না লেগেছে তার থেকে অনেক বেশী ভাব দেখিয়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কান্না শুরু করে দিলে। দাদামশায় দুটো টাকা দিতে তবে সে কান্না থামায়।

নতুন যুগের নতুন চাকরের হাতে পড়ে লাইব্রেরী ঘরের মেঝে ক'দিনের মধ্যেই চক্‌চকে হয়ে উঠল। এমন চক্‌চকে কোনোদিন দেখিনি।

দাদামশায় এই সময়টাতে ভাঙা জিনিসের টুকরো দিয়ে কুটুম কাটাম তৈরী করতেন খুব। কোনো ভাঙা জিনিস ফেলতেন না। কিছু একটা করবার চেষ্টা করতেন তাই দিয়ে। আর পুরনো দিনের গল্প বলতে ভালোবসতেন। রানীদি এসে দাদামশার মুখ থেকে শুনে টুকে নিতেন সেই সব গল্প।

একদিন বললেন—রানী ঠিক সময়টিতে এসেছে। তোকে আর জসীম উদ্দীনকে এক সময় কত পুরোনো গল্প বলেছি, তোরা তো লিখে রাখলি না। রানীই দেখছি পারবে। তবে তোদের যা বলতুম সে একটু-আধটু। এখন জলের স্রোতের মত কোথা থেকে যে এত পুরোনো গল্প আসছে বলতে পারি না। লিখুক রানী। থেকে যাবে।

ভাঙা জিনিস নিয়ে মূর্তি করতেন, পুতুল সাজাতেন আর তাদের নিয়ে বসে থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেন সকালের আলোয় সন্ধ্যের আলোয়। এটা ওটা জুড়ে দিতেন, হয়তো কিছু চেঁছে ফেলতেন, খেলতেন নানারকম ভাবে। গাছের শিকড় থেকে গড়া একখানা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে থাকত দাদামশার পায়ের কাছে। চেন দিয়ে বাঁধা থাকত সেটা যে চেয়ারে বসতেন তার পায়ার সঙ্গে। একদিন একখানা পুতুল গেল চুরি। কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। দাদামশার চেয়ারের পাশে একখানা টুলের উপর বসানো ছিল খেলনাটা। সেইখান থেকে অদৃশ্য। আমরা চোরের উপর খুব রাগ করলুম। দাদামশায় বললেন—পুতুল লোভের জিনিস। দেখলেই হাত নিস্‌পিস্‌ করে। পছন্দ হয়েছে তাই নিয়ে গেছে। যাক্‌ যে নিয়েছে তার চোখ আছে দেখছি। পুতুলটা ছিল ভাল।

সেদিন দুপুরবেলা যখন সবাই ঘুমুচ্ছে সেই সময় কলতলার উঠোনের জানলা দিয়ে দিদিমার ঘরে ঢুকেছে এক বাঁদর। এদিকে তাকায়, ওদিকে তাকায়, তারপর এক লাফে দিদিমার এক আলমারির চালে। আলমারির চালে লাগানো থাকতো কটা কাঠের মূর্তি। তার একটা হারিয়ে গিয়েছিল

কিছুদিন আগে। বাঁদরটা আর একটা মূর্তি খুলে নিল আলমারির মাথা থেকে। খুলে নিয়েই উধাও একেবারে বড় আমগাছের ডালে। বোঝা গেল চোর কে! দাদামশায় বললেন—দেখ্ ভাল করে, ও-ই নিয়ে গেছে আমার খেলনা নিশ্চয়। এঃ শেষে বাঁদরে পছন্দ করলে? এই বলে খুব হাসি। সত্যিই বাঁদরের কাছ থেকে শেষে পাওয়া গেল খেলনাটা মায় দিদিমার আলমারির চালের মূর্তি দুটো।

তারপর দিন দুপুরবেলা দিদিমা খাটে শুয়ে চোখ বুজে পড়ে আছেন। ঘুম আসছে। বিপিনের বৌ মাঝে মাঝে এসে দিদিমার পা টিপে যেত; সেদিনও দিদিমা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে টের পাচ্ছেন বিপিনের বৌ এসে আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ একবার চোখ খুলে দেখেন, ও মা, বিপিনের বৌ কই, এ যে বাঁদর। বাঁদুরে হাতে পা টিপছে। আঁতকে উঠে চিৎকার করে উঠতেই বাঁদরটা পালিয়ে গেল। দাদামশায় কাছেই চেয়ারে বসে ঝিমচ্ছিলেন। কাণ্ড দেখে অবাক। বললেন—বাঁদরটা নিশ্চয় আবার খেলনা চাইতে এসেছিল। অমন করে পায়ে হাত দিয়ে চেয়ে গেল। দাঁড়া ওর জন্য কয়েকটা বাঁদুরে খেলনা বানিয়ে দিই। এই বলে বাঁদরের উপযুক্ত কয়েকটা খেলনা করে কলতলায় উঠোনের জানলার ধারে সাজিয়ে দিলেন। অনেকদিন ধরে ছিল খেলনাগুলো সাজানো। কিন্তু সেগুলো নেবার জন্যে বাঁদরটা আর আসেনি।

বাইরে থেকে মনে হত জোড়াসাঁকোর দিন যেমন আগেও চলত তেমনিই চলছে। মাস কেটে যাচ্ছে, বছরও কেটে যাচ্ছে। তবে আর কি? কিন্তু দাদামশায় টের পেয়েছিলেন। ভাঙন ধরেছে। মহাযুদ্ধের ফলে যেমন বোঝা যাচ্ছিল পৃথিবীর সভ্যতায় ভাঙন ধরেছে, হয়তো যুগ পরিবর্তন হচ্ছে, তেমনি জোড়াসাঁকোতেও!

এমনি করতে করতে হঠাৎ একদিন কর্তাবাবার ডাক এল। শান্তিনিকেতন থেকে অসুস্থ হয়ে চলে এলেন জোড়াসাঁকোয় নিজের বাড়িতে চিরশান্তি লাভ করতে। দাদামশায় বসেছিলেন আমাদের পাঁচ নম্বর বাড়ির উত্তরের বারান্দায় ছ-নম্বর বাড়ির দিকে তাকিয়ে। দু-বাড়ির মাঝের জমিতে অগণ্য

মানুষ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে শেষ মুহূর্তের জন্যে। কে যেন এসে বললে—স্নান করে নিন? খেয়ে নিন? দাদামশায় এক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন—আমার খাওয়া হবে না এই ভাবনা তোদের? ওরে, এই বাড়িতে বসে অনেক মরা দেখেছি। অনেক শোক পেয়েছি। তোরা যা। আমি ঠিক সময় নাইবো খাবো। অনেকক্ষণ বসে থেকে তারপর উঠলেন। স্নান করলেন, ভাত খেলেন। খেয়ে বেতের চেয়ারে বসে পান মুখে দিতে যাবেন সেই সময় খবর এল রবি অস্ত গেছেন। পান খাওয়া হল না। তারপর এক টুকরো কাগজ আর রং নিয়ে এঁকে ফেললেন—অগণিত জনসমুদ্রের মাথায় রবীন্দ্রনাথের শেষ যাত্রা!

এর কিছুদিন পরেই আমাদের দোতলার বাগানের সেই অতদিনকার দোলনা, প্রকাণ্ড লম্বা সেই কাঠের দোলনা, গিরীন্দ্রনাথ কিংবা দ্বারকানাথ ঠাকুরেরই আমলের হবে হয়তো, যাতে বসে দোল খেয়ে না গেছে এমন মানুষই কেউ ছিল না জোড়াসাঁকোতে, এমন অতিথি কেউ ছিল না জোড়া-সাঁকোর, সেই দোলনা হঠাৎ একদিন ঠিক মাঝখান থেকে চিড় খেয়ে ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেল। ওটা ছিল আমাদের শূন্যে দোলার নৌকো। ঠিক মনে হল নৌকোটা দু-ফাঁক হয়ে গেল। দাদামশায় অতি যত্নে টুকরো দুটিকে তুলিয়ে রাখিয়ে দিলেন। কি এক অদ্ভুত সে কাঠ। ত্রিশ হাত দোলনা, বিশ পঁচিশ জন ছেলেমেয়ে বসত তাতে। সবাই মিলে দোল দিলে স্প্রীং-এর মতো লাফাতো। ভেঙে যাবার বহুদিন পরে সেই কাঠ দিয়ে বেঞ্চি করিয়ে বড়মামা তাঁর শান্তিনিকেতনের বাড়িতে তাকে আবার রক্ষা করেছেন।

বাড়ি বিক্রির কথা এইবার বেশ ভাল করে উঠল। একদিন দাদামশায়ের সেই চীনে টবে লাগানো বহু বছরের বেঁটে তেঁতুল গাছ, যা এতদিন ছিল দাদামশার গর্বের জিনিস, ভালোবাসার জিনিস, যার ডালে এই টুকু টুকু তেঁতুল ফলবে বলে কত আশা করে বসেছিলেন, সেই তেঁতুল গাছ মরে গেল। দাদামশার চোখে জল। তার সেই কালো রং-এর শুকনো বাঁকা ডালটা নিয়ে সাজালেন আর একখানা টবে। উপরে বসিয়ে দিলেন ভাঙা ডাল দিয়ে গড়া একটি কেষ্ট ঠাকুর আর নীচে গোপিনীর দল। এতদিন জীবন্ত তেঁতুল গাছ

নিয়ে বন্‌সাই-এর খেলা খেলতেন, এইবার তার শুকনো ডাল নিয়ে কুটুম কাটামের খেলা শুরু হল।

যুদ্ধের কবলে পড়ে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। জমি বাড়িরও দাম চড়ছে। বাড়ি বেচে দেবার তাগিদ আসছে তাই প্রায়ই। ক্রমেই প্রবলতর। কেউ কেউ বললেন—এখন হয়েছে কি? জমির দাম আগে আগুন হোক। যা-কিছু দেনা আছে সব শোধ হয়ে যাবে, হাতেও কিছু আসবে। এখন বেচো না বাড়ি। দাদামশায় শুনে সায় দিয়ে বললেন—ঠিকই তো। তাড়া কিসের?

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ও হয়েছিল। আরো বাড়ুক আরো বাড়ুক করে করে আর বেচা হয়নি। এবারেও তাই হলে ক্ষতি কি? কিন্তু তা হবার নয়। জোড়াসাঁকোর মনে ভাঙন ধরেছে। কোনো রকমে পুরোনো বাড়িটাকে বেচে নতুনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে পারলে হয়। গলি হোক, ঘুঁজি হোক, যেখানে হোক, জোড়াসাঁকোয় আর নয়। দাদামশায় একা কত বাধা দেবেন? মেজদাদামশায় দুর্বল, বড়দাদামশায় নেই। কাজেই বাড়ি বিক্রির কথা বেশ পাকাপাকিভাবে শোনা যেতে লাগল।

বাড়ি বিক্রির কথা শুরু হতেই লাইব্রেরীর আলমারি থেকে দু-চারটে করে বই সরে যেতে শুরু হয়েছে। শাল-দোশালা নয়, গয়না জহরত নয়, হাতঘড়ি আংটি নয়, বই। বই হারিয়েছে কতবার, কিন্তু এইরকমভাবে আলমারি থেকে চুরি হয়নি কখনও। জোড়াসাঁকোর সরস্বতীর ঘরে সিঁদ পড়ল। আমরা ধরে নিলুম, ওটা একটা দুর্লক্ষণ। বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে তারই এক পূর্বাভাস। ঠিক হ'ল লাইব্রেরীর সমস্ত বই বেচে দেওয়া হবে, রাখা যখন যাবেই না। দু-ঘরের মেঝের উপর থাক দিয়ে ঢেলে রাখা হল সমস্ত বই। দালাল এল—দেখল। তারপর একদিন সেই দুই ঘরের মেঝে শূন্য হয়ে গেল। বেছে বেছে সামান্য কিছু বই দাদামশায় রেখে দিলেন। আর অন্যেরা আর কিছু। ঘরগুলো খাঁ খাঁ করতে লাগল।

পুরোনো আসবাব অনেক বিক্রি করে দেওয়া হল। কিছু কিছু রাখলেন দাদামশায়রা। তারপর একদিন কনকমামারা চলে গেলেন বাড়ি ছেড়ে। জোড়াসাঁকো বাড়ির তিনতলার যে অংশ দ্বারকানাথের আমল থেকে বরাবর

একটানা জম-জমাট হয়ে ছিল, যেখানে বড় বড় পার্টি দিয়েছিলেন দ্বারকানাথ, যেখানে গাঁদা ফুলে মুড়ে দেওয়া বিয়ের আসর বসেছে কত এই সেদিন পর্যন্ত, সে অংশ একেবারে খালি হয়ে গেল।

কিছুদিন পরে মেজদাদামশায় চলে গেলেন তিনতলার বাকি অংশ ছেড়ে। শূনশান হয়ে গেল সমস্ত তিনতলাটা। রাত্রিবেলা আলো জ্বলা বন্ধ হল। দিনের বেলা জানলা দরজা আর খোলা হল না। তবু সেই নিরালা পুরী থেকে মাঝে মাঝে কিসের যেন আওয়াজ উঠছে বলে মনে হত। থেকে থেকে বোধ হত উপরে যেন কারা চলাফেরা করছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ একটা গুম্ গুম্ শব্দ শুনতে পেলুম। উপর থেকে আসছে। প্রথমে মনে হয়েছিল কানের ভুল। তারপর আবার শুনলুম শব্দটা। বাড়িটাও যেন কাঁপছে শব্দের সঙ্গে। অনেকেই শুনলুম আমরা। ভারি অস্বস্তি লাগল। বুঝতে পারলুম না কিছু। একবার মনে হল চোর এসেছে তেতলায়। কিছু ভাঙছে বোধহয় মেঝেতে ফেলে। কিন্তু কি-ই বা থাকতে পারে উপরের খালি ঘরগুলোয়? ঘাড় বেঁকিয়ে উঁচুর দিকে তাকিয়ে দেখলুম তেতলা চৌতলার ছাদ ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তখন আমরা ঠিক করলুম কয়েকজন মিলে উপরে উঠে দেখতে হবে। দাদামশায় হাতে একটা টর্চ গুঁজে দিলেন। টর্চ নিয়ে আমরা শব্দ অনুসরণ করে চৌতলার ছাদে গিয়ে উঠলুম। টর্চ ফেলে দেখি ছাদের এক কোণে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে সন্তোষ চাকর—হাতে এক গোছা লোহার শিক। ছাদের গায়ে যে লোহার শিকের পাঁচিল তারই থেকে ভেঙে শিকগুলো সংগ্রহ করছে বিক্রি করবার জন্যে। শিকগুলো ছাড়িয়ে নেবার জন্যে লোহা দিয়ে ঘা মারছে তাদের উপর আর বার হচ্ছে সেই শব্দ। আধা অন্ধকার ছাদে সেই দৃশ্য দেখে ঠিক মনে হল যেন সন্তোষ চাকর সাঁড়াশি হাতে আমাদের বাড়ির পাঁজরগুলোকে উপড়ে নিচ্ছে আর বাড়িটা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। আমাদের দেখে তার হাত থেকে শিকগুলো খসে পড়ে গেল।

সাধারণ অবস্থায় সন্তোষ এমন কাজ করার কথা ভাবতেও পারত না। কিন্তু জোড়াসাঁকো বাড়ির তখন সে কী এক আবহাওয়া—মানুষগুলো যেন অমানুষ হয়ে উঠেছে। সন্তোষকে বকলুম আমরা। বললুম—সন্তোষ, তুমি

চুরি কর, ডাকাতি কর, তার ফল তুমি ভুগবে কি না ভুগবে সে তুমিই জানো। কিন্তু দাদামশায় এখনও এ বাড়িতে আছেন। তাঁরই চোখের সামনে তুমি এ বাড়ি ভেঙে টুকরো টুকরো করবে এটা সইবে না।

দাদামশায়কে বললুম। দাদামশায় শুনে বললেন—কি আর করবি বল্? ঐ দেখ দেয়ালের দিকে! বলে একটা দেয়ালের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন। আমরা শিউরে উঠে দেখলুম, সমস্ত দেয়াল কালো করে সারি সারি পিঁপড়ে নামছে। তেতলায় আর মানুষ নেই। পিঁপড়েরা টের পেয়ে গেছে। কোথায় কিসের ফাটলে থাকত পিঁপড়েগুলো কে জানে? কতদিনের কত পুরুষের পিঁপড়ে তাই বা কে জানে? মানুষের সঙ্গে এতদিন পিঁপড়ে ছিল। মানুষ চলে গেছে, পিঁপড়েরাও তাই চললো। তেতলা ছেড়ে সারি সারি কালো পিঁপড়ের দল পালাচ্ছে। এ রকম দৃশ্য কখনও দেখিনি। ক-দিন ধরে উপর থেকে নীচের দিকে দেয়াল বেয়ে একটানা পিঁপড়ের স্রোত চললো।

বরানগরের গুপ্তনিবাসে দু-একটা করে আসবাব পাঠিয়ে দেওয়া হতে থাকল। সেইখানেই দাদামশায় বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। বললেন—চললুম লোকচক্ষুর আড়ালে বনালয়ে গুপ্ত নিবাস করতে। দ্বারকানাথের ঘড়িটা নিয়ে যাস্ যত্ন করে। ভাল করে সাবধানে বসাস ওটাকে। ওটা জ্যান্ত ঘড়ি। চোখ আছে। সব দেখে, সব বোঝে আমাদের কি হচ্ছে না-হচ্ছে। অসীম স্নেহ ছিল এই পেণ্ডুলাম-ঝোলানো ঘড়িটার উপর। বলতেন, দু-একবার এমন হয়েছে, বাড়িতে যখন কেউ মারা গেছে ঘড়িটা সেই সময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

একদিন দক্ষিণের বারান্দা একেবারে খালি হয়ে গেল। বড়দাদামশায়ের, মেজদাদামশায়ের চৌকি টেবিল ইতিপূর্বেই চলে গিয়েছিল। দাদামশায়ের ডেস্ক টেবিল চেয়ারও চলে গেল বরানগরে। বারান্দাটাকে খালি পেয়ে সেই অতি-উৎসাহী নতুন বেহারাটা ঘসে মেজে তার লাল মেঝেটাকে চক্চকে করে তুললো। মাঝে মাঝে বড় বড় ফাটল থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ দেখে মনে হল বারান্দাটা নতুন সাজে সেজেছে। যেন তার বয়েস অনেক কমে গেছে।

দাদামশায় এলেন বারান্দায়। বারান্দার বড় ফাঁকটার কাছে এসে বাগানের দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিক। তারপর আস্তে আস্তে বসে পড়লেন পরিষ্কার ঠাণ্ডা মেঝের উপর। দেখলুম দু-দিকে দু-হাত বিছিয়ে মেঝেকে ছুঁয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন নক্‌শাকাটা রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে বাগানের পুরোনো গাছগুলোর দিকে অনেকক্ষণ।

একে একে ছুটি পেয়ে সরকারী চাকরেরা চলে যাচ্ছিল। নতুন বেহারাটাও চলে গেল একদিন। জোড়াসাঁকো বাড়িতে আর চাকরি রইল না কারো। শুধু দাদামশায় যেদিন বাড়ি ছেড়ে বেরবেন সেদিন বাড়ির মেথররা তাদের কাচ্চা বাচ্ছার হাত ধরে দাদামশায়কে ঘিরে বললে—আমাদের তো কোনো ব্যবস্থা করে গেলেন না? জোড়াসাঁকো বাড়ির মেথররা বেশ কয়েক পুরুষ ধরে জোড়াসাঁকো বাড়িতেই মানুষ। ঐখানেই তারা জন্মেছে, বেড়েছে, মরেছে। উত্তর দিকের জমির সীমানায় প্রকাণ্ড এক তেঁতুল গাছের তলায় তাদের ঘর, তাদের বাসা। তাদের ব্যবস্থা করা তো সহজ নয়। কর্তারাই যখন রইলেন না, কে তাদের ব্যবস্থা করবে? দাদামশায় বললেন—চলে আয় তোরা বরানগরে। এইখানেই তোদের ঘর বেঁধে বসিয়ে দেব।

মেথররা কিন্তু নড়ল না। পূর্বপুরুষদের বসত, পূর্বপুরুষদের ভিটে একমাত্র তারাই আঁকড়ে পড়ে রইল।

গাড়ির মধ্যে গিয়ে উঠলেন দাদামশায়। জোড়াসাঁকো বাড়িকে পিছনে ফেলে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি পেরিয়ে দাদামশার গাড়ি এগিয়ে চলে গেল কলকাতার উত্তরে নতুন বাসার উদ্দেশ্যে।

জোড়াসাঁকো বাড়ির আর দক্ষিণের বারান্দার ইতিহাস সেইখানেই শেষ।